+ সাবধান +

জীবাণুরা নিকটেই আছে!

ডঃ মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ

সাবধান,
জীবাণুরা নিকটেই আছে !

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ, এম্. এস্-সি., ডি. ফিল্.
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ,
কলিকাতা।

বি. বি. কুণ্ডু এণ্ড সন্স
১৮ এল্, টেমার লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক : শ্রীবিভূতি ভূষণ কুণ্ডু
১৮ এল্, টেমার লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম সংস্করণ : মাঘ, ১৩৯২ (বঙ্গাব্দ)
[ইং : জানুয়ারি, ১৯৮৬]

দ্বিতীয় সংস্করণ : বৈশাখ, ১৩৯৩
[ইং : এপ্রিল, ১৯৮৬]

মূল্য : ২০'০০ টাকা

মুদ্রাকর : শ্রীতুলসী চরণ বক্সী
ন্যাশন্যাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৩৩ ডি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

অধ্যাপক

ডাঃ প্রদীপ কুমার রাহা

প্রীতিভাজনেষু
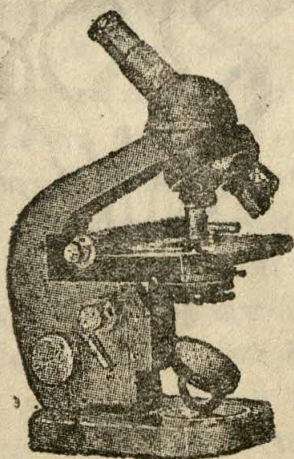
শেষলেখা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে ;
একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু
কষ্টের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট ভঙ্গি যত—
অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার।
যতবার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।
এই হার-জিত খেলা, জীবনের মিথ্যা এ কুহক,
শিশুকাল হতে বিজড়িত পদে পদে এই বিভীষিকা,
দুঃখের পরিহাসে ভরা।
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।

জীবন-মৃত্যুর হার-জিত খেলা

আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে রয়েছে অত্যন্ত বিস্ময়কর এক জীবজগৎ। আগে এবিষয়ে বিশেষ কিছুই জানা ছিল না। নানা দেশের বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত সাধনার ফলে ক্রমে অদৃশ্য জীবাণুদের কথা অনেক কিছু জানা গেছে।

অতীতে বিজ্ঞানীদের গবেষণার প্রধান হাতিয়ার ছিল অণুবীক্ষণ-যন্ত্র। এছাড়া তাঁদের ছিল অদম্য কৌতূহল। প্রথম দিকে তাঁরা অন্ধকারে হাতড়ে বেড়িয়েছেন, একথা ঠিক। কিন্তু একসময় তাঁরা আলোর সন্ধান পেয়েছেন। এর ফলে তাঁদের যাত্রা অনেক সহজ হয়েছে, তাঁরা সঠিক পথে চলতে পেরেছেন।

বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে, এক-একটি রোগের জন্য দায়ী এক-একরকম জীবাণুর কথা ক্রমশ: জানা গেছে। আকারে খুব ছোট হলেও এরা আমাদের পরম শত্রু। এই জীবাণুরা আমাদের নিকটেই আছে। কে যে কখন আমাদের শরীরে ঢুকে পড়ে আমাদের প্রাণ সংহার করবে, তা কেউ বলতে পারে না! এজন্য আমাদের সদা-সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়, যাতে এদের কেউ আমাদের অজ্ঞাতসারে হঠাৎ শরীরে ঢুকতে না পারে, কিংবা ঢুকে পড়লেও যেন কোন রকম অনিষ্ট সাধন করতে না পারে।

অজানাকে জানবার অদম্য কৌতূহল, এবং অজেয়কে জয় করার অদম্য স্পৃহা, মানুষকে সব সময় তাড়না ক'রে নিয়ে যায় সাধনার দুর্গম পথে। মানুষের এই চিরন্তন ধর্মের বশবর্তী হয়েই একদল বিজ্ঞানী আত্মনিয়োগ করেছেন, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার এক মহান ব্রত নিয়ে। এজন্য ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা সবই তারা বিসর্জন দিয়েছেন। জীবন-মৃত্যুর এই হার-জিত খেলায় কখনও তাঁরা জয়ী হয়েছেন। এক-একটি রোগের জীবাণুকে সনাক্ত ক'রে, তাকে ধ্বংস করার, কিংবা তার আক্রমণ প্রতিরোধ করার, উপায় উদ্ভাবন করেছেন। আবার কখনও তাঁরা হয়তো নিজেরাই পরাজিত হয়েছেন। অজ্ঞাত এবং অদৃশ্য জীবাণুর সঙ্গে লড়তে গিয়ে, অকালে মৃত্যু বরণ করেছেন। কিন্তু তা হ'ল বীরের মৃত্যু। তাই তাঁরা আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তবে মানবকল্যাণে এরূপ আত্মাহুতি একেবারে ব্যর্থ হয়নি। কারণ, তাঁদের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান লাভ ক'রে,

তাঁদের অনুগামীরা আরও সতর্ক হয়েছেন, এবং ওই আততায়ী জীবাণুর সঙ্গে লড়াই করার নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করেছেন। এর ফলে ঐসব জীবাণু শেষপর্যন্ত পর্যুদস্ত হয়েছে।

ঐসব পুরোগামী বিজ্ঞানীদের জীবন ছিল আনন্দ-বেদনায় হাসি-কান্নায় ভরা। কিন্তু ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা তাঁদের মনে কখনও ঠাঁই পায় নি। তাঁদের জয়-পরাজয়ের কাহিনী যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি বিস্ময়কর। এদেশের ছেলেমেয়েদের যদি এইসব কাহিনী ভাল লাগে, তারা যদি এ থেকে কিছু অনুপ্রেরণা লাভ করে, তাহলে বুঝবো যে, আমার এই শ্রম সার্থক হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে, এইরকম একটি বই লেখার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলাম পল ডি ক্রুইফ-এর "Microbe Hunters" বইখানা পড়ে। প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে এতকাল এই কাজটা সম্পূর্ণ করতে পারিনি। এজন্য বরাবরই মনের মধ্যে বেশ অস্বস্তি অনুভব করেছি। সুদীর্ঘকাল পরে আমার সেই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হ'ল। এজন্য আমি আনন্দিত।

এই পুস্তকের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ রচনাকালে, অধ্যাপক ডাঃ কালীময় ভট্টাচার্য প্রণীত "প্যাথলজি" গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। এজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

২৫শে বৈশাখ, ১৩৯২। শ্রীমৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ

জীবাণুর রূপকথা … ১
নানাপ্রকার রোগোৎপাদক জীবাণুর কথা … ১৫
অনাক্রম্যতা ও টিকা … ৩৫
জলাতঙ্ক-রোগের টিকা … ৪৬
বি. সি. জি. টিকা … ৫৩
সিরাম আবিষ্কারের গোড়ার কথা … ৫৯
রোগ প্রতিরোধে শাসক-বস্তুর ব্যবহার … ৬৯
রস্ বনাম গ্র্যাসী—কে বড় ? … ৮২
যারা মরণের সাথে করে কোলাকুলি … ১০১
আন্ত্রিক রোগ … ১১১
ফাইলেরিয়া একটি দুষ্ট ব্যাধি … ১২১
সাবধান, ম্যালেরিয়া আবার আসছে ! … ১২৬
সাবধান, কালাজ্বর এখনও আছে ! … ১৪২
যক্ষ্মা-রোগ ও তার প্রতিকার … ১৫০
কুষ্ঠ-রোগ ও তার প্রতিকার … ১৬৪
ওহে কালো মৃত্যু, তুমি আজ পরাজিত ! … ১৮২

সম্মুখচিত্র (রঙীন চিত্র—I)

1. পুঁযের পাতলা স্তরে স্ট্যাফাইলোকক্কাই (*Staphylococci*)—একত্র ডেলা-পাকানো, এবং স্ট্রেপ্‌টোকক্কাইাই (*Streptococci*)—পুঁতির মালার মতো পরপর সাজানো। গ্রাম (Gram)-এর পদ্ধতিতে রঞ্জিত।
2. নিউমোনিয়া রোগীর থুথুতে নিউমোকক্কাই (*Pneumococci*)। মুইর (Muir)-এর পদ্ধতিতে রঞ্জিত।
3. গনোরিয়া রোগীর পুঁযে গনোকক্কাই (*Gonococci*) (লাল রঙে রঞ্জিত) এবং স্ট্যাফাইলোকক্কাই (*Staphylococci*)। গ্রাম (Gram)-এর পদ্ধতিতে রঞ্জিত।
4. টিটেনাস বা ধনুষ্টঙ্কার রোগের ব্যাসিলি (*Clostridium tetani*)—কতকগুলির সঙ্গে আছে 'স্পোর' বা বীজরেণু। লঘু কারবল-ফুক্‌সিন (Carbol-fuchsin) দ্বারা রঞ্জিত।
5. টাইফয়েড ব্যাসিলি (*Salmonella typhi*)—২৪ ঘণ্টা স্থায়ী অ্যাগার-কাল্‌চার থেকে সংগৃহীত। কাঠির মতো এই জীবাণুর গায়ে অনেকগুলি লেজের মতো উপাঙ্গ (flagella) থাকে। মুইর (Muir)-এর পদ্ধতিতে রঞ্জিত।
6. কলেরা রোগের জন্য দায়ী ব্যাসিলি (*Vibrio cholerae*)—১২ ঘণ্টা স্থায়ী অ্যাগার-ক্যাল্‌চার থেকে সংগৃহীত। কমা-চিহ্নের মতো এই জীবাণুর একটি লেজের মতো উপাঙ্গ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। মুইর (Muir)-এর পদ্ধতিতে রঞ্জিত।

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য** —প্রতিটি জীবাণু এক হাজার গুণ বিবর্ধিত।]

রঙীন চিত্র—I
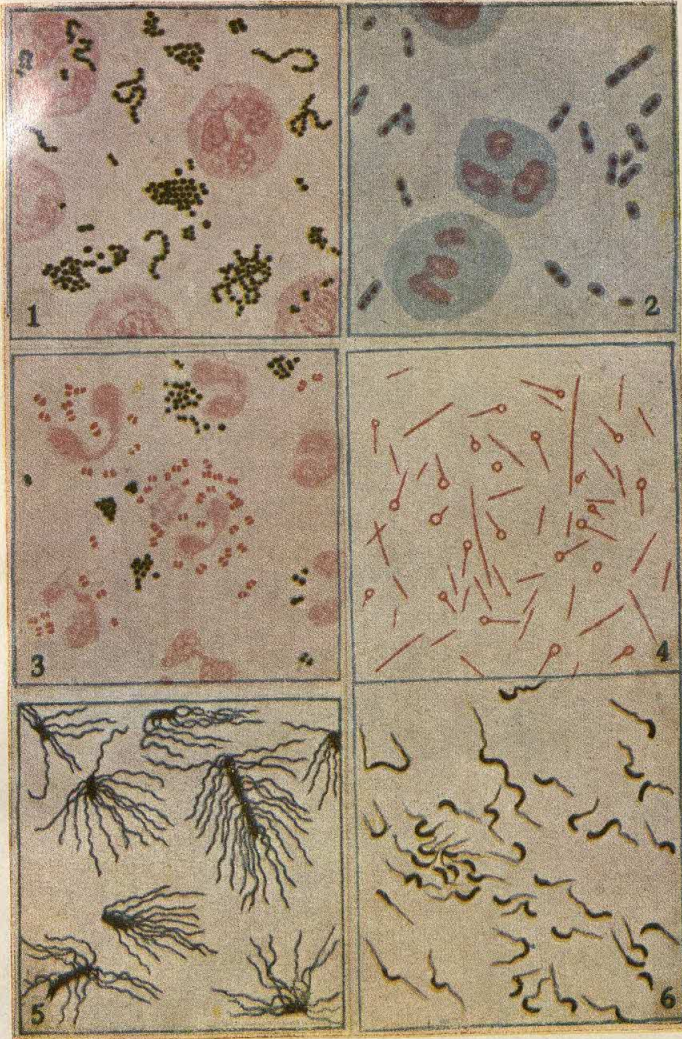
[চিত্র-পরিচিতি—বাঁদিকের পাতায় ।]

[শ্রীভোলানাথ রায়-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত ।]

জীবাণুর রূপকথা

আমাদের দৃষ্টিসীমার অন্তরালে রয়েছে বিস্ময়কর এক জীবজগৎ। এর শত-সহস্র অধিবাসীর বিচিত্র জীবনলীলা ঘটে চলেছে আমাদের অগোচরে, অনন্তকাল ধরে। কিন্তু তার কিছুই আমরা জানতে পারি না। মাত্র তিনশ' বছর আগেও একথা বললে, কেউ তা বিশ্বাসই ক'রত না। রূপকথার গল্প বলে হেসে উড়িয়ে দিত।

শোনা যায়, যাদুকরের মায়া-কাজল চোখে দিলে, রূপকথার কাহিনীও চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। লাভেনহুক ছিলেন এমনি এক যাদুকর। তিনি এমন এক মায়াবী-চোখ তৈরি করলেন, যার ভিতর দিয়ে অদৃশ্যলোকের আজব অধিবাসীদিগের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ ক'রে মানুষ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। এ যেন রূপকথার কাহিনীর চেয়েও অনেক বেশী চমকপ্রদ, অবিশ্বাস্য। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রূপকথার কাহিনী সবই অলীক, মানুষের কল্পিত। কিন্তু মায়াবী-চোখের সাহায্যে দেখা এই সব অধিবাসীর কাহিনী একান্ত বাস্তব, এখানে কল্পনার কোন স্থান নেই।

অ্যান্টনি ভ্যান লাভেনহুক (Antony Van Leeuwenhoek) (১৬৩২-১৭২৩) ছিলেন হল্যাণ্ডের অন্তর্গত ডেল্ফ্ট-এর সিটি হলের সামান্য একজন দ্বাররক্ষী। বলতে গেলে অশিক্ষিত। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত কৌতূহলী এবং অত্যন্ত খেয়ালী। তিনি শুনেছিলেন স্বচ্ছ কাচ ঘষে ঘষে লেন্স-এর (বা, আতশী কাচের) আকার দিলে, তার ভিতর দিয়ে ছোট্ট জিনিসকে অনেক বড় দেখায়। তাঁর শখ হ'ল, অনেকদিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে কাচ ঘষে ঘষে একটি লেন্স তৈরি করলেন। ধাতুনির্মিত একটি নলের মধ্যে এই লেন্স বসিয়ে সুন্দর একটি অণুবীক্ষণ-যন্ত্র (বা, অণুবীন) (simple microscope) বানালেন।

এরপর তার আশেপাশে যা-কিছু দেখেন, তাই তাঁর অণুবীনের নীচে রেখে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি তিমিমাছের মাংসপেশী পরীক্ষা করলেন, গায়ের মরা চামড়া তুলে দেখলেন, আর দেখলেন বিভিন্ন প্রাণীর গায়ের লোম। ছোট্ট ছেলের মতো অবাক-বিস্ময়ে দেখলেন, সুতোর মতো সরু একটি ভেড়ার লোম তাঁর অণুবীনের নীচে দেখাচ্ছে অমসৃণ একটি গাছের গুঁড়ির মতো! তিনি মৌমাছির হুল এবং উকুনের পা পরীক্ষা ক'রে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ঘুরে ঘুরে বারবার এগুলি পরীক্ষা করেন, আর বলে ওঠেন,—"অসম্ভব! অবিশ্বাস্য!"

চিত্র ১। অ্যান্টনি ভ্যান লাভেনহুক।

এই নমুনাগুলি তাঁর অণুবীনের তলায় বসানো রইলো মাসের পর মাস ধরে। নতুন নতুন জিনিস পরীক্ষা করার জন্যে তিনি আবার নতুন ক'রে অণুবীন তৈরি করতে বসলেন। তাঁর শখ ক্রমে ছেলেমানুষী নেশায় পরিণত হ'ল। ধীরে ধীরে তাঁর ছোট্ট ঘরটি শত শত শক্তিশালী অণুবীনে ভরে গেল। এদের প্রত্যেকটির নীচে বসানো রইলো এক-একটি অত্যাশ্চর্য দর্শনীয় বস্তু।

দৈবাৎ একদিন বাগানের নোংরা জল পরীক্ষা ক'রে তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। দেখলেন, তার মধ্যে অসংখ্য কীটাণু কিলবিল করছে। লাভেনহুক এই সব কীটাণুদের সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান করতে লাগলেন। একদিন লক্ষ্য করলেন যে, গোল-

মরিচের গুঁড়ো তিন সপ্তাহ ধরে জলে ভিজিয়ে রাখলে, সেই জলের একটিমাত্র ফোঁটায় লক্ষ লক্ষ কীটাণু (বা, জীবাণু) দেখা যায়। ১৬৮৩ সালে তিনি দাঁতের গোড়া থেকে জমাট ময়লা তুলে এনে পরীক্ষা করেন, এবং তাতে লম্বা লম্বা কাঠির মতো কতকগুলি জীবাণু দেখতে পান। কিন্তু এসবের সঙ্গে দাঁতের রোগের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, সে বিষয়ে তিনি কিছু বলতে পারেন নি।

চিত্র ২। অ্যারিস্‌টট্‌ল।

লাভেনহুক দিনের পর দিন ধরে নানারকম জীবাণুর বিচিত্র জীবনলীলা প্রত্যক্ষ করেন, আর তাদের বিবরণ লিখে পাঠান লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির কাছে। এইসব বিবরণ ছাপা হয় ফিলজফিক্যাল ট্র্যান্‌জাক্‌শন-এর বিভিন্ন সংখ্যায়, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে। কিন্তু প্রাণহীন জড়বস্তুর মধ্যে এইসব জীবাণুর আবির্ভাব হয় কি ক'রে, এ প্রশ্নের মীমাংসা তিনি করতে পারেন নি। তাছাড়া নানা ধরনের জীবাণুই যে মানুষের নানা-রকম ব্যাধির কারণ হতে পারে, এ-কথাও তাঁর কখনও মনে হয় নি। ভগবানের রাজ্যে যে এমন একটি বিচিত্র জগৎ আছে, আর সেখানে এমন সব বিচিত্র জীবাণু আছে, এইটুকু জেনেই তিনি খুশী ছিলেন।

এখন প্রশ্ন হ'ল,—এসব ক্ষেত্রে প্রাণের স্ফুরণ হয় কি করে? আগেকার দিনে এনিয়ে তুমুল বাদানুবাদ চলতো। একদল বিজ্ঞানী বলতেন, প্রাণের স্ফুরণ হয় আপনা থেকেই। কিন্তু আর একদল বলতেন, না, তা কখনই সম্ভব নয়। অ্যারিস্‌টট্‌লের মতো বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিকও প্রথমোক্ত মতে বিশ্বাসী ছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতেই রেডি (Redi) নামক একজন ইতালীয় বিজ্ঞানী একটি সহজ পরীক্ষা করেন। তিনি দু-খণ্ড মাংস নিয়ে দু'টি

জারে রাখলেন। প্রথম জারের মুখ খোলা রাখলেন, কিন্তু দ্বিতীয় জারের মুখ এক টুক্‌রো কাপড় দিয়ে ভাল ক'রে বন্ধ ক'রে দিলেন। খোলা জারের মধ্যে মাছি যাতায়াত শুরু ক'রে দিল, কিন্তু দ্বিতীয় জারে কোন মাছি প্রবেশ করতে পারল না। কয়েক দিন পরে দেখা গেল, খোলা জারে অবস্থিত মাংসে মাছির পোকা (maggot) কিলবল করছে। কিন্তু দ্বিতীয় জারে এরকম কোন পোকা দেখা গেল না। এতে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হ'ল যে, মাংসে আপনা থেকে এইসব পোকার আবির্ভাব হয় না। বহিরাগত মাছি মাংসে ডিম পাড়ে, এবং পরে সেই ডিম থেকেই এইরূপ পোকার জন্ম হয়।
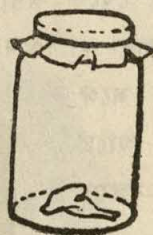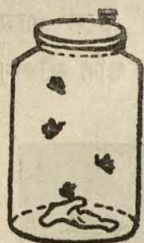
চিত্র ৩। রেডির পরীক্ষা।

ঐ সময় নীডহ্যাম নামে এক ধর্মযাজক ছিলেন। তিনিও অ্যারিস্‌টট্‌লের মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রাণের স্বতঃস্ফুরণ সম্পর্কে তিনি একটি প্রমাণও দাখিল করেন। উনুনের উপর থেকে গরম মাংসের স্যুপ (বা, ঝোল) নিয়ে একটি বোতলে পুরলেন, এবং তার মুখ ছিপি এঁটে বন্ধ ক'রে রাখলেন। কয়েক দিন পরে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল, স্যুপের মধ্যে নানা আকারের অসংখ্য জীবাণু কিলবিল করছে। আপনা থেকে প্রাণের আবির্ভাব আবিষ্কারের আনন্দে উচ্ছ্বসিত হলেন তিনি। কি অদ্ভুত আবিষ্কার !

এজন্যে তখন অনেকেই বলতে লাগলেন যে, ডিম থেকেই মাছির জন্ম হয়, একথা ঠিক, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক জীবের বেলায় সেরকম হয়তো না-ও হতে পারে। বলা বাহুল্য, প্রাণের স্বতঃস্ফুরণ সম্ভব কি না, তাই নিয়ে তখন বিজ্ঞানীদের মধ্যে তুমুল বাদানুবাদ আরম্ভ হয়ে গেল।

নীডহ্যামের পরীক্ষার বিবরণ অচিরেই ইতালীয় বিজ্ঞানী স্প্যালানজানির (Spallanzani) (১৭২৯—৯৯) দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রল। তাঁর মতে, নীডহ্যামের পরীক্ষায় কয়েকটি মারাত্মক ত্রুটি ছিল। যেমন, সূপ গরম করা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এই উত্তাপ জীবাণু ধ্বংস করার মত যথেষ্ট ছিল না। তাছাড়া বোতলের মুখ বন্ধ করার জন্যে যে কর্ক (বা, ছিপি) ব্যবহার করা হয়েছিল, তার মধ্যে অনেক ছিদ্র ছিল। কাজেই বাইরের বাতাস থেকে বোতলের মধ্যে জীবাণু প্রবেশ করতে কোন বাধা ছিল না। নীডহ্যামের পরীক্ষা যে ত্রুটিপূর্ণ ছিল, তা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে স্প্যালানজানি নিম্নলিখিত পরীক্ষাটি করলেন।

ফ্লাস্কের (বা, কাচকূপীর) মধ্যে মাংসের সূপ নিয়ে তার মুখটি তিনি গালিয়ে বন্ধ ক'রে দিলেন। তারপর ঐ ফ্লাস্ক একঘণ্টা ফুটন্ত জলের মধ্যে রেখে দিলেন। কয়েক দিন পরে ঐ সূপ পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, তার মধ্যে কোন জীবাণু নেই।

স্প্যালানজানির এই পরীক্ষায় নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হ'ল যে, আপনা থেকে প্রাণের স্ফুরণ সম্ভবপর নয়। পচনশীল পদার্থে প্রাণের বীজ অঙ্কুরিত হয় বাতাস থেকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফরাসী নিসর্গবিদ্ বুঁফো নীডহ্যামের ভুল তথ্যকে ভিত্তি করেই প্রাণের স্ফুরণ সম্পর্কে পর্বতপ্রমাণ দার্শনিক তত্ত্ব দাঁড় করালেন। ইউরোপের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরাও তাঁর বাক্‌চাতুর্যে ভুলে গেলেন। এর ফলে স্প্যালানজানির মতবাদ বিশেষ স্বীকৃতি লাভ ক'রল না। প্রায় এক-শ' বছর ধরে বুঁফোর মতবাদই প্রাধান্য বিস্তার করে রইল। একথা ভাবতেও আজ অবাক লাগে!

উনবিংশ শতাব্দীতে এ বিষয়ে পুনরায় গবেষণা শুরু করলেন ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর (Louis Pasteur) (১৮২২—৯৫)। তিনি প্রথমে একটি সহজ পরীক্ষা করেন। একটি কাচের নলে পরিষ্কার সাদা তুলো গুঁজে তার অন্য দিক থেকে বাতাস টেনে নিলেন।

বাতাসের ধুলোবালি জমে সাদা তুলো কালো হয়ে গেল। এজন্যে পাস্তুরের মনে হ'ল, বাতাসে যদি এতো ধুলোবালি থাকে, যা খালি চোখে দেখা যায় না, তবে তার সঙ্গে জীবাণুই বা থাকবে না কেন ?
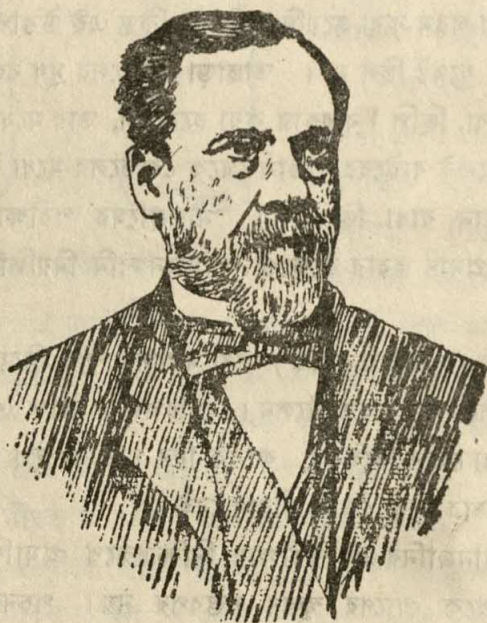
চিত্র ৪। লুই পাস্তুর।

আর এই জীবাণু যদি কোন প্রকারে মাংসের স্যুপে ঢুকে পড়ে, তবে তার ক্রিয়ায় স্যুপের পচন হবে নিশ্চয়ই।

কিন্তু পাস্তুরের এই মতবাদ শুনে বিজ্ঞানীরা তাঁকে উপহাস করতে লাগলেন। অতএব পাস্তুর তাঁর এই মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যে কোমর বেঁধে লাগলেন। একটি ফ্লাস্কে (বা, কাচকূপীতে) মাংসের স্যুপ নিয়ে তা ভাল ক'রে ফোটালেন। তারপর কয়েকটি কূপীর মুখ গালিয়ে বন্ধ ক'রে দিলেন, আর কয়েকটি খোলা রাখলেন। কয়েক দিন পরে দেখা গেল, শুধু খোলা কূপীর স্যুপে জীবাণুর আবির্ভাব হয়েছে, অপরদিকে মুখবন্ধ কূপীগুলি অবিকৃত রয়েছে।

কিন্তু যাঁরা প্রাণের স্বতঃস্ফুরণ সম্পর্কে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁরা পাস্তুরের এই পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তাঁরা বললেন, ফোটাবার ফলে ফ্লাস্কের (বা, কূপীর) অভ্যন্তরের আবহ (বা, বায়ু) এমন ভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে (অর্থাৎ, কূপী বায়ুশূন্য হয়ে গেছে) যে, তার মধ্যে কোন জীবের পক্ষেই আর বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আর এই কারণেই ঐসব কূপীর স্যুপে প্রাণের স্ফুরণ হয় নি।

চিত্র ৫। পাস্তুরের পরীক্ষায় দেখা গেল, শুধু খোলা কূপীর স্যুপে (C) জীবাণুর আবির্ভাব হয়েছে, অপরদিকে মুখবন্ধ কূপীগুলি (C′) অবিকৃত রয়েছে।

বিজ্ঞানীদের এই আপত্তি খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে পাস্তুর কতকগুলি নতুন ধরনের ফ্লাস্ক (বা, কূপী) তৈরি করলেন। গলা বকের মতো লম্বা আর সরু। গলাটা প্রথমে খানিকটা নীচের দিকে নেমেছে, কিন্তু বেঁকে আবার উপর দিকে উঠে গেছে। এই সরু মুখ দিয়ে বাইরের বাতাস

ঢুকবে। কিন্তু বাঁকের মুখে ধাক্কা খেয়ে ধুলোবালি সব আটকে থাকবে, কূপীর মধ্যে ঢুকতে পারবে না।
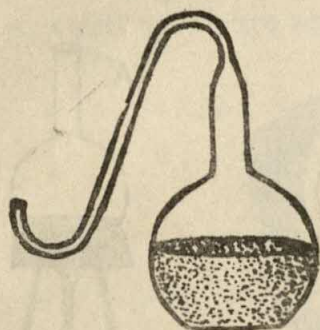
চিত্র ৬। পাস্তর কতকগুলি নতুন ধরনের ফ্লাস্ক তৈরি করলেন—গলা বকের মতো লম্বা আর সরু।

পাস্তর এসবের মধ্যে মাংসের স্যুপ নিয়ে ভাল ক'রে ফোটালেন। স্যুপ জীবাণুশূন্য হ'ল। এরপর ছোট্ট একটি শিখার সাহায্যে কূপীর খোলা মুখ গালিয়ে বন্ধ ক'রে দিলেন। ১৮৬০ সালের গোড়ার দিকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে কূপীর মুখ খুলে আবার তখনই বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল। কিছু দিন পরে দেখা গেল, যেগুলি ভূগর্ভস্থ ভাঁড়ার ঘরে (cellar) খোলা হয়েছিল, তাদের দশটির মধ্যে নয়টিই ভাল আছে, পচে নি। কিন্তু যেগুলি বাইরের বাগানে খোলা হয়েছিল, সেগুলি সবই পচে গেছে। তাদের মধ্যে জীবাণু কিলবিল করছে। এর ফলে পাস্তরের দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে, বাতাসে ধুলোবালির সঙ্গে জীবাণুও থাকে। আর এই জীবাণু যদি কোন প্রকারে মাংসের স্যুপে ঢুকে পড়ে, তাহলেই স্যুপের পচন হয়।

এরপর পাস্তর ভাবলেন ধুলোবালির সঙ্গেই যদি জীবাণু থাকে, তাহলে আকাশের যত উপর দিকে ওঠা যাবে, স্যুপের পচনের সম্ভাবনাও তত কমে যাবে। এ বিষয়েও পরীক্ষা ক'রে দেখা দরকার। এজন্যে কুড়িটি স্যুপভর্তি কূপী নিয়ে তিনি পপেত পাহাড়ে উঠলেন, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮৫০ মিটার উপরে। এদের মুখ খুলে তখনই আবার বন্ধ ক'রে রাখলেন। মাত্র পাঁচটি কূপীর স্যুপ খারাপ হ'ল। এরপর কুড়িটি স্যুপভর্তি কূপী নিয়ে তিনি আল্‌প্‌স পাহাড়ে উঠলেন, মানুষের বসবাসের সীমা ছাড়িয়ে আরও অনেক উপরে। অত্যন্ত সাবধানে এদের মুখ খুলে তখনই আবার বন্ধ ক'রে দিলেন। এই

কুড়িটির মধ্যে মাত্র একটির স্যুপ খারাপ হ'ল। বাতাসের ধুলোবালির মধ্যে জীবাণুর অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর মনে আর কোন সংশয় রইল না। আনন্দে আত্মহারা হয়ে তিনি ঘরে ফিরলেন।

ফ্রান্স চিরকালই সুরার জন্যে বিখ্যাত। অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ আঙুর থেকে সুরা তৈরি করে আসছে। আঙুর পিষে একটি ভাঁটিতে রেখে দেওয়া হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই সেই রস গেঁজে ওঠে এবং সুরায় পরিণত হয়। এর কারণ কি? পাস্তুর এ-সম্পর্কে গবেষণা শুরু করলেন।

পাস্তুর দেখলেন, আঙুর যখন পাকে, তখন তার গায়ে সাদা একরকম ছাতা পড়ে। এই ছাতার মধ্যে থাকে একরকম উদ্ভিদাণু। এর নাম খমির বা সুরাসার (yeast)। আঙুরের সঙ্গে এদেরও পেষা হয়, ভাঁটিতে এদেরই ক্রিয়ায় আঙুরের গ্লুকোজ (বা, দ্রাক্ষা-শর্করা) সুরায় পরিণত হয়। সেই সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের বুদ্‌বুদ্‌ উঠতে থাকে বলে প্রচুর ফেনার সৃষ্টি হয়। মনে হয়, দ্রবণটি যেন ফুটছে। একে বলা হয় কিণ্বন-প্রক্রিয়া (fermentation; Gk. *Fervere*=to boil)।

আঙুরের গায়ে এই উদ্ভিদাণু আসে কোথা থেকে? পাস্তুর বললেন, এই উদ্ভিদাণুর বীজ ছড়ানো আছে বাতাসে। সেখান থেকেই তা আঙুরের গায়ে অঙ্কুরিত হয়। পরীক্ষার সাহায্যে একথা তিনি প্রমাণও করলেন। আঙুর পাকবার আগেই তার গায়ে তুলো জড়িয়ে বেঁধে রাখলেন। আঙুর যখন পাকলো, তখন দেখা গেল, তার গায়ে কোনো ছাতা নেই। এই আঙুর পিষে তার রস ভাঁটিতে রাখা হ'ল। কিন্তু তা গেঁজে উঠল না, সুরাতেও পরিণত হ'ল না। এতদিনে সুরা তৈরি হওয়ার প্রকৃত কারণ জানা গেল।

এই সময় পাস্তুরের এক ছাত্র এসে খবর দিল, তার বাবার সুরা-শিল্প নষ্ট হতে বসেছে। কারণ, ভাঁটিতে আঙুরের রস টকে যাচ্ছে, সুরায় পরিণত হচ্ছে না। পাস্তুর ভাঁটির রস এনে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের

নীচে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, যে রস টকে গেছে, তার মধ্যে খমির নেই, তার বদলে রয়েছে খুব ছোট সরু কাঠির মতো একপ্রকার জীবাণু। কতকগুলি একসঙ্গে দলা পাকিয়ে রয়েছে, আবার কতকগুলি নড়ছে, ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। বোঝা গেল, এদের ক্রিয়াতেই আঙুরের রস টকে যাচ্ছে। নানারকম পরীক্ষা ক'রে পাস্তুর দেখলেন, আঙুরের রস কিছুক্ষণের জন্যে গরম ক'রে রাখলে (৫০°—৬০° সে.) এই জীবাণু মরে যায়। তখন এর সঙ্গে অল্প একটু খমির মিশিয়ে রেখে দিলেই তা সুরায় পরিণত হয়, টকে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। পাস্তুরের উপদেশ অনুসরণ করায় ফ্রান্সের সুরা-শিল্প রক্ষা পেল। আর পাস্তুরের জীবাণু-তত্ত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল।

এরপর পাস্তুর দেখালেন, দুধে এক প্রকার জীবাণু থাকে, যার জন্যে দুধ টকে নষ্ট হয়ে যায়। তিনি দুধ জীবাণুমুক্ত করার একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। এই পদ্ধতিতে দুধ গরম ক'রে তার পর হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা করা হয় (chilled)। এর ফলে দুধ জীবাণুশূন্য হয়ে যায়। এর নাম 'পাস্তুরিতকরণ' (pasteurization)। এইরূপ দুধ অনেক বেশী সময় ধরে অপরিবর্তিত থাকে।

১৮৬৫ সালে ফ্রান্সের রেশম-শিল্প এক গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন হ'ল। মারাত্মক পেব্রিন রোগে রেশমকীট দলে দলে মারা যেতে লাগল। পাস্তুরের উপর এর প্রতিকারের ভার পড়ল। পরীক্ষার ফলে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি রোগগ্রস্ত কীটের দেহে এই রোগের জীবাণু আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন। তাঁর নির্দেশমত রোগগ্রস্ত কীটগুলি ধ্বংস করার এবং সুস্থ কীটগুলিকে তাদের সংস্রব থেকে মুক্ত ক'রে রাখার ব্যবস্থা করা হ'ল। এইভাবে ফ্রান্সের রেশম-শিল্প নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেল। আর একথাও নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হ'ল যে, একপ্রকার জীবাণুর সাহায্যেই মারাত্মক পেব্রিন রোগ সংক্রামিত হয়। এর ফলে পাস্তুরের জীবাণু-তত্ত্ব সুদৃঢ় ভিত্তিতে

প্রতিষ্ঠিত হ'ল বলা যায়। সুতরাং, এই আবিষ্কারের কথা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

এরপর থেকেই পাস্তুর প্রচার করতে লাগলেন যে, বায়ুবাহিত নানাপ্রকার জীবাণু দৈবাৎ মানুষের দেহে প্রবেশ করে এবং সেখানেই বংশবিস্তার করতে থাকে। আর তাদের ক্রিয়াতেই নানাপ্রকার রোগের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় নি, তাই তাঁর এই মতবাদ কেউ গ্রহণ ক'রল না। তবে পাস্তুরের গবেষণার ফলে একটি নতুন পথের সন্ধান পাওয়া গেল।

চিত্র ৭। রবার্ট কক্।

সেই অন্ধকার অজানা পথে অভিযাত্রীদের আনাগোনা শুরু হ'ল। এ বিষয়ে যিনি সর্বপ্রথম সাফল্য অর্জন করলেন, তিনি হলেন জার্মান বিজ্ঞানী রবার্ট কক্ (Robert Koch) (১৮৪৩—১৯১০)।

রবার্ট কক্ জার্মেনির গএটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ ক'রে বেরুলেন, ১৮৬৬ সালে। এরপর ডাক্তার হিসেবে প্রাক্‌টিস্ শুরু করলেন। কিন্তু কক্ কোনো জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারেন না, প্র্যাক্‌টিসে্ মন বসে না। তিনি সামান্য যা উপার্জন করেন, স্ত্রী এম্মি কিন্তু তাতেই খুশী।

এই অবস্থায় তাঁরা পূর্ব-প্রুসিয়ার অন্তর্গত ভোল্‌স্টাইনে এলেন। এখানে আসার পর, আঠাশতম জন্মদিনে, স্ত্রী এম্মি তাঁকে একটি অণুবীক্ষণ-যন্ত্র (Microscope) উপহার দিলেন। আর তাইতেই

তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মজীবন একেবারে পাল্টে গেল, স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি খ্যাতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করলেন।

ইউরোপের দেশে দেশে তখন গরু-ভেড়ার মড়ক লেগেছে। মারাত্মক অ্যান্থ্রাক্স রোগ এক-একটি গ্রামে ঢোকে আর পালকে পাল গরু-ভেড়ার মৃত্যু হয়। এই রোগের কারণ নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে কক্ গবেষণা শুরু করলেন। একটি শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের (বা, অণুবীনের) সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে কক্ বুঝতে পারলেন যে, অ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত জীবজন্তুর রক্তে সরু কাঠির মতো জীবাণু দেখা যায়। এরাই যে প্রকৃতপক্ষে অ্যান্থ্রাক্স রোগের জন্যে দায়ী, তা প্রমাণ করা দরকার।

কক্ ভাবলেন, জীবাণুভরা দূষিত রক্তের সাহায্যে যদি সুস্থ সবল পশুর দেহে এই রোগ সংক্রামিত করা যায়, তাহলেই তাঁর ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হবে। কক্ পরীক্ষা শুরু করলেন।

একটি কাচের স্লাইড গরম ক'রে জীবাণুশূন্য করলেন। এর মাঝে ছোট্ট একটি গর্ত, তার মধ্যে সদ্য বধকরা ষাঁড়ের চক্ষুরস এক ফোঁটা নিলেন। একটি সরু কাঠির সাহায্যে অ্যান্থ্রাক্স রোগে মৃত একটি পশুর রক্ত ঐ রসের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন। এরপর গর্তের চারিদিকে ভেসেলিন মাখিয়ে তার উপর আর একটি স্লাইড চাপা দিলেন। বাইরের কোন জীবাণু ঐ রসের মধ্যে ঢুকতে না পারে, তাই এতো সাবধানতা। কক্ স্লাইডখানা অণুবীনের তলায় রেখে পরীক্ষা করতে লাগলেন। দু'ঘণ্টা ধরে ক্রমাগত দেখলেন, কিছুই হ'ল না। কিন্তু তারপরই এক আজব কাণ্ড ঘটল।

হঠাৎ এক সময়ে কক্ দেখতে পেলেন, কোন্ মায়াবলে যেন একটি জীবাণু ভেঙে দু'টি হ'ল, দু'টি ভেঙে চারটি হ'ল। দেখতে দেখতে সমগ্র চক্ষুরস হাজার হাজার জীবাণুতে ছেয়ে গেল। পরিষ্কার চক্ষুরস দেখতে দেখতে ঘোলাটে হয়ে গেল। চোখের পলকে এমন ভোজ-বাজীর খেলা দেখে তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। এক

ফোঁটা চক্ষুরসে অল্প সময়ের মধ্যেই যদি এতো হাজার হাজার জীবাণুর সৃষ্টি হয়, তাহলে চব্বিশ ঘণ্টায় একটি পশুর দেহে না জানি কত কোটি কোটি জীবাণু জন্মায়! কক্ বুঝলেন, কি জন্যে এই জীবাণুর আক্রমণে এতো তাড়াতাড়ি গবাদি পশু মরে কাঠ হয়ে যায়।

কক্ আর একটি স্লাইড তৈরি করলেন। একটি সরু কাঠির সাহায্যে ঐ ঘোলাটে রস এক ফোঁটা নিয়ে তা আর এক ফোঁটা চক্ষুরসের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন। পরদিন পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, এই রসও ঘোলাটে হয়ে গেছে, আর তার মধ্যে রয়েছে হাজার হাজার জীবাণু। এইভাবে বারবার পরীক্ষা ক'রেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দেখলেন। বুঝলেন, অনুকূল প্রতিবেশ পেলে, এই জীবাণু দ্রুত বংশ-বিস্তার করতে পারে।

কক্ এবারে স্লাইড থেকে একটুখানি ঘোলাটে রস নিয়ে তা একটি ইঁদুরের দেহে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। পরদিন দেখলেন, ইঁদুরটি মরে পড়ে রয়েছে। তার রক্তে দেখা গেল, হাজার হাজার জীবাণু! তিনি এরপর গিনিপিগ, খরগোস এবং ভেড়ার দেহে এই জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দিলেন। প্রত্যেকটি প্রাণী অ্যানথ্রাক্স রোগে মারা গেল। প্রত্যেকটি প্রাণীর রক্তেই এই জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেল। ককের অক্লান্ত সাধনার ফলে এইভাবে ১৮৭৫ সালে পাস্তুরের জীবাণু-তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল।

অ্যান্থ্রাক্স-রোগ প্রধানতঃ গবাদি পশুর হয়, একথা ঠিক। কিন্তু অনেক সময় মানুষেরও এই রোগ হতে দেখা যায়। কাজেই জীবাণু-শিকারীদের কাছে এই আবিষ্কারের ঐতিহাসিক মূল্য খুবই বেশী। বাস্তবিক, জীবাণু-তত্ত্বের দিক্ দিয়ে এই হ'ল সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। তাই জীবাণু-শিকারের ইতিহাসে কক্-এর নাম চিরকাল লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে।

এরপর ১৮৮২ সালে তিনি যক্ষা-রোগের জীবাণু আবিষ্কার

করেন। কলেরা-রোগের কারণ অনুসন্ধানের জন্য তিনি প্রথমে মিশরে যান এবং পরে ভারতবর্ষে আসেন, এবং কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে গবেষণা ক'রে ১৮৮৪ সালে তিনি কলেরা-রোগের জীবাণু (Comma bacillus) আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। এরপর বোম্বাই গিয়ে প্লেগ সম্পর্কে এবং পূর্ব আফ্রিকায় গিয়ে কুম্ভকর্ণ রোগ (Sleeping sickness) সম্পর্কেও তিনি উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন। যখনই কোনো দেশে কোনো একটি রোগ মহামারী আকারে দেখা দিত, তখনই তিনি সেই দেশে গিয়ে হাজির হতেন এবং জীবাণুর সন্ধানে গবেষণা শুরু ক'রে দিতেন। এমনি ক'রে আবিষ্কারের নেশায় কক্ ইটালী, মিশর, ভারতবর্ষ, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। জীবাণু-বিস্থায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে, এই বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে নোবেল-পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

রূপকথার রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র আর কোটালপুত্র, বেরিয়েছিলেন রাক্ষস-খোক্কসদের বিনাশ ক'রবার সঙ্কল্প নিয়ে। অনেক অনুসন্ধান আর অনেক অধ্যবসায়ের ফলে একে একে অনেকেরই প্রকৃত পরিচয় তাঁরা জানতে পারলেন, তাদের প্রাণ-ভোমরার সন্ধান পেলেন। তাদের ধ্বংস করারও ব্যবস্থা হ'ল। তাই দেশ থেকে রাক্ষস-খোক্কসদের উৎপাত অনেক কমে গেল।

নানাপ্রকার রোগোৎপাদক জীবাণুর কথা

কক্-এর প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে অন্যান্য বিজ্ঞানীরা ক্রমে আরও অনেক রকম জীবাণু আবিষ্কার করেছেন, এবং তাদের জীবন-ধারা ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন যে, নানান ধরনের জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করলে, আমরা নানারকম রোগে আক্রান্ত হই। শুধু তাই নয়, গবেষণাগারে তাদের 'কাল্চার' বা চাষ ক'রবারও ব্যবস্থা হয়েছে, এবং কিভাবে তাদের ক্রিয়া নষ্ট করা যায়, তারও বিবিধ উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে।

জীবাণুর শ্রেণীবিভাগ :

আজ পর্যন্ত যত প্রকার জীবাণুর কথা জানা গেছে, তাদের মোটামুটিভাবে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—(১) ব্যাক্টিরিয়া, (২) রিকেট্সিয়াস, (৩) ভাইরাস এবং (৪) প্রোটোজোয়া।

ব্যাক্টিরিয়া হ'ল ছত্রাক-জাতীয় উদ্ভিদাণু। উদ্ভিদ্ হলেও এদের দেহে সবুজ কণা থাকে না ; তাই এরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না। এরা সাধারণতঃ পরজীবী, অর্থাৎ কোন জীবদেহে বাসা বাঁধে এবং সেখান থেকেই আহার্য সংগ্রহ ক'রে বেঁচে থাকে। যে-সব জীবাণু এতো ছোট যে, অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও দেখা সম্ভব হয় না, তাদের বলা হয় ভাইরাস। ব্যাক্টিরিয়ার চেয়ে ছোট, অথচ ভাইরাসের চেয়ে বড়, এইরূপ জীবাণুকে সাধারণভাবে রিকেট্সিয়াস বলা হয়। আর এককোষী প্রাণীদের সাধারণভাবে প্রোটোজোয়া বলা হয়। এদের কোষের মধ্যে নিউক্লিয়াস স্পষ্ট দেখা যায়, এবং এদের মধ্যে প্রাণীর কতকগুলি বৈশিষ্ট্যই পরিস্ফুট।

ব্যাক্টিরিয়া :

ব্যাক্টিরিয়ার শ্রেণীবিভাগ—এরা এতো ছোট যে, একটা আলপিনের মাথায় এক সঙ্গে হাজার হাজার ব্যাক্টিরিয়া থাকতে পারে। সব চেয়ে বড় যে ব্যাক্টিরিয়ার কথা জানা গেছে, তা লম্বায়

মাত্র ১/২৫০ ইঞ্চি, আর সব চেয়ে ছোট যে জীবাণু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গেছে, তার দৈর্ঘ্য মাত্র ১/২৫০০০ ইঞ্চি। এদের সবাই যে আমাদের শত্রু তা নয়, এদের কেউ কেউ জীবদেহে বাস ক'রে নানাপ্রকার জৈবক্রিয়ায় সাহায্য করে। বর্তমান প্রবন্ধে অবশ্য শুধু অনিষ্টকারী ব্যাক্টিরিয়ার কথাই আলোচনা করা হয়েছে। আকৃতি অনুসারে এদের প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(ক) কক্কাস্ (Coccus)—এরা গোলাকার। জীবাণুর কোষগুলি সাধারণতঃ এককভাবে থাকে। কতকগুলি পরপর পুঁতির মালার মতো সাজানো থাকে, যেমন-স্ট্রেপ্‌টোকক্কাস; আবার কতকগুলি এক সঙ্গে ডেলা-পাকানো অবস্থায় থাকে, যেমন—স্ট্যাফাইলোকক্কাস। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে তারা জোড়াবেঁধে থাকে; যেমন—গনোকক্কাস।

(খ) ব্যাসিলাস (Bacillus)—এরা দেখতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রড বা কাঠির মতো। এদের আবার দুটো ভাগ আছে। অ্যান্‌থ্রাক্স, টিটেনাস প্রভৃতি রোগের জীবাণু স্পোর বা বীজরেণুর সাহায্যে বংশ-বিস্তার করে। অন্যান্য কতকগুলি জীবাণু আবার এণ্ডোস্পোর তৈরি করতে পারে। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় থাকলেও এণ্ডোস্পোর সহজে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। ব্যাসিলাস-জাতীয় জীবাণু একক থাকতে পারে; যেমন—ডিফ্‌থেরিয়া জীবাণু; অথবা শৃঙ্খলের মতো সাজানো থাকতে পারে; যেমন—স্ট্রেপ্‌টোব্যাসিলাস। আবার কোন কোন জীবাণুর গায়ে একাধিক লেজের মত উপাঙ্গ থাকতে পারে; যেমন—টাইফয়েড ব্যাসিলাস।

(গ) স্পাইরিলাম (Spirillum)—যেমন—স্পাইরিলাম কলেরি, স্পাইরোকিটা প্যালিডা ইত্যাদি। দেখতে স্ক্রুর মতো প্যাঁচালো।

এসব জীবাণুর কার্যকলাপ ভাল ক'রে লক্ষ্য করতে হলে পরীক্ষাগারে তাদের কাল্‌চার বা চাষ ক'রবার প্রয়োজন হয়। আমাদের পরিচিত অধিকাংশ উদ্ভিদ্ যেমন বীজ থেকে জন্মে,
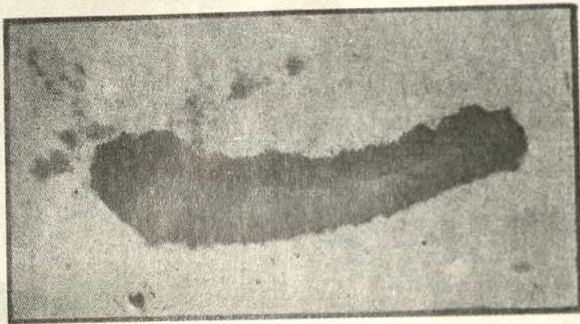
টিউবারকুল ব্যাসিলাস—ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে গৃহীত আলোকচিত্র।

[প্রায় ২২,০০০ গুণ বিবর্ধিত]

পলিওমায়েলাইটিস ভাইরাস কণাসমূহ—ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে গৃহীত আলোকচিত্র।

[প্রায় ১,০০,০০০ গুণ বিবর্ধিত]

এর আগে অস্ত্রোপচারের পর শতকরা তেতাল্লিশটি রোগীই মারা যেত, কিন্তু লিস্টারের নতুন ব্যবস্থায় মৃত্যুর হার শতকরা পনেরটিতে নেমে এলো। আজকাল অবশ্য লাইজল, ডেটল প্রভৃতি আরও কতকগুলি ভাল ভাল জীবাণুনাশক ওষুধের প্রচলন হয়েছে।
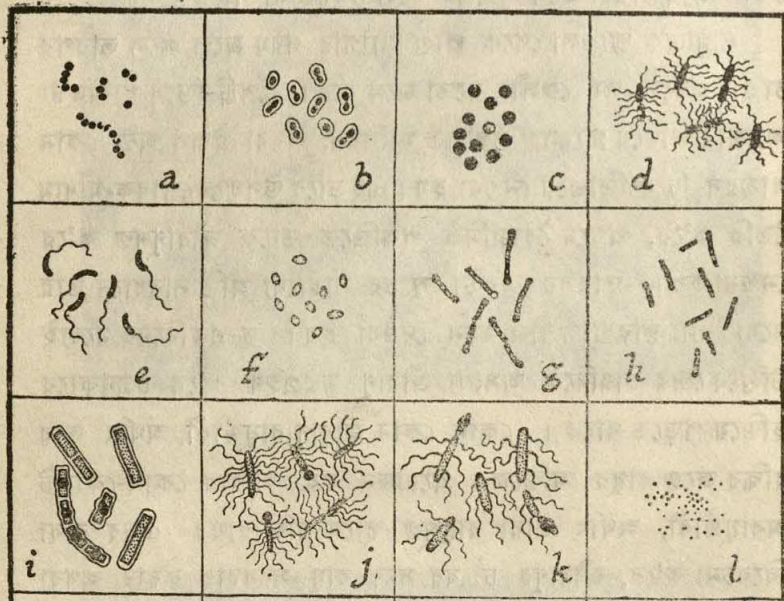
চিত্র ৮। কয়েক প্রকার রোগোৎপাদক ব্যাক্‌টিরিয়া (প্রতিটি এক হাজার গুণ বিবর্ধিত)—a. স্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্ পায়োজেনিস (সেপ্‌টিসিমিয়া, টন্‌সিলাইটিস্ প্রভৃতি রোগের জন্য দায়ী); b. নিউমোকক্কাস্ (নিউমোনিয়া রোগের জীবাণু); c. স্ট্যাফাইলোকক্কাস্ পায়োজেনিস (নানারকম ক্ষত, ফোঁড়া প্রভৃতির জন্য দায়ী); d. ব্যাসিলাস্ কোলাই (টাইফয়েড রোগের জীবাণুও দেখতে অনেকটা এই রকম); e. ভিবরিও কলেরী (কলেরার জীবাণু); f. ব্যাসিলাস্ পেস্টিস্ (প্লেগের জীবাণু); g. ব্যাসিলাস্ ডিফ্‌থেরিয়ী (ডিফ্‌থেরিয়ার জীবাণু); h. ব্যাসিলাস্ টিউবারকিউলেসিস্ (যক্ষ্মা-রোগের জীবাণু); i. ব্যাসিলাস্ অ্যান্‌থ্‌রাসিস্ (অ্যান্‌থ্‌রাক্স রোগের জীবাণু); j. ব্যাসিলাস্ টিটানি (দু'টি স্পোর বা বীজরেণুসহ (ধনুষ্টঙ্কার রোগের জীবাণু); k. ব্যাসিলাস্ বটুলিনাস্ (খাদ্যে বিষক্রিয়ার জন্যে দায়ী); l. বসন্ত রোগের ভাইরাস্।

এই জাতীয় জীবাণু দেহে প্রবেশ করলেই রক্তের শ্বেত কণিকা-গুলি ছুটে এসে তাদের আক্রমণ করে এবং ধ্বংস করবার চেষ্টা করে। এই সংগ্রামের ফলে যে-সব শ্বেতকণিকা মরে যায়, তাদের মৃতদেহ থেকেই পূযের সৃষ্টি হয়। এই যুদ্ধে যদি জীবাণুরাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয় তবে আর রক্ষা নেই। ক্ষত, ফোড়া, ব্রণ প্রভৃতি থেকে জীবাণুগুলি ক্রমশঃ রক্তস্রোতে মিশে যেতে থাকে। তখনই সেপ্‌টি-সিমিয়া বা রক্তদুষ্টি, ইরিসিপেলাস প্রভৃতি মারাত্মক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এতে রোগী ক্রমশঃ জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে এবং দু-এক দিনের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটে।

১৯৩৪ সালে বিজ্ঞানী ডোম্যাগ (Domagk) এই জাতীয় জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রণ্টোসিল প্রয়োগ ক'রে খুব সুফল লাভ করেন। পরে দেখা গেল, এ থেকে উদ্ভূত সাল্‌ফ্যানিলঅ্যামাইডই প্রকৃতপক্ষে জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকরী হয়। সেই থেকে সাল্‌ফা-জাতীয় ওষুধের প্রচলন হয়। কালক্রমে এর চেয়েও বহুগুণ শক্তিশালী ওষুধ পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হয়েছে। সময় মত চিকিৎসা করলে, পেনিসিলিনের সাহায্যে ঐ রকমের যে-কোন মারাত্মক রোগীকে সুস্থ ক'রে তোলা যায়।

আর একটা মারাত্মক রোগ হ'ল নিউমোনিয়া, আর তার জন্য দায়ী নিউমোকক্কাস (Pneumococcus) জীবাণু। এতে রোগীর ফুস্‌ফুস আক্রান্ত হয় এবং প্রবল জ্বরের সঙ্গে ক্রমশঃ শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। রোগীর থুথু, ফুস্‌ফুস এবং রক্তে এই জীবাণুর সন্ধান পাওয়া যায়। আজকাল সাল্‌ফা-জাতীয় ওষুধ অথবা পেনিসিলিনের সাহায্যে এইরূপ রোগীকে সহজেই নিরাময় করা যায়।

মারাত্মক যৌনব্যাধি গনোরিয়ার জন্যে দায়ী হলো গনোকক্কাস (Gonococcus) জীবাণু। রোগীর ক্ষতের পূয পরীক্ষা করলে তাতে অসংখ্য জীবাণুর সন্ধান পাওয়া যায়। জীবাণুগুলি সাধারণতঃ জোড়া বেঁধে থাকে। ব্যাধিগ্রস্ত নর-নারীর মধ্যে যৌন-সংস্পর্শের ফলে,

প্রথমে জননেন্দ্রিয়ে রোগ-জীবাণু সংক্রামিত হয়, এবং চার-পাঁচদিন পরেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এ থেকে বাতব্যাধি, চোখের অসুখ, পুরুষত্বহীনতা, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি উৎকট রোগের সৃষ্টি হতে পারে। এই রোগ ভয়ানক সংক্রামক।

ব্যাসিলাস-ঘটিত ব্যাধি—ক্লস্ট্রিডিয়াম টিটানি (*Clostridium tetani*) নামক জীবাণুর সাহায্যে টিটানাস বা ধনুষ্টঙ্কার রোগ সংক্রামিত হয়। মাটিতে, বিশেষ ক'রে জীবজন্তুর ঘোড়ার মলের সংস্পর্শযুক্ত মাটিতে, এই জীবাণু থাকে। ক্ষতস্থানের সংস্পর্শে এলে সেখান দিয়ে জীবাণু দেহে প্রবেশ করে। তখন রোগীর প্রবল জ্বর হয়, ভীষণ খেঁচুনী হতে থাকে এবং দাঁতে দাঁত লেগে যায় (Lock-jaw)। এই অবস্থায় রোগীকে বাঁচানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। সেজন্যে দুর্ঘটনার ফলে রাস্তাঘাটে ক্ষত সৃষ্টি হলে প্রতিষেধক অ্যান্টিটক্সিন সিরাম ইন্‌জেক্‌শন নিতে হয়। তাহলে দেহে জীবাণু প্রবেশ ক'রে থাকলেও তা আর কোন অনিষ্ট করতে পারে না।

ডিফ্‌থেরিয়া রোগ সাধারণতঃ শিশুদেরই হয়। এজন্যে দায়ী হ'ল মুগুরের মতো আকৃতিবিশিষ্ট ডিফ্‌থেরিয়া ব্যাসিলাস (*Bacillus diptheriae*)। দেহে জীবাণু প্রবেশ করলে, প্রথমে সামান্য জ্বর হয়, গলা ফুলে ওঠে এবং তরল খাদ্য গিলতেও কষ্ট হয়। এর পরেই গলায় বা টন্‌সিলের উপর সাদা পর্দার মতো জমতে দেখা যায়। গলার গ্রন্থিগুলি আরও ফুলে যায় এবং ক্রমশঃ শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে থাকে। অনেক সময় এই অবস্থায় গলার শ্বাসনালীতে ফুটা ক'রে না দিলে, শ্বাসবন্ধ হয়েই শিশুর মৃত্যু হয়। ডিফ্‌থেরিয়া অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাধি। রোগ সংক্রমণের প্রথম বা দ্বিতীয় দিনের মধ্যেই চিকিৎসা শুরু না করলে, রোগীকে বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়ে। অবশ্য এর অব্যর্থ প্রতিষেধক, অ্যান্টিটক্সিন সিরাম, আবিষ্কৃত হয়েছে। আজকাল এই রোগের টিকাও বেরিয়েছে। ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা ক'রে তারপর শিশুকে প্রতিষেধক টিকা দিতে পারলে ভাল হয়।

ব্যাসিলারী ডিসেন্ট্রি খুব মারাত্মক ধরনের আন্ত্রিক রোগ। অনেক সময় বমির ভাব থাকে এবং রোগী বমি করে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী কিউশি শিগা আমাশয় রোগীর মলে এই জীবাণুর সন্ধান পান। তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে "শিগেলা ব্যাসিলাস", আর এই রোগের নাম "শিগেলোসিস্"। দূষিত খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে এই জীবাণু দেহে প্রবেশ করলে, তা পাকস্থলী অতিক্রম ক'রে ক্ষুদ্রান্ত্রে এবং বৃহদন্ত্রে গিয়ে বাসা বাঁধে, এবং সেখানে দ্রুত বংশবিস্তার করতে থাকে। এর ফলে ছোট ছোট ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এজন্য দেহে জীবাণু প্রবেশ করার ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রধান লক্ষণগুলি হ'ল—জ্বর, পেট ব্যথা, পেটে মোচড় দিয়ে বার বার পায়খানা হওয়া, শ্লেষ্মা-মিশ্রিত কিংবা শ্লেষ্মা ও রক্তমিশ্রিত, অথবা জলের মতো, মলত্যাগ প্রভৃতি। এই রোগে সাল্‌ফা-জাতীয় কতকগুলি ওষুধ, ফুরোক্সোন অথবা অ্যান্টিবায়োটিক বা জীবাণু-শাসক প্রয়োগ ক'রে বেশ সুফল পাওয়া যায়।

টাইফয়েড অন্ত্রের রোগ এবং টাইফয়েড ব্যাসিলাস বা স্যাল্‌মনেলা টাইফি (*Salmonella typhi*) এই রোগের কারণ। এই জীবাণু কাঠির মতো এবং তার গায়ে লেজের মতো অনেকগুলি উপাঙ্গ থাকে। খাদ্য ও পানীয়—বিশেষ করে জল, দুধ, বরফ ইত্যাদির সঙ্গে এই জীবাণু পেটে যায়। টাইফয়েডের প্রথম অবস্থায় বিশেষ ধরনের জ্বর হয় এবং সেই সঙ্গে পেটও খারাপ হয়। রোগীর থুথু ও মলমূত্রের সঙ্গে এই জীবাণু বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। আর মাছি, পিঁপড়ে ইত্যাদি রোগ সংক্রমণে সাহায্য করে। এইসব আন্ত্রিক রোগ প্রতিরোধ করতে হলে, জল ফুটিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে তারপর পান করা উচিত, এবং আঢাকা মাছিপড়া খাবার খাওয়া উচিত নয়। আজকাল ক্লোরোমাইসেটিন নামক অ্যান্টিবায়োটিক বা জীবাণু-শাসকের সাহায্যে সহজেই এই মারাত্মক রোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। টাইফয়েডের প্রতিষেধক টিকা অব্যর্থ। একবার

টিকা নিলে অন্ততঃ ছ'মাসের জন্যে এই রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

ক্ষয়রোগের জীবাণু হ'ল টিউবার্কল্ ব্যাসিলাস (Tubercle bacillus) সংক্ষেপে টি. বি. (**T. B.**) অথবা মাইকোব্যাক্‌টিরিয়াম টিউবারকিউলোসিস্। এই জীবাণু দেখতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রড বা কাঠির মতো। এরা ফুস্‌ফুস, শ্বাসনালী, পাকস্থলী, এমন কি হাড়ও আক্রমণ করতে পারে। যক্ষ্মা-রোগের জীবাণু ফুস্‌ফুসে বাসা বাঁধে। সাধারণতঃ রোগীর থুথু থেকেই এই জীবাণু ছড়ায়। ক্ষয় রোগাক্রান্ত গরুর দুধে যক্ষ্মা-জীবাণু থাকতে পারে। কাজেই দুধ ভাল ক'রে না ফুটিয়ে কখনও পান করা উচিত নয়। আজকাল আই. এন. এইচ., পি. এ. এস্. এবং স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন সহযোগে চিকিৎসা ক'রে যক্ষ্মারোগীকে সুস্থ ক'রে তোলা সম্ভব হচ্ছে।

বিউবনিক প্লেগ একটি অত্যন্ত মারাত্মক রোগ। ইতিহাসে দেখা যায়, চতুর্দশ শতাব্দীতে ইউরোপে এই রোগ মহামারীরূপে এমন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, তাতে প্রায় আড়াই কোটি লোক প্রাণ হারিয়েছিল। তাই অনেকে এর নাম দিয়েছেন "ব্ল্যাক ডেথ্" বা কালো মৃত্যু। এই রোগের জন্যে দায়ী জীবাণুর নাম ব্যাসিলাস পেস্টিস্ (*Bacillus pestis*)। ইঁদুরের গায়ে অবস্থানকারী ইঁদুর-মাছি এর বাহক। কোন অঞ্চলে রোগ প্রকাশ পেলেই প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। গন্ধক পোড়ালে, অথবা ন্যাফ্‌থ্যালিন, ডি.ডি.টি. ইত্যাদি ছড়িয়ে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে রাখলে, ইঁদুর-মাছি মরে যায়। কোন অঞ্চলে রোগ প্রকাশ পেলেই সঙ্গে সঙ্গে প্লেগের টিকা নেওয়া উচিত।

স্পাইরিলাম-ঘটিত ব্যাধি—মারাত্মক কলেরা রোগের জন্যে দায়ী জীবাণুর নাম স্পাইরিলাম কলেরি (*spirillum cholerae*), অথবা ভিব্‌রিও কলেরি (*Vibrio cholerae*)। এই জীবাণু দেখতে অনেকটা কমা চিহ্নের মতো, তাই একে অনেক সময় কমা-

ব্যাসিলাসও (Comma bacillus) বলা হয়। এই জীবাণুর লেজের মতো একটি উপাঙ্গ থাকে। কলেরা রোগীর মল-মূত্র, বমি এবং শবদেহে প্রচুর জীবাণু থাকে এবং জল, ধুলো, বাতাস, মাছি, পিঁপড়ে প্রভৃতির সাহায্যে খাদ্য ও পানীয় জীবাণু-দুষ্ট হয়। খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে এই জীবাণু উদরে প্রবেশ করলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগ প্রতিরোধের জন্য জল ফুটিয়ে পান করা উচিত, এবং বাসি, পচা কিংবা আঢাকা মাছিপড়া খাবার, কাটা ফল প্রভৃতি খাওয়া উচিত নয়। কতকগুলি সাল্‌ফা-জাতীয় ওষুধ এই রোগে খুবই কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই রোগ ব্যাপক ভাবে দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষেধক টিকা নেওয়া দরকার।

আর একটি মারাত্মক রোগ হ'ল সিফিলিস (Syphilis) বা উপদংশ। ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, পূর্বে সভ্য-জগতে এই রোগের কথা জানা ছিল না। কলম্বাসের সঙ্গী নাবিকেরা দক্ষিণ আমেরিকায় যাওয়ার পর সেখানকার রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশার ফলে তাদের কেউ কেউ এই রোগে আক্রান্ত হয়। তারাই সর্বপ্রথম এই রোগ সভ্য সমাজে নিয়ে আসে। তারপর থেকেই এই রোগ ক্রমশঃ সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। আগে ভারতবর্ষে এই রোগের কথা জানা ছিল না। সম্ভবতঃ পর্তুগীজ নাবিক এবং ব্যবসায়ীদের সাহায্যেই প্রথম এই রোগ আমাদের দেশে আমদানী হয়েছিল। তাই আয়ুর্বেদশাস্ত্রে এর নাম দেওয়া হয়েছে ফিরিঙ্গি-রোগ।

এই রোগের জীবাণুর নাম স্পাইরোকিটা প্যালিডা (*Spirochaeta Pallida*)। এই জীবাণু দেখতে সরু এবং লম্বা, এবং হাতল ছাড়া কর্ক-স্ক্রুর মতো প্যাঁচালো। একটি জীবাণুর দেহে এইরূপ ৬টি থেকে ১৪টি পর্যন্ত প্যাঁচ থাকতে পারে। অন্যান্য ব্যাক্টিরিয়ার মতো এরও নিউক্লিয়াস দেখা যায় না। আপাতদৃষ্টিতে একে ব্যাক্টিরিয়া বলেই মনে হয়, কিন্তু এরা কঠিন পেশীর ভিতর দিয়েও পথ করে

এগিয়ে যেতে পারে, যা আর কোন ব্যাক্টিরিয়ার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এদের ব্যাক্টিরিয়া অথবা প্রোটোজোয়া—কি বলা হবে, তাই নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা দিয়েছে। যাঁরা একে প্রোটোজোয়ার অন্তর্ভুক্ত করবার পক্ষপাতী, তাঁরা এর নাম দিয়েছেন ট্রিপোনিমা প্যালিডা (*Treponema Pallida*)।

গনোরিয়ার মতো সিফিলিসও মারাত্মক যৌন ব্যাধি। এই রোগ অত্যন্ত ছোঁয়াচে। কাজেই এই জাতীয় রোগী সম্পর্কে সর্বদাই অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত। তবে সৌভাগ্যের কথা এই যে, উপযুক্ত ক্ষেত্র ছাড়া দেহের বাইরে এই জীবাণু বেশীক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে না।

রোগের প্রথম অবস্থায় যে ক্ষত সৃষ্ট হয় তা সাধারণ চিকিৎসাতেই সেরে যেতে পারে। কিন্তু তা হলেও তার দেহের মধ্যে কিছু জীবাণু থেকে যায়। কিছুদিনের মধ্যেই এইসব জীবাণু রক্তে ছড়িয়ে পড়ে, তখন রোগের দ্বিতীয় অবস্থা প্রকাশ পায়। এই সময় কোন কোন রোগীর সারা গায়ে বসন্তের গুটির মতো অসংখ্য গুটিকা দেখা দেয়।

রঙিন চিত্র II—[চিত্র-পরিচিতি] ——→

1. মারাত্মক মেনিন্‌জাইটিস্ রোগে আক্রান্ত রোগীর দেহ থেকে 'লাম্বার-পাংচার'-পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তরল পদার্থে—'মেনিংগোকক্কাই'। [লীশ্ম্যান-পদ্ধতিতে রঞ্জিত।]

2. ১৮ ঘণ্টার কাল্‌চারে (বা, চাষে) 'ব্যাসিলাস্ ডিফ্থেরিয়ী'। [নাইসার-পদ্ধতিতে রঞ্জিত, এবং এরিথ্রোসিন্ দ্বারা পুনরায় রঞ্জিত।]

3. ৫ দিনের কাল্‌চারে (বা, চাষে) 'ব্যাসিলাস্ ডিফ্থেরিয়ী। [নাইসার-পদ্ধতিতে রঞ্জিত, এবং এরিথ্রোসিন্ দ্বারা পুনরায় রঞ্জিত।]

4. কুষ্ঠরোগাক্রান্ত টিস্যুর ছেদ—লাল রঙে রঞ্জিত অসংখ্য 'মাইকোব্যাক্টিরিয়াম লেপ্রি' দেখা যাচ্ছে। [কারবল-ফুক্‌সিন এবং মেথিলিন ব্লু-দ্বারা রঞ্জিত।]

5. প্লেগ-রোগের জীবাণু 'ব্যাসিলাস পেস্টিস্ (লবণ-অ্যাগার-কাল্‌চার)। [থাইওনিন-দ্বারা রঞ্জিত।]
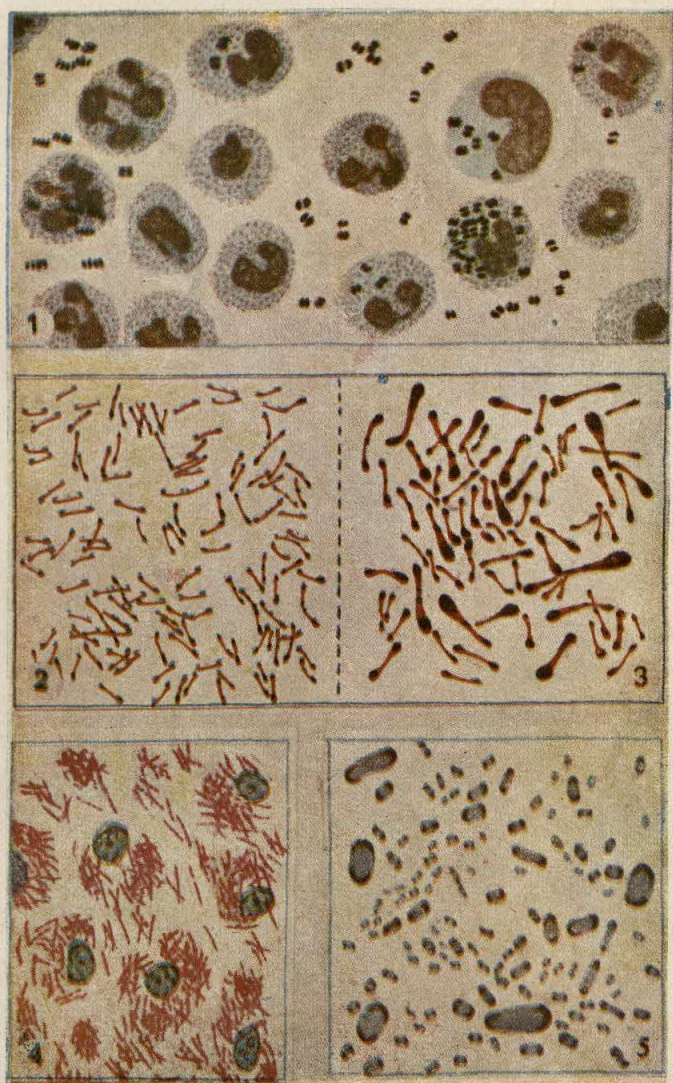
[চিত্র-পরিচিতি—বাঁদিকের পাতায়।]

[শ্রীভোলানাথ রায়-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

এরপর কিছুদিনের মধ্যেই দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ক্রমাগত দশ-বিশ বছর ধরে এই রোগ পুষে রাখা অসম্ভব নয়। দেহের মধ্যে এই রোগ-জীবাণু বেশী দিন ধরে বাসা বেঁধে থাকলে, শেষ পর্যন্ত রোগী উন্মাদ হয়ে যায়। এই হ'ল রোগের তৃতীয় বা শেষ অবস্থা। আর একটা কথা, পিতা-মাতার এই রোগ থাকলে, তা সন্তান-সন্ততির দেহেও সংক্রামিত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে বাহ্যিক কোন ক্ষত নাও থাকতে পারে। তবে রক্ত নিয়ে ভ্যাসারম্যান পরীক্ষা করলে, জীবাণুর অস্তিত্ব ধরা পড়ে। স্যালভার্সন, নিওস্যালভার্সন কিংবা সাল্‌ফানিল্যামাইড প্রয়োগ ক'রে এই রোগ সারানো যেতে পারে। আজকাল অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হচ্ছে।

রিকেটসিয়াস্ (Rickettsias) **:**

এই শ্রেণীর জীবাণু ব্যাক্‌টিরিয়ার চেয়ে ছোট, কিন্তু ভাইরাসের চেয়ে বড়। মারাত্মক টাইফাস (Typhus) রোগের জীবাণু (*Rickettsia rickettsi*) এই জাতীয়। উকুন এই জীবাণুর বাহক।

ভাইরাস (Virus) **:**

যে-সব জীবাণু এতো ছোট যে অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও দেখা সম্ভব হয় না, তাদের বলা হয় ভাইরাস (Virus)। একমাত্র ইলেক্‌ট্রন-মাইক্রোস্কোপ-এর সাহায্যেই এদের বহুগুণ বর্ধিত চিত্রগ্রহণ করা সম্ভব হয়। এদের ধর্ম খুবই বিস্ময়কর। ভাইরাস মাত্রেই পরজীবী। কিন্তু একটি ভাইরাস যতক্ষণ জীবদেহের মধ্যে থাকে, ততক্ষণই শুধু এর মধ্যে প্রাণের লক্ষণগুলি সব প্রকাশিত হয়। এরা যখন জীবদেহের বাইরে থাকে, তখন এদের মধ্যে প্রাণের কোনো লক্ষণই দেখা যায় না। এদের ধর্ম হয় তখন প্রাণহীন জড়পদার্থের মতই। শুধু তাই নয়, কোন কোন ভাইরাসকে আবার রাসায়নিক পদার্থের মতো কেলাসিত অবস্থায়ও তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। তাই বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ভাইরাসই সুস্পষ্টভাবে প্রাণহীন এবং প্রাণবন্ত বস্তুর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করছে।

সাধারণ সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, পলিওমাইলাইটিস (শিশু পক্ষাঘাত), মাম্পস্, হামজ্বর, বসন্ত প্রভৃতি রোগের জীবাণু এই শ্রেণীর। এগুলি বায়ু-বাহিত জীবাণু। ইন্‌ফেক্‌টিভ হেপাটাইটিস্ নামক একপ্রকার মারাত্মক জণ্ডিস্ (বা, কামলা, বা, ন্যাবা) রোগের জন্য দায়ী একপ্রকার জল-বাহিত ভাইরাস। এছাড়া পীতজ্বর (yellow fever) (একপ্রকার মশক-বাহিত) এবং জলাতঙ্ক (Hydrophobia) (পাগলা-কুকুর বা শেয়াল-বাহিত) রোগের জীবাণু এই শ্রেণীর।

প্রোটোজোয়া (Protozoa) :

এককোষী প্রাণীদের সাধারণভাবে প্রোটোজোয়া (Protozoa) বলা হয়। এদের কোষের মধ্যে নিউক্লিয়াস স্পষ্ট দেখা যায়, এবং

চিত্র ৯ চিত্র ১০
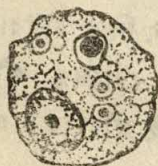
চিত্র ৯। সাধারণ আমাশয় রোগের জীবাণু—এণ্টামিবা হিস্টোলিটিকা (বহুগুণ বিবর্ধিত)।

চিত্র ১০। কুম্ভকর্ণ-রোগ (Sleeping sickness)-এর জীবাণু—ট্রাইপ্যানোসোম (Trypanosome) (বহুগুণ বিবর্ধিত)—একটি অদ্ভুত এককোষী প্রাণী। এ দেখতে অনেকটা চুরুটের মতো। তবে এর দেহের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত আছে সুন্দর স্বচ্ছ নমনীয় পাখনা (যেমন থাকে মাছের বেলায়)। এর পশ্চাৎভাগ বেশ ভোঁতা, আর সেখানে আছে চাবুকের মতো লম্বা একটি লেজ, যা নাড়িয়ে সে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

এদের মধ্যে প্রাণীর প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্যই পরিস্ফুট। সাধারণ আমাশয় (জল-বাহিত), ম্যালেরিয়া (অ্যানোফিলিস মশকী-বাহিত), কালাজ্বর (একপ্রকার বালুকা-মাছি-বাহিত), আফ্রিকার

কুম্ভকর্ণ রোগ (টেট্সি মাছি-বাহিত) প্রভৃতির জীবাণু এই শ্রেণীর। এইসব জীবাণু মানুষ বা জীবজন্তুর দেহে প্রবেশ করলে, রোগের লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়।

মানবদেহে জীবাণু প্রবেশের বিবিধ উপায় ঃ

যে-সব জীবাণু মানবদেহে প্রবেশ ক'রে উপসর্গ সৃষ্টি করে, তাদের বিকারকারী জীবাণু বলা হয়। এইসব জীবাণু নানাভাবে দেহের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। যেমন—

(১) **ত্বক-মাধ্যমে**—ত্বক যতক্ষণ অটুট থাকে, ততক্ষণ ত্বক মারফৎ জীবাণু সংক্রমণ সম্ভব হয় না। কিন্তু দেহের অন্যান্য টিস্যুর তুলনায় ত্বকেরই আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা বেশী। আর ত্বকে কোন ক্ষত সৃষ্টি হলে, সেই পথ দিয়ে জীবাণু অতি সহজেই দেহের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। স্ট্যাফাইলোকক্কাস্ পায়োজেনিস্, স্ট্রেপ্টো-কক্কাস্ পায়োজেনিস্, ক্লস্ট্রিডিয়াম টিটানি প্রভৃতি জীবাণু সাধারণতঃ এইরূপ ক্ষতের মাধ্যমেই দেহের মধ্যে প্রবেশ ক'রে থাকে। প্রত্যক্ষ সংযোগ ছাড়াও, দূষিত বাতাস থেকেও ত্বকের ক্ষতে জীবাণু সংক্রামিত হতে পারে।

(২) **খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে**—রোগগ্রস্ত মানুষের সংস্পর্শে, অথবা মাছি ও পিঁপড়ে দ্বারা, খাদ্য ও পানীয় জীবাণুদুষ্ট হয়। এইরূপ খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করলে, কিংবা দূষিত জল পান করলে, অ্যামিবা-জনিত বা ব্যাসিলাস-জনিত আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড বা আন্ত্রিক জ্বর, ইন্ফেক্টিভ হেপাটাইটিস্, (বা, ভাইর্যাল জণ্ডিস্) পলিওমায়েলাইটিস্ প্রভৃতি রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(৩) **শ্বাসপথে**—কথা বলার সময়, কিংবা হাঁচি ও কাশির সঙ্গে, সূক্ষ্ম বারিবিন্দুসদৃশ শ্লেষ্মকণা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। গুটি-বসন্ত, জল-বসন্ত, হাম, মাম্পস্ বা পানসিকা, ইন্ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগের জীবাণু (virus) এইভাবে ছড়ায়, এবং শ্বাসপথ দিয়েই আমাদের দেহে প্রবেশ করে।

নাসিকা-গহ্বরে অবস্থিত স্ট্যাফাইলোকক্কাস্, নাসাপথ ও গলবিলের সংযোগস্থলে অবস্থিত স্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্, কিংবা ফুসফুসে অবস্থিত যক্ষ্মা-জীবাণু, থুথু বা সিক্‌নির সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসে। তারপর বাতাসে শুষ্ক হয়ে, ধূলিকণার সঙ্গে, এইসব জীবাণু বিস্তার লাভ করে, এবং শ্বাসপথ দিয়ে অন্য সুস্থ মানুষের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। সাধারণতঃ এই ভাবেই ঐসব রোগ ছড়ায়। তাছাড়া রোগীর ব্যবহৃত জামা-কাপড়, রুমাল, বাসনপত্র প্রভৃতি থেকেও ঐসব রোগ ছড়াতে পারে।

(৪) **কীট-পতঙ্গ বা জীব-জন্তুর দংশনের ফলে উৎপন্ন ছিদ্র মারফৎ**—কীট-পতঙ্গের দংশনের ফলে ত্বকে ছিদ্র হয়, আর সেই ছিদ্র মারফৎ ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, পীতজ্বর, টাইফাস্, প্লেগ প্রভৃতি রোগের জীবাণু দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। অবশ্য ঐসব কীট-পতঙ্গ দংশনকালে সৃষ্ট ছিদ্রপথে জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দেয় বলেই ঐসব জীবাণু দেহে প্রবেশ করতে পারে। সুতরাং, ঐসব কীট-পতঙ্গ যদি জীবাণুবাহী না হয়, তাহলে দংশনকালে জীবাণু সংক্রমণের কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

অনুরূপভাবে, পাগলা কুকুর, শিয়াল কিংবা নেকড়ে বাঘের দংশনের ফলে, ত্বকের ছিদ্র মারফৎ, জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু সংক্রামিত হয়ে থাকে।

জীবাণুর আক্রমণে দেহের প্রতিক্রিয়া :

জীবাণু দেহের মধ্যে প্রবেশ করলে, শরীর বা আক্রান্ত টিস্যু কী ভাবে তার মোকাবিলা করবে, তা প্রধানতঃ নির্ভর করে জীবাণুর আগ্রাসী চরিত্রের উপর, এবং সেই সঙ্গে দেহের প্রতিরোধ-ক্ষমতার উপর। এইসব কারণে জীবাণু-প্রবেশের সম্ভাব্য পরিণাম নিম্নরূপ হতে পারে :

(১) জীবাণুর দ্রুত বিনাশ-প্রাপ্তি। অথবা, জীবাণুর ক্ষণিক সংখ্যাবৃদ্ধি, কিন্তু তারপরই দ্রুত বিনাশ।

(২) জীব ও জীবাণুর মিথোজীবিতা (symbiosis), অর্থাৎ সহাবস্থান।

(৩) সীমিত অঞ্চলে জীবাণুর সংখ্যাবৃদ্ধি এবং ঐ অঞ্চলের টিস্যু-বিনষ্টি, কিন্তু জীবাণু বিস্তারের সীমাবদ্ধতা। যেমন, স্ট্যাফাইলোকক্কাস্ জীবাণুর আক্রমণে ফোঁড়ার উদ্ভব।

(৪) সীমিত অঞ্চলেই জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি সীমাবদ্ধ, কিন্তু জীবাণুর বহির্বিষ দ্বারা দূরবর্তী অঞ্চলের ক্ষতিসাধন। এইরূপ বহির্বিষের ক্ষরণ হয় জীবন্ত ও সক্রিয় জীবাণুর দেহ থেকে। যেমন, ডিফ্‌থেরিয়া (diptheria), ধনুষ্টঙ্কার (tetanus) প্রভৃতি রোগে জীবাণুর বহির্বিষই ব্যাধির প্রধান কারণ।

ডিফ্‌থেরিয়া রোগে হৃৎপিণ্ড এবং নার্ভ বা স্নায়ুর যে ক্ষতি হয়, তা ওই বহির্বিষের ক্ষতিকারক ক্রিয়ারই পরিণাম। ধনুষ্টঙ্কার রোগে, জীবাণুর বহির্বিষ সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্কের ক্ষতি সাধন করে।

(৫) স্থানিক টিস্যু আক্লিষ্ট হয়। সেই সঙ্গে জীবাণু দ্রুত বিস্তার লাভ করে। যেমন, স্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্ পায়োজেনিস্ সৃষ্ট সেলুলাইটিস্ (cellulitis) রোগে হয়ে থাকে।

(৬) স্থানিক টিস্যু আক্লিষ্ট হয় না, কিন্তু তা সত্ত্বেও জীবাণু দ্রুত বিস্তার লাভ করে। যেমন, রিকেট্‌সিয়া প্রাওয়াজেকি সৃষ্ট ইউরোপিয়ান টাইফাস্ রোগ।

(৭) সূচনাপর্বে কোনো স্থানিক টিস্যু-আক্লেশ থাকে না, কিন্তু জীবাণু দ্রুত বিস্তার লাভ করে, এবং পরে জীবাণুর প্রবেশমুখে ক্ষত সৃষ্ট হয়। টাইফয়েড বা আন্ত্রিক জ্বরে, রিকেট্‌সিয়া রিকেট্‌সি-জনিত স্ক্র্যাব-টাইফাসে এবং সিফিলিস্ বা উপদংশ-রোগে এইরূপ ক্ষত সৃষ্ট হয়ে থাকে।

(৮) আক্রান্ত স্থানে জীবাণুর সংখ্যাবৃদ্ধি এবং বিষক্ষরণ। এইরূপ অন্তর্বিষ দেহের ক্ষতি সাধন করে, এবং রোগ সৃষ্টি করে। এসবক্ষেত্রে অন্তর্বিষ ক্ষরণ হয় প্রধানতঃ জীবাণুদেহের বিনষ্টির ফলে।

অন্তর্বিষস্রাবী জীবাণুদের সাধারণভাবে আগ্রাসী জীবাণু বলা হয়।

কোন কোন জীবাণু টিস্যুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার ফলে আক্রান্ত স্থানে প্রদাহের সৃষ্টি করে; যেমন, পূয়দ জীবাণু।

জীবাণুর আক্রমণের ফলে সাধারণতঃ দেহের তাপবৃদ্ধি হয়, রক্তের লোহিত কণিকার অবক্ষেপণের হার (Erythrocyte Sedimentation Rate, সংক্ষেপ E. S. R.) বৃদ্ধি হয়, এবং জীবাণুর প্রকৃতি অনুযায়ী শ্বেত কণিকার হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু বিপাকীয় বৈগুণ্য দেখা দেয়; যেমন —নিরুদন (dehydration), প্রোটিন বিশ্লেষণের ফলে মূত্রে অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থের নিষ্ক্রমণ, কিটোসিস্ (Ketosis)-প্রবণতা প্রভৃতি দেখা যায়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগীর থুথু, মল-মূত্র, রক্ত, প্রভৃতি পরীক্ষা ক'রে রোগ সংক্রমণ সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিত হওয়া যায়। এজন্য একটি রোগ নির্ণয় করার ব্যাপারে, চিকিৎসকের কাছে, এসব পরীক্ষা-নীরিক্ষার ফলাফল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তবে অধিকাংশ জীবাণুর ক্ষেত্রেই রোগ সৃষ্টির পদ্ধতি বেশ জটিল, আর সেজন্য রোগ-নির্ণয়ও বেশ কষ্টসাধ্য। ঐসব রোগ সম্পর্কে পরে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

দেহের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা ঃ

ত্বক—ত্বকের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিকভাবেই জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধে সাহায্য করে। যেমন—

(১) বহুস্তরে বিন্যস্ত অধিচ্ছদীয় কোষসমূহ, বহিস্ত্বকের কেরাটিন (Keratin) নামক কঠিন পদার্থের আস্তরণ এবং বহিস্ত্বকের সর্বনিম্নস্তরের ভূম্যাবরণ (basement membrane)—মিলিতভাবে ত্বকের প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য দায়ী। ত্বকে কোনো ক্ষত সৃষ্টি হলে, এই প্রতিরোধ-ক্ষমতা হ্রাস পায়, এবং জীবাণুও সেই সুযোগে

দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। ত্বক যতক্ষণ অটুট থাকে, ততক্ষণ ত্বক-পথে জীবাণুর আক্রমণ সম্ভব হয় না।

যদি কোন প্রকারে ত্বকে কোনো ক্ষত সৃষ্ট হয়, তাহলে সেই ক্ষতের ভিতর দিয়েই স্ট্যাফাইলোকক্কাস, স্ট্রেপ্টোকক্কাস্, ক্লস্ট্রিডিয়া প্রভৃতি জীবাণু শরীরে প্রবেশ করতে পারে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, অতিরিক্ত ঘামের ফলে ত্বকের কেরাটিন-স্তর বিধ্বস্ত হয়। এই কারণে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে, বিশেষ ক'রে গ্রীষ্মকালে, ত্বকের ব্যাধির প্রকোপ বেশী হয়। আর শরীরের আর্দ্র স্থানে, বিশেষ ক'রে বগলে এবং কুঁচকিতে, ফোঁড়া হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

(২) তাছাড়া নিম্নলিখিত তিনটি উপায়ে বিকারকারী জীবাণু অপসারিত হয়ে থাকে :—

(ক) ত্বকের বহিঃস্তরের স্বাভাবিক কোষচ্যুতির ফলে।

(খ) ত্বকের উপরে সাধারণতঃ কয়েকপ্রকার জীবাণু বাসা বেঁধে থাকে। সম্ভবতঃ এরা অ্যান্টিবায়োটিক বা জীবাণু-শাসক পদার্থ উৎপন্ন করে, এবং বিকারকারী জীবাণু অপসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

(গ) ত্বকের স্বেদগ্রন্থি নিঃসৃত স্বেদের অম্ল-পদার্থ অধিকাংশ বিকারকারী জীবাণুকেই বিনষ্ট করে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ত্বকের কোন কোন অংশ, যেমন—বগল, কুঁচকি, হাতের বা পায়ের আঙ্গুলের ফাঁক, এই অম্ল-পদার্থ থেকে বঞ্চিত থাকে, আর এজন্যই এইসব জায়গায় জীবাণুর আক্রমণ সহজে ঘটে থাকে।

পৌষ্টিক নালী—পৌষ্টিক নালীর ভূমিকা সম্পর্কে কিছু জানতে হলে, মুখগহ্বর ও গলা, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার।

(ক) **মুখগহ্বর ও গলা**—প্রায় ত্বকের মতই, মুখগহ্বর ও গলা

বহুস্তর-বিশিষ্ট অধিচ্ছদীয় কোষ দ্বারা আবৃত। তবে মাঢ়ীর প্রান্ত-দেশে এবং টন্‌সিলের খাঁজে এই কোষস্তর খুবই পাতলা থাকে, এজন্য এই পথে জীবাণু-প্রবেশ সহজসাধ্য হয়।

মুখের মধ্যে অবিরাম লালা-নিঃসরণ প্রতিরোধ-ক্রিয়ারই একটি অঙ্গ বিশেষ। লালা গলাধঃকরণের ফলে, লালাবন্দী জীবাণু সহজেই পেটে চলে যায়, এবং সেখানে বিনষ্ট হয়।

ত্বকে যেমন কিছু স্থায়ী জীবাণু প্রতিরক্ষায় সাহায্য করে, মুখের মধ্যেও তেমনি কিছু স্থায়ী বাসিন্দা জীবাণু প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

এ ছাড়া মুখের লালার মধ্যে মিউসিন (mucin), লাইসোজাইম (lysozyme) এবং অ্যান্টিবডি থাকায় জীবাণুর সংখ্যাবৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

জীবাণু প্রতিরোধের এইসব ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কয়েক রকম জীবাণু, যেমন—ডিফ্‌থেরিয়া ব্যাসিলাই, মেনিংগোকক্কাই, স্ট্রেপ্‌টো-কক্কাস পায়োজেনিস প্রভৃতি, সাময়িকভাবে মুখগহ্বরে এবং গলায় বাসা বাঁধতে পারে। দেহের প্রতিরোধ-ক্ষমতা থাকলে, স্বল্পকাল পরেই এরা উধাও হয়ে যায়। আর প্রতিরোধ-ক্ষমতা যদি যথেষ্ট না হয়, তাহলে কিছুকাল পরে ঐ ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

(খ) **পাকস্থলী**—পাকস্থলী দীর্ঘ অন্ত্রপথের সুযোগ্য প্রহরী। স্বাভাবিক অবস্থায় পাকরস নির্জীবাণুক (sterile)। পাকরসের জীবাণু-হননের ক্ষমতা প্রধানতঃ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের উপর নির্ভর করে। উল্লেখ্য যে, পাকস্থলী নিঃসৃত উৎসেচকের জীবাণু হননের ক্ষমতা নেই।

কিছু জীবাণু, যেমন—স্যাল্‌মোনেলা টাইফি (*Salmonella typhi*), যদি খাদ্য বা প্রচুর পানীয়ের সঙ্গে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে, তাহলে এই পাকরসের প্রতিরোধ অতিক্রম ক'রে ক্ষুদ্রান্তে চলে আসে। তখন রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এন্‌টামিবা

1. মাইকোব্যাকটিরিয়াম টিউবারকিউলোসিস্—জিয়েল-নীলসেন পদ্ধতিতে রং করলে, নীল পশ্চাৎপটে এইরূপ লাল রঙের ব্যাসিলি দেখা যায়।
2. ক্লস্ট্রিডিয়াম টিটানি—একপাশে যে স্ফীত অংশ লক্ষ্য করা যায়, সেখানে থাকে 'স্পোর' বা বীজরেণু।
3. 'সিফিলিস্' বা উপদংশ রোগের জন্য দায়ী জীবাণু—ট্রিপোনিমা প্যালিডাম।
4. ভাইল-রোগ (Weil's disease)-এর জন্য দায়ী জীবাণু—লেপ্‌টোস্পাইরা ইক্‌টেরোহিমারেজিয়ী। এর আক্রমণে এক প্রকার জণ্ডিস্ বা ন্যাবা রোগ হয়ে থাকে।

[ডাঃ প্রদীপ কুমার রাহার সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

হিস্‌টোলিটিকা (*Entamoeba histolytica*)-র "সিস্ট" (Cyst) বা বীজরেণু পাকরসের অম্লতা সত্ত্বেও অক্ষত থাকে, এবং সহজেই পাকস্থলী অতিক্রম ক'রে অন্ত্রে চলে যায়। এজন্য অ্যামিবা-জনিত আমাশয় রোগ সহজেই হতে পারে।

(গ) **অন্ত্র**—অন্ত্রের নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আছে, একথা ঠিক, তবুও অন্ত্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রধানতঃ পাকরসের গুণাগুণের উপরেই নির্ভর করে। যেমন, শিশুরা প্রায়ই আন্ত্রিক গোলযোগে ভোগে ; আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাকরসের অম্লের স্বল্পতাই এজন্য দায়ী।

কোন কোন জীবাণু, যেমন—আন্ত্রিক জ্বর ও যক্ষ্মা-রোগের জীবাণু, অন্ত্রে কোন ক্ষত সৃষ্টি না ক'রেই আন্ত্রিক শ্লেষ্ম-ঝিল্লী ভেদ করে, এবং পরিণামে ব্যাধি সৃষ্টি করে।

জীবাণু-জনিত আন্ত্রিক রোগে বারবার পায়খানা হয়। এর ফলে রোগীর মলের সঙ্গে প্রচুর জীবাণু অন্ত্র থেকে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়।

ক্ষুদ্রান্ত্রে খুবই অল্প সংখ্যক জীবণু বাস করে, কিন্তু সে তুলনায় অনেক বেশী সংখ্যক জীবাণু বাস করে বৃহদন্ত্রে। এদের মধ্যে কিছু জীবাণু কলিসিন নামক এক প্রকার প্রোটিন নিঃসরণ করে। জীবাণু হননে এর বিশেষ ভূমিকা আছে।

অন্ত্রের শ্লেষ্ম-ঝিল্লীতে ইমিউনোগ্লোবিন অ্যান্টিবডি (IgA) থাকে, এজন্য অন্ত্রে স্থানিক অনাক্রম্যতা সৃষ্টি হয়।

সুদীর্ঘ পৌষ্টিক নালীতে অ্যাপেন্‌ডিক্‌স হ'ল দুর্বলতম উপাঙ্গ। অনেক সময় এটি প্রদাহে আক্লিষ্ট হয়। এর নাম অ্যাপেন্‌ডিসাইটিস্।

শ্বাসপথ—নাসিকা-গহ্বর থেকে ফুসফুস পর্যন্ত দীর্ঘ পথ ফুসফুসের স্বার্থে বাতানুকূলতা (air-conditioning) সৃষ্টি করে। আর নাসারন্ধ্রের লোমগুচ্ছ নাতিসূক্ষ্ম কণার শ্বাসপথের গভীরে প্রবেশ ব্যাহত করে। তবে নাসিকাগহ্বরের শ্লেষ্ম-ঝিল্লীই এইরূপ পরিশ্রুতির জন্য প্রধানতঃ দায়ী থাকে।

শ্বাসপথের শ্লেষ্ম-ঝিল্লীর অধিচ্ছদের জীবাণু-আক্রমণ নিবারণ করার কোনো ক্ষমতা নেই। এজন্য কিছু কিছু জীবাণু, যেমন—মেনিংগোকক্কাই, নাক ও গলবিলের সন্ধিস্থলের শ্লেষ্ম-ঝিল্লী ভেদ ক'রে সহজেই দেহের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে।

হাঁচির সঙ্গে অনেক জীবাণু বাইরে বেরিয়ে যায়। নাক ও গলবিলের সন্ধিস্থলে শ্লেষ্মার অবিরাম পশ্চাৎগতি জীবাণু অপসারণে যথেষ্ট সাহায্য করে। নাসিকার শ্লেষ্ম-ঝিল্লী থেকে নির্গত রসের জীবাণু-হননের ক্ষমতা আছে। এতে ইনফ্লুয়েঞ্জা ও পলিও-মায়ালাইটিস-জীবাণু-প্রতিরোধী অ্যান্টিবডি থাকে। আর থাকে লাইসোজাইম (জীবাণু-শাসক)। কিন্তু তা সত্ত্বেও মেনিংগোকক্কাই এবং ডিফ্‌থেরিয়া ব্যাসিলাই নাকের মধ্যে বাসা বাঁধে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রোগ সৃষ্টি করে।

নাসিকা ও গলবিলের সন্ধিস্থলে কিছু জীবাণু স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধে থাকে। বিকারকারী জীবাণু-অপসারণে এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

স্বরযন্ত্রের নীচে শ্বাসনালীর অবশিষ্ট পথ সাধারণতঃ জীবাণুমুক্ত থাকে।

চোখ—চোখের জল অবিরাম চোখ ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে দেয়। তাছাড়া চোখের জলে অত্যধিক পরিমাণে লাইসোজাইম নামক জীবাণু-শাসক পদার্থ থাকে। এজন্য চোখে জীবাণু-আক্রমণ সহজে হয় না।

কান—কানের বহিঃরন্ধ্রপথে গ্রন্থি-রস ক্ষরণের ফলে কর্ণমল বা খইল (wax) সৃষ্টি হয়। এতে ইমিউনোগ্লোবিন অ্যান্টিবডি (IgA) এবং লাইসোজাইম (জীবাণু-শাসক) থাকে। তাই কর্ণমলের জীবাণুনাশক ধর্ম আছে।

অনাক্রম্যতা ও টিকা

আমাদের চারদিকে জল-বাতাসে সর্বত্র সব সময় অসংখ্য জীবাণু অদৃশ্যভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এগুলি আমাদের অজ্ঞাতসারে দেহের মধ্যে ঢুকে পড়ে, তাই আমরা রোগগ্রস্ত হ'য়ে পড়ি। তবে রোগ-জীবাণু দেহে প্রবেশ করলেই যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাবে তার কোন অর্থ নেই। কারণ পুরুষানুক্রমে আমাদের দেহের মধ্যেই খানিকটা রোগ প্রতিরোধ করবার শক্তি থাকে। এই শক্তি যতদিন প্রবল থাকে ততদিন আমরা সুস্থ থাকি। আর এই শক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়লে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। এইজন্য দেখা যায়, একটু ঠাণ্ডা লাগলেই একজনের সর্দি বা ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়, কিন্তু আর একজনের কিছুই হয় না। বাড়িতে সংক্রামক ব্যাধি প্রকাশ হলে দেখা যায়, কোন কোন লোক অত্যধিক রোগপ্রবণ, তাই সে সহজেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। আবার সেইখানেই হয়তো এমন লোক আছে, যে অবিরত রোগীর সংস্পর্শে আসা সত্ত্বেও সুস্থ রয়েছে।

এতে বোঝা যায় যে, আমাদের দেহের মধ্যেই রোগ প্রতিরোধ করবার খানিকটা ক্ষমতা থাকে এবং তারই উপর আমাদের রোগ হওয়া—না-হওয়া অনেকখানি নির্ভর করে। এরই নাম সহজাত অনাক্রম্যতা (Natural immunity)।

বয়স, স্বাস্থ্য ও ঋতু-ভেদে সহজাত অনাক্রম্যতার অনেক তারতম্য হয়। যেমন—শিশুরা হামেশাই হামজ্বর, ডিফ্‌থেরিয়া প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়, কিন্তু বয়স্কদের কদাচিৎ এই রোগ হতে দেখা যায়। আবার, বিশেষ বিশেষ ঋতুতে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগ মহামারীরূপে দেখা দেয়, অথচ বছরের অন্য সময় ঐ সব রোগের প্রকোপ থাকে না বললেই চলে।

আজকাল বসন্ত, কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের টিকা দেওয়া হয়। টিকা দিলে মানুষের দেহে রোগ প্রকাশ পায় না,

কিন্তু রোগ-প্রতিরোধক শক্তি জন্মায়। ফলে সে পরে সেই রোগের সতেজ জীবাণুর আক্রমণ থেকেও আত্মরক্ষা করতে পারে। টিকার সাহায্যে আমাদের দেহে রোগ প্রতিরোধ করবার যে ক্ষমতা জন্মায় তার নাম অর্জিত অনাক্রম্যতা (Acquired immunity)। বলা বাহুল্য, দেহে সহজাত অনাক্রম্যতা থাকলে, টিকা নেবার পর তা আরও বেড়ে যায়। আর অনাক্রম্যতা একেবারে না থাকলে, টিকা নেবার ফলে তা নূতন ক'রে অর্জিত হয়। জেনার ও পাস্তুর, এই দু'জন বিজ্ঞানীর অপূর্ব অধ্যবসায়ের ফলেই টিকা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হয়েছে। এখানে তাঁদের আবিষ্কারের কাহিনীই সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে।

১৭১৭ সালের ১লা এপ্রিল, লেডী মেরী মণ্টেগু তাঁর বন্ধু মিস্ সারা চিজ্ওএলকে একটা নতুন খবর দিয়ে চিঠি লিখলেন। সেই সময়ে তুরস্কে যে বৃটিশ রাষ্ট্রদূত ছিলেন তাঁরই স্ত্রী হলেন লেডী মেরী।

লেডী মেরী লিখলেন, বসন্তরোগ ইংল্যাণ্ডে যে রকম ভয়াবহ, এদেশে কিন্তু সে রকম নয়। এর কারণ, এদেশে একটা অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত আছে। প্রতি শরৎকালে এখানে ভ্রাম্যমাণ বৃদ্ধারা বাদামের খোসায় ক'রে বসন্তরোগের শুকনো বীজ নিয়ে আসে। মায়েরা তাদের বাচ্চাদের সব জড়ো করে। ঐ সব বৃদ্ধাকে পয়সা দিয়ে বসন্তের বীজ বাচ্চাদের গায়ে লাগিয়ে নেয়। বৃদ্ধাটি ছুঁচের মাথায় ক'রে বসন্তের বীজ তুলে নেয়, আর এক-একটি বাচ্চার হাতে বা পায়ে আঁচড় কেটে এই বীজ তার গায়ে লাগিয়ে দেয়। তারপর বাদামের এক-একটি শূন্য খোসা ঐ ক্ষতের উপর বসিয়ে বেঁধে দেয়।

কয়েকদিন পরে ওই বাচ্চার জ্বর হয়। মুখে হয়তো দু'তিনটি গুটি বেরোয়। সাত-আট দিনের মধ্যেই তা শুকিয়ে যায়, খসে পড়ে। কিন্তু মুখে বিশেষ দাগ থাকে না। এদের আর কোনদিন বসন্তরোগ হয় না।

লেডী মেরীর ঐকান্তিক চেষ্টায় ১৭২১ সালে ইংল্যাণ্ডেও এই প্রথা

চালু হয়ে গেল। কিন্তু ডাক্তাররা এটা ভালো চোখে দেখলেন না। কারণ, আসলে এটা একটা প্রতিবিধানই নয়। বসন্তের গুটি এবং ইন্‌অকুলেশনের গুটি সমান ছোঁয়াচে। শুধু তফাত এই যে, ইন্‌অকুলেশন নিলে রোগের প্রকোপ অনেক কম হয়। তা ছাড়া স্বাভাবিক রোগের বেলায় যেখানে প্রতি একশ' জনের মধ্যে পঁচাত্তর জনেরই মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে এরূপ ক্ষেত্রে তিন জনের বেশী মৃত্যু হয় না।

ইন্‌অকুলেশন অত্যন্ত ছোঁয়াচে। তাই অসাবধানতার ফলে এথেকেও রোগ ছড়াতে লাগলো। কাজেই ইন্‌অকুলেশন দেওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে সাংঘাতিক বাদানুবাদ শুরু হয়ে গেল। অনেক দেশে আইন ক'রে ইন্‌অকুলেশন বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল।

চিত্র ১১। এডওয়ার্ড জেনার।

প্রখ্যাত সার্জন হাণ্টারের ছাত্র এডওআর্ড জেনার (১৭৪৯—১৮২৩), প্র্যাক্‌টিস্ করেন গ্লচেস্টারশায়ারের অন্তর্গত বার্কলীতে। তখন বসন্ত-রোগের একমাত্র প্রতিবিধান ছিল লেডী মেরী প্রবর্তিত ইন্‌অকুলেশন। তাই জেনারেরও মাঝে মাঝে ডাক পড়তো ইন্‌অকুলেশন দেওয়ার জন্য।

জেনার দেখতেন, ইন্‌অকুলেশন দিলেও সবার হাতে গুটি বেরোয় না। গাঁয়ের মেয়েরা বলতো, ওর একবার গো-বসন্ত হ'য়ে গেছে, কাজেই ওর আর বসন্ত হবে না।

গো-বসন্ত গোরুর দেহে চামড়ার উপরে ছোট ছোট গুটির আকারে বেরোয়। জেনার অনুসন্ধান ক'রে জানতে পারলেন, যে-সব গয়লা বা গয়লানী গোরুর পরিচর্যা করে, তাদের হাতেও সময়-সময় একটি-দু'টি এইরূপ গুটি বেরোয়। কিন্তু সমস্ত শরীরে এই রোগ ছড়ায় না। তারপর দেশে যখন বসন্তের মহামারী দেখা দেয়, তখন এরা সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে।

১৭৯৬ সাল। এক গোয়ালার গো-বসন্ত দেখা দিল। তাই থেকে এক গয়লানী সারা নেলমেসের এই রোগ হ'ল। তার হাতে কয়েকটা গুটি বেরুল।

১৪ই মে জেনার এক দুঃসাহসিক কাণ্ড ক'রে বসলেন। গয়লানী নেলমেসের হাতের ঐ গুটি ছুরি দিয়ে ফুটো করলেন। একটা হাঁসের পালকের দাড় কেটে তার মধ্যে ঐ গুটির ঘোলাটে রস একটু তুলে নিলেন। তারপর জেম্‌স ফিপ্‌স নামে একটি ছেলের বাহুতে আঁচড় কেটে সেখানে এই রস লাগিয়ে দিলেন।

কয়েকদিন পরে ফিপ্‌সের বাহুতে একটা গুটি বেরুল। শরীরের অন্য কোথাও আর গুটি বেরুল না। কয়েকদিন পরে গুটি শুকিয়ে গেল। ছোট একটি দাগ রইল।

একমাস পরে জেনার ফিপ্‌সের বাহুতে আবার আঁচড় কাটলেন। কিন্তু এবারে সেখানে বসন্তের টাটকা বীজ লাগিয়ে দিলেন। ছেলেটির শরীরে কোন গুটি বেরুল না। তার কোন অসুখও হ'ল না। কয়েক মাস পরে তাকে লেডী মেরীর প্রথায় ইন্‌অকুলেশন দেওয়া হ'ল। কিন্তু এবারেও তার বসন্ত হ'ল না। জেনার বুঝলেন, গাঁয়ের মেয়েদের কথাই ঠিক। একবার গো-বসন্ত হ'লে তার আর গুটি-বসন্ত হয় না।

এই ঐতিহাসিক পরীক্ষার বিবরণ দিয়ে জেনার একটি প্রবন্ধ রচনা করলেন এবং তা রয়্যাল সোসাইটির জার্ণালে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু সেখানকার সভ্যরা তাঁর এই

তথ্য মেনে দিতে রাজী হলেন না। তাঁরা বললেন, ছেলেটির যে বসন্তরোগ হয়নি, এ তার ভাগ্য। এ থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না। কাজেই জেনারের এই প্রবন্ধ ফেরত এলো।

কিন্তু জেনারের শিক্ষক জন হাণ্টার তাঁকে উৎসাহ দিলেন।

চিত্র ১২। জেনারের টিকার প্রথম পরীক্ষা।

বললেন, আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে তোমার এই তথ্য প্রমাণ কর। কিন্তু জেনারের এমনই দুর্ভাগ্য যে, গাঁ থেকে গো-বসন্ত হঠাৎ উধাও হয়ে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও গো-বসন্তের কেস্ আর একটিও পাওয়া গেল না; কাজেই তখনকার মতো পরীক্ষা বন্ধ রাখতে হ'ল।

দু'বছরের চেষ্টায় জেনার মাত্র ৭ জনের উপর গো-বসন্তের টিকা দেওয়ার পরীক্ষা করতে সক্ষম হলেন। আর ১৬ জনের সন্ধান পেলেন যাদের রোগ হয় গোরু থেকে। এই ২৩ জনের বেলাতেই লেডী মেরীর ইন্‌অকুলেশন নিষ্ফল হ'ল। এই ২৩টি গো-বসন্তের বিবরণ দিয়ে জেনার একটি পুস্তিকা বের করলেন, ১৭৯৮ সালে। নাম

দিলেন—"An inquiry into the causes and effects of the variolae vaccinae", অর্থাৎ গো-বসন্তের কারণ এবং পরিণাম সম্পর্কে অনুসন্ধান।

তখনও জীবাণুতত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়নি। জীবাণু কি এবং তা কি ভাবে মানুষের দেহে ঢুকে রোগ সৃষ্টি করে, সে বিষয়ে জেনার কিছুই জানতেন না। কিন্তু তিনি এ কথা ঠিক বুঝেছিলেন যে, গো-বসন্ত এবং গুটি-বসন্ত একই পরিবারের দু'টি শাখা। আর গো-বসন্ত গুটি-বসন্তের আক্রমণ প্রতিরোধ করে। কাজেই গো-বসন্তের বীজ দিয়ে টিকা দিলে ফল হবেই। জেনারের এই বিশ্বাস কখনও শিথিল হয়নি।

কিন্তু সাধারণের পক্ষে একথা বিশ্বাস করা সহজ নয়। তাই তারা জেনারের মতবাদ হেসে উড়িয়ে দিল। জেনার লণ্ডনে এলেন। কিন্তু আড়াই মাসের চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। একটি লোকও টিকা নিতে রাজী হ'ল না। জেনার মনের দুঃখে গ্রামে ফিরে গেলেন।

কিন্তু জেনার ধৈর্য হারালেন না। তাঁর গ্রামে মোট ৩২৬ জনকে টিকা দিতে সক্ষম হলেন। পরে এদের মধ্যে ১৭৩ জনকে লেডী মেরীর প্রথায় ইন্‌অকুলেশন দিলেন। কিন্তু এরা সবাই সুস্থ রইল। এর ফলে জেনারের আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে গেল। নূতন ক'রে ভাগ্য পরীক্ষার আশায় তিনি আবার লণ্ডনে এলেন।

এবারে জেনারের চেষ্টায় একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। ডিউক অফ ইয়র্ক এবং লর্ড এগ্রিমণ্ট এর পৃষ্ঠপোষক হলেন। জেনারের তত্ত্বাবধানে এখান থেকে টিকার বীজ বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা হ'ল।

এতদিনে জেনারের ভাগ্য ফিরল। তাঁর নিজের গাঁয়ে এক অভিনন্দনের আয়োজন করা হ'ল। সেখানে তাঁকে একটি সোনার ঝাঁপি উপহার দেওয়া হ'ল। এর গায়ে খোদাই করা ছিল, একটি গোরু চাঁদের উপর লাফিয়ে যাচ্ছে। বন্ধুদের চেষ্টায় হাউস অফ কমন্স থেকে এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য ১০,০০০ পাউণ্ড পুরস্কার মঞ্জুর করা হ'ল।

কিন্তু লণ্ডনে জেনারের প্র্যাক্‌টিস্ জমলো না। টিকার জন্য খেটে খেটে তিনি অনেক সময় এবং অনেক অর্থ ব্যয় করেছেন। বিনিময়ে বিশেষ অর্থ উপার্জন করতে পারেন নি। টিকা নেওয়ার জন্যও কেউ আর তাঁর কাছে আসে না। বাড়ির কাছের ডাক্তারই টিকা দিতে পারে। জেনার দারুণ অর্থ-সংকটে পড়লেন।

এই সময় ভাগ্যক্রমে নূতন চ্যান্সেলার অফ এক্সচেকারের চেষ্টায় হাউস্ অফ কমন্স থেকে আরও ২০,০০০ পাউণ্ড আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর হ'ল। এর পর ১৮০৩ সালে ন্যাশনাল ভ্যাক্‌সিন এস্টাব্লিশমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হ'ল। জেনার হলেন তার প্রথম ডিরেক্টর। এতদিনে তাঁর দুঃখ ঘুচল। ক্রমশঃ দেশ-বিদেশে জেনারের নাম ছড়িয়ে পড়ল। টিকার ফলাফল লক্ষ্য ক'রে জনসাধারণও ক্রমে জেনারে মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠল। বিভিন্ন দেশ থেকে মানপত্র এবং উপহার দিয়ে টিকার আবিষ্কারককে সম্মানিত করা হ'ল। ১৮৪০ সালে ইংল্যাণ্ডে আইন ক'রে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়।

জেনার বসন্ত রোগের টিকা আবিষ্কার করলেন সত্য, কিন্তু তখন এই রোগের জীবাণু সম্বন্ধে মানুষের কোন ধারণাই ছিল না। কাজেই এর মূলে যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রয়েছে, তার স্বরূপ নির্ণয় করা জেনারের পক্ষে সম্ভব হ'ল না। এই তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন বিজ্ঞানী পাস্তুর। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাই পাস্তুরের দান চিরকাল লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে।

লুই পাস্তুর (১৮২২—১৮৯৫) ফ্রান্সের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ রসায়ন বিজ্ঞানী। আজ থেকে প্রায় একশ' বছর আগেই তিনিই সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন যে, বাতাসে সব সময়ই অসংখ্য অদৃশ্য জীবাণু ভেসে বেড়ায়। তাই বাতাসের সংস্পর্শে থাকলে এই সব জীবাণুদের ক্রিয়ায় মাংসের সূপ, চিনির দ্রবণ বা দুধ পচে যায়। অতিরিক্ত উত্তাপে এসব জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। এই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি উত্তাপের সাহায্যে দুধ জীবাণুমুক্ত করার পদ্ধতি

আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতিতে দুধ গরম ক'রে তারপর হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা করা হয়, এর ফলে দুধ জীবাণুশূন্য হয়ে যায়। এরই নাম "পাস্তুরিতকরণ" (pasteurization)। নানাপ্রকার পরীক্ষার ফলে পাস্তুরের দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে, জীবাণুদের ক্রিয়াতেই জীবদেহে নানারূপ ব্যাধির সৃষ্টি হয়। মারাত্মক পেব্রিণ রোগে আক্রান্ত রেশম-কীটের দেহে একপ্রকার জীবাণু আবিষ্কার করতেও তিনি সক্ষম হলেন। রোগগ্রস্ত রেশমকীট ধ্বংস ক'রে এই রোগের প্রসার বন্ধ করতেও তিনি সক্ষম হলেন। এর ফলে তাঁর জীবাণুতত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল।

এরপর জার্মান বিজ্ঞানী কক্ আবিষ্কার করলেন যে, অ্যান্থ্রাক্স রোগে আক্রান্ত ভেড়ার রক্তে একরকম জীবাণু দেখা যায়। এরাই যে প্রকৃতপক্ষে অ্যান্থ্রাক্স রোগের জন্য দায়ী সে বিষয়েও নির্ভুল প্রমাণ দিতে তিনি সক্ষম হলেন।

ঐ সময় ফ্রান্সে হঠাৎ গরু-ভেড়ার মড়ক লাগল। মারাত্মক অ্যান্থ্রাক্স রোগ এক-একটা গ্রামে ঢোকে আর পালকে পাল গরু-ভেড়ার মৃত্যু হয়। এমন সাংঘাতিক এই রোগ। দেশের গৃহস্থরা সকলে পাস্তুরের কাছে আবেদন জানালেন। তাই পাস্তুরও ভাবতে লাগলেন, কিভাবে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

এই সময় পাস্তুর মুরগীর কলেরা রোগ নিবারণের উদ্দেশ্যে গবেষণা করছিলেন। এই রোগের জীবাণু নিয়ে কাল্চার (বা, চায) করতে করতে দৈবাৎ একপ্রকার নিস্তেজ জীবাণু আবিষ্কার করলেন। এই নিস্তেজ জীবাণু কোনো জীবদেহে প্রবেশ করালে, রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় না, অথচ তার দেহে রোগ প্রতিরোধ করার শক্তি এতটা বেড়ে যায় যে, পরে সেই রোগের সতেজ এবং সক্রিয় জীবাণুও তার আর কোনো অনিষ্ট করতে পারে না। অল্পদিনের মধ্যেই পাস্তুর আরও বুঝতে পারলেন যে, একপ্রকার নিস্তেজ জীবাণুর সাহায্যে শুধু সেই প্রকার সতেজ জীবাণুর বিরুদ্ধেই

প্রতিরোধ-শক্তি অর্জন করা যায়, অন্য কোন জীবাণুর বিরুদ্ধে নয়। এইভাবে পাস্তুর টিকার বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করলেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ "Preventive vaccination" প্রকাশিত হ'ল ১৮৮০ সালে।

এইভাবে টিকা সম্পর্কে কিছু তথ্য আহরণ করার পর পাস্তুর অ্যান্‌থ্রাক্স-জীবাণু নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করলেন, এবং অচিরেই একপ্রকার নিস্তেজ জীবাণু তৈরি করতে সক্ষম হলেন। পরীক্ষাগারে প্রাথমিক সাফল্য লাভ করার পরে তাঁর বিশ্বাস এতটা দৃঢ় হ'ল যে, ১৮৮১ সালের গোড়ার দিকেই তিনি এই নতুন আবিষ্কারের কথা ঘোষণা ক'রে দিলেন। কিন্তু অবিশ্বাসী জনসাধারণ তাঁর এই আবিষ্কারের কথা বিশেষ পরীক্ষার সাহায্যে যাচাই করে নিতে চাইল। মিলুনের অ্যাগ্রিকাল্‌চারাল্ সোসাইটি এই পরীক্ষার দায়িত্ব নিতে রাজী হলেন। ১৮৮১ সালের মে—জুন মাসে পরীক্ষার ব্যবস্থা হ'ল।

৪৮টি ভেড়, ২টি ছাগল এবং কয়েকটি গরু পরীক্ষার জন্য আনা হ'ল। তাদের মধ্যে ২৪টি ভেড়া, ১টি ছাগল, এবং অর্ধেক সংখ্যক গরুর দেহে পাস্তুরের আবিষ্কৃত অ্যান্‌থ্রাক্স রোগের টিকার ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া হ'ল। ৩১শে মে টিকা দেওয়া এবং না-দেওয়া সবগুলো প্রাণীর দেহেই তীব্র অ্যান্‌থ্রাক্স-জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হ'ল। খবর পেয়ে ২রা জুন তারিখে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এবং এক বিরাট জনতা সমবেত হ'ল পরীক্ষার ফলাফল দেখার জন্য। বেলা প্রায় দুটোর সময় পাস্তুর এবং তার সহকর্মীরা সেখানে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত সকলে দারুণ হর্ষধ্বনি ক'রে তাঁদের অভিনন্দন জানাল। টিকা দেওয়া প্রাণীগুলো সব দিব্বি সুস্থ রয়েছে। কেউ নিশ্চিন্ত মনে খাবার খাচ্ছে, কেউ হয়তো ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করছে। এরা যে কোন দিন অ্যান্‌থ্রাক্স-জীবাণুর ত্রিসীমানার মধ্যে এসেছিল, দেখে তা মনেই হয় না। কিন্তু হায়! টিকা না-দেওয়া প্রাণীগুলোর কি

ভায়নক অবস্থা ! অধিকাংশই মরে শক্ত হয়ে গেছে, দু'একটা যা তখনও বেঁচে আছে, সেগুলোও ধুঁকছে। শীগ্‌গিরই যে তাদেরও মৃত্যু হবে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। এই অভাবনীয় সাফল্যে চারিদিকে পাস্তুরের জয়-জয়কার পড়ে গেল। ফ্রান্স তাঁকে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান বলে স্বীকার ক'রল, তাঁকে একজন ত্রাণকর্তা ব'লে মনে ক'রল। দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান "Grand Cordon of the Legion of Honour" তাঁকে দেওয়া হ'ল।

ইউরোপের সবদেশ থেকে এই টিকার জন্য হাজার হাজার আবেদন আসতে লাগল। পাস্তুর এবং তাঁর শিষ্যরা আহার-নিদ্রা ভুলে দিবা-রাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে টিকার ওষুধ তৈরি করতে লাগলেন। দু'বছরের মধ্যে ৮০ হাজার গবাদি পশুকে এই টিকা দেওয়া হ'ল। এর ফলে মৃত্যু-হার শতকরা একটিতে নেমে গেল, এবং এইভাবে টিকার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগেরও টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশেষ ক'রে ছোটদের জন্য আবিষ্কৃত হয়েছে ট্রিপল এন্টিজেন, পলিও ভ্যাক্‌সিন প্রভৃতি। ট্রিপ্‌ল এন্টিজেন দেওয়া হয় শিশুদের, ডিফ্‌থেরিয়া, হুপিং কাশি এবং টিটেনাস (বা, ধনুষ্টঙ্কার) প্রতিরোধের জন্য, আর পলিও-ভ্যাক্‌সিন দেওয়া হয় মারাত্মক পলিওমায়ালাইটিস (বা, শিশুপক্ষাঘাত) রোগ প্রতিরোধের জন্য। এছাড়া যক্ষারোগ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় বি. সি. জি. টিকা। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে— Prevention is better than cure ; বাস্তবিক রোগ হ'লে তারপর চিকিৎসা ক'রে আরোগ্য লাভ করার চেয়ে যাতে রোগ না হয় সেদিকেই বেশী লক্ষ্য রাখা দরকার। এজন্যই এখন অনেক দেশেই টিকা নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

আধুনিক গবেষণার ফলে জানা গেছে, কোন রোগের জীবাণুর (ব্যাক্‌টিরিয়া বা ভাইরাস-এর) বাহ্যিক গ্লাইকোপ্রোটিন (অর্থাৎ,

শর্করা-সমৃদ্ধ প্রোটিন) যাকে বলা হয় অ্যান্টিজেন, শরীরে প্রবেশ ক'রলে, সঙ্গে সঙ্গে শরীরে ঐ প্রোটিনের অ্যান্টিবডি তৈরী হয়। এই অ্যান্টিবডি পরবর্তীকালে বিশেষভাবে ঐ ব্যাক্‌টিরিয়া বা ভাইরসেরই গ্লাইকো-প্রোটিনকে চিনতে পারে, এবং ঐ ব্যাক্‌টিরিয়া বা ভাইরাসের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। তাই শরীরে যদি কোন ব্যাক্‌টিরিয়া বা ভাইরাসের অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে থাকে, এবং পরে কখনও যদি সেই ব্যাক্‌টিরিয়া বা ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করে, তাহলে ঐ অ্যান্টিবডি ঐ ব্যাক্‌টিরিয়া বা ভাইরাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে নিষ্ক্রিয় ক'রে দেয়। তাই তখন আর ঐ রোগ হতে পারে না।

ভ্যাক্‌সিন বা টিকার জন্য যেসব ব্যাক্‌টিরিয়া বা ভাইরাস ব্যবহার করা হয়, তা হয় মৃত নয়তো তাকে এমনভাবে নিস্তেজ ক'রে নেওয়া হয় যে, তার আর রোগ সৃষ্টি করার কোন ক্ষমতা থাকে না। মিউটেশনের ফলে অথবা অন্য কোন কারণে, ঐ ব্যাক্‌টেরিয়া বা ভাইরাস যদি হঠাৎ সক্রিয় হয়ে ওঠে, অর্থাৎ রোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা ফিরে পায়, তাহলেই বিপত্তি ঘটে। এজন্য টিকা তৈরির প্রতিটি ধাপে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা খুবই প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, বসন্ত, কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতির টিকা, রোগ-জীবাণু দেহে প্রবেশ করার আগেই, অনাক্রম্যতা অর্জন করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। রোগ-জীবাণু শরীরে ঢোকার পর এসব টিকা নেওয়া চলে না, নিলে রোগীর অবস্থা আরও সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে।*

---

* আনন্দবাজার পত্রিকা (২৫ মে, ১৯৮৫) ঃ

নয়াদিল্লি ২৪ মে : আজ থেকে ঠিক এক দশক আগে ১৯৭৫ সালের ২৪ মে, এই দেশ গুটি-বসন্ত নামক মারাত্মকব্যাধি থেকে মুক্তি পায়। ওই দিনই সর্বশেষ গুটি-বসন্তের রোগী সাইবান বিবি নামে ৩০ বছর বয়স্কা এক মহিলার সন্ধান পাওয়া যায় আসামের কাছাড় জেলায়। দেশজুড়ে ব্যাপক প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে তারপর আর কেউ এ রোগে আক্রান্ত হয়নি।

[পি. টি. আই.]

জলাতঙ্ক রোগের টিকা

পাগলা কুকুরে কামড়ালে মারাত্মক জলাতঙ্ক রোগ (Hydrophobia বা Rabies) হয়। ভারতে এখনও প্রতি বছর প্রায় পনেরো হাজার মানুষ জলাতঙ্ক রোগে প্রাণ হারান। আর এদের বেশীর ভাগই মারা যান কুকুরের কামড়ে। অ্যান্থ্রাক্স-রোগের টিকা আবিষ্কার করার পর, পাস্তুর জলাতঙ্ক-রোগের টিকা আবিষ্কার করার উদ্দেশ্যে গবেষণা আরম্ভ করেন।

এতো রোগ থাকতে হঠাৎ জলাতঙ্ক রোগের কথা কেন পাস্তুরের মনে হ'ল? এ বিষয়ে পাস্তুর নিজেই বলেছেন,—"আমি যখন ছোট বালকটি ছিলাম, তখন পাগলা নেকড়ে বাঘে কামড়েছে এই রকম কয়েকজন হতভাগ্যকে আরবয়-এর রাস্তা দিয়ে ছুটে আসতে দেখেছিলাম। তাদের আর্ত চীৎকার সদা-সর্বদা আমার মনে এসে হানা দেয়।"

বাল্যকালের মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা তাঁর অবচেতন মনে সব সময় ক্রিয়া ক'রত এবং মনকে পীড়া দিত। পাগলা কুকুরের করুণ আর্তনাদ শুনলে ভয়ে বুকের রক্ত কেমন হিম হয়ে যায়, সেকথা পাস্তুরের বেশ ভালভাবেই জানা ছিল। তাই বোধ হয় হতভাগ্য জলাতঙ্ক রোগীদের পরিত্রাতারূপে তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন।

পাগলা কুকুরে কামড়ালে, একরকম অদৃশ্য জীবাণু লালার সঙ্গে গিয়ে রক্তে মিশে যায়। তারপর ক্রমে নার্ভের (বা, স্নায়ুর) ভিতর দিয়ে গিয়ে মেরুমজ্জা ও মস্তিষ্ককে আক্রমণ করে। তখন মাথাধরা, অগ্নিমান্দ্য, অবসাদ, উত্তেজিতা, স্নায়বিক আক্ষেপ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। তৃষ্ণায় কাতর হয়ে একটু জলপান করতে গেলেও এমন স্নায়বিক আক্ষেপ হতে থাকে যে, জল পান করাই কঠিন হয়ে পড়ে। তাইতো এই রোগের নাম দেওয়া হয়েছে জলাতঙ্ক (Hydrophobia ; Gk. *Hydro*=water, *phobos*= fear)! এই অবস্থায় মৃত্যু অনিবার্য। দংশনের পর সাধারণতঃ

চল্লিশ থেকে ষাট দিনের মধ্যে এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তবে ক্ষত স্থান থেকে মস্তিষ্কের দূরত্ব অনুসারে এর কিছুটা তারতম্য হয়ে থাকে।

এই মারাত্মক রোগের জীবাণু শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও দেখা যায় নি। এখন উপায়?

পাস্তুর একদিন তাঁর এক সহকারী পিয়ের পল এমিল রুক্‌স্ (Pierre Paul Emile Roux)-কে ডেকে বললেন—"জলাতঙ্ক-রোগের লক্ষণ দেখে বোঝা যায়, এতে নার্ভতন্ত্র (বা, স্নায়ুতন্ত্র) আক্রান্ত হয়।...সেখানেই এই অজ্ঞাত জীবাণুর সন্ধান করতে হবে। জীবাণু দেখা যায় নি, তবুও মনে হয়, সেখানেই হয়তো এদের বংশ-বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। যদি কোন প্রকারে সোজাসুজি কুকুরের মস্তিষ্কে এই জীবাণু প্রবেশ করানো যায়, তাহলে নিশ্চয়ই কাজ হবে।"

আর কেউ হলে নিশ্চয়ই বলতো,—পাগলের প্রলাপ! কিন্তু রুক্‌স-এর মতো শিষ্য হয় না। তিনি চুপচাপ সব শুনে গেলেন। কোনো তর্ক করলেন না কিংবা কোনো প্রতিবাদ করলেন না। তারপর একদিন একটি কুকুরকে ক্লোরোফর্ম-এর সাহায্যে অজ্ঞান ক'রে, এবং অপূর্ব কুশলতার সঙ্গে যন্ত্রের সাহায্যে তার মাথার খুলি ফুটো ক'রে, সেখানে এই জীবাণু খানিকটা ঢুকিয়ে দিলেন।

কুকুরটি তখনই মরে গেলে কিছু বলার ছিল না। কিন্তু কী আশ্চর্য! কুকুরটি বেঁচে রইলো। কিন্তু প্রায় দু'সপ্তাহ পরেই কুকুরটি পাগল হয়ে গেল। তারপর একদিন অনিবার্য মৃত্যুর কোলে সে ঢলে পড়লো।

এই পরীক্ষার ফল লক্ষ্য ক'রে পাস্তুর খুবই উৎসাহিত হলেন। তিনি বললেন,—"জীবাণু দেখা যাচ্ছে না, একথা সত্যি, কিন্তু জীবাণু নিশ্চয়ই আছে। সম্ভবতঃ তা এতো ছোট যে, অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যেও তা নজরে আসছে না (Virus)। ...ফ্লাস্কে (বা,

কাচকূপীতে) মাংসের স্যুপের মধ্যে এদের বংশবৃদ্ধি করা যাচ্ছে না। তাতে কী হয়েছে ? এই মারাত্মক জীবাণুকে নিশ্চয়ই খরগোশের মস্তিষ্কের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে। তারপর এর টিকা তৈরির জন্যে চেষ্টা করতে হবে। এছাড়া আর উপায় কী ?"

কিন্তু বলা যত সহজ, কাজটা করা তত সহজ হ'ল না। পাস্তুর এবং তাঁর ছুই সহকর্মী রুক্স্ ও চেম্বারল্যাণ্ড নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁরা পাগলা কুকুরের মেরুমজ্জা থেকে ভাইরাস্ সংগ্রহ করলেন। সেই বিষ একটি খরগোশের দেহে, তা থেকে আর একটির দেহে, এইভাবে পর পর ইন্‌জেক্‌শন ক'রে দেখলেন যে, এইভাবে বিষের তীব্রতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। এই বিষ মেরুমজ্জায় থাকে, কিন্তু তা বাতাসে শুকোতে দিলে বিষের তীব্রতা ক্রমশঃ কমতে থাকে। এইভাবে প্রায় তিন বছর ধরে অক্লান্ত সাধনা করার পর, মৃদু থেকে ক্রমশঃ তীব্র মাত্রার টিকা তৈরি করতে তাঁরা সক্ষম হলেন। প্রাথমিক পরীক্ষায় বোঝা গেল, পাগলা কুকুরে কামড়ালে, রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার আগেই, যদি মৃদু থেকে আরম্ভ ক'রে ক্রমশঃ বর্ধিত মাত্রার টিকা (ইন্‌জেক্‌শন) দেওয়া যায়, পরপর চৌদ্দ দিন ধরে, তাহলে তার শরীরে জীবাণু বাড়তে পারে না, এবং রোগের লক্ষণও প্রকাশ পায় না। কিন্তু শরীরে এমন প্রতিরোধ-শক্তি (Immunity) অর্জিত হয় যে, মারাত্মক ভাইরাসও তার কোনো অনিষ্ট সাধন করতে পারে না। [The patient receives an injection of the weakest virus ; then, day by day, he receives injections of stronger and stronger virus, until, after two weeks, the patient's resistance to the discease is so increased that he becomes immune, and can resist the strongest virus from a mad dog.]

কিন্তু এই টিকার পরীক্ষা তো সুস্থ লোকের উপর করা সম্ভব

নয়। তাহলে উপায়? পাস্তুর মহা সমস্যায় পড়লেন। এই সব ভাবনা-চিন্তায় তিনি এমন মগ্ন হয়ে রইলেন যে, রুক্‌স, চেম্বারল্যাণ্ড, এমন কি মাদাম পাস্তুরের পক্ষেও তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। ১৮৮৪ সাল, এই প্রথম বিবাহের তারিখটির কথাও তিনি ভুলে গেলেন। এজন্য মাদাম পাস্তুর এমনই মর্মাহত হলেন যে, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আপন কন্যাকে লিখলেন,—"তোমার বাবা সব সময় নিজের গবেষণা নিয়েই মেতে রয়েছেন। আজকাল কথা বলেন কম, ঘুমান কম। খুব ভোরে ওঠেন, এবং এক কথায় বলা যায়, পঁয়ত্রিশ বছর আগে আমার সঙ্গে যেভাবে জীবন শুরু করেছিলেন, আজও ঠিক সেই রকমই উদাসীন রয়েছেন।"

এদিকে সমস্যার কোনো সন্তোষজনক সমাধান করতে না পেরে পাস্তুর স্থির করলেন, এবার নিজের উপরেই এই টিকার পরীক্ষা ক'রে দেখবেন। এ এক ভয়ংকর সিদ্ধান্ত। কিন্তু এ ছাড়া উপায় কী? এইরূপ অবস্থায় একদিন দৈবক্রমে এই সমস্যার একটি সহজ সমাধান হ'য়ে গেল। একটি স্ত্রীলোক (শ্রীমতী মাইস্টার) কাঁদতে কাঁদতে পাস্তুরের ল্যাবরেটরীতে এলেন। তাঁর নয় বছরের ছেলে যোসেফ মাইস্টার (Joseph Meister)-কে পাগলা কুকুরে কামড়েছে।

ছেলেটির দেহে প্রথম ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া হ'ল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুলাই একটি স্মরণীয় দিন। সেই দিন থেকে আরম্ভ ক'রে প্রতিদিন একটি ক'রে মোট চোদ্দটি ইন্‌জেক্‌শন তাকে দেওয়া হ'ল। এর ফলে সে আর জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হ'ল না, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল।

পাস্তুরের কষ্টসাধ্য গবেষণার ফলে একটি দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার ব্যবস্থা হ'ল। এজন্য চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল। পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে রোগীরা আসতে লাগল। প্রত্যেকের মুখেই করুণ আবেদন,—পাস্তুর, দয়া কর, আমাকে বাঁচাও!

পাস্তুর এবং তাঁর সহকর্মীরা আহার-নিদ্রা ভুলে, দিবারাত্রি কঠোর পরিশ্রম ক'রে টিকা তৈরি করতে লাগলেন, এবং সেই টিকার সাহায্যে চিকিৎসা ক'রে সেই সব হতভাগ্য রোগীদের সুস্থ ক'রে তুলতে লাগলেন।

এই সময় সুদূর স্মোলেস্ক থেকে উনিশ জন রুশ চাষী এলেন, চিকিৎসার জন্যে। ঠিক উনিশ দিন আগে এদের সবাইকে পাগলা নেকড়ে বাঘে কামড়েছে। এদের মধ্যে পাঁচজন আবার এমন জখম হয়েছেন যে, হেঁটে চলতেও তারা অক্ষম।

দারুণ উত্তেজনায় সারা প্যারিস শহর চঞ্চল হয়ে উঠল। সবার মুখেই তখন একটি কথা,—এরা কি বাঁচবে ? বড্ড দেরী হয়ে গেছে !

অনেকেই বললেন,—না, এদের পক্ষে সেরে ওঠা কিছুতেই সম্ভব নয়।

এদিকে পাস্তুর ও তাঁর সহকর্মীরা প্রশান্তচিত্তে একটির পর একটি ক'রে ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে চলেছেন। সত্যি বড্ড দেরী হয়ে গেছে ! এজন্য তাঁরা প্রতিদিন দু'বার ক'রে ইন্‌জেক্‌শন দিতে লাগলেন।

অবশেষে একদিন প্যারিসের সকল মানুষ তাদের ত্রাণকর্তা পাস্তুরের জন্যে গর্বে ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। মাত্র তিনজন ছাড়া বাকি ষোল জনই সুস্থ হয়ে উঠল, এবং রাশিয়ায় ফিরে গেল।

রাশিয়ার জার কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ একটি হীরক খচিত ক্রশ এবং এক লক্ষ ফ্রাঁ পাঠিয়ে বিজ্ঞানীকে সম্মানিত করলেন। প্রধানতঃ এই অর্থ দিয়ে, এবং সেই সঙ্গে আরও কিছু অর্থ চাঁদা তুলে সংগ্রহ ক'রে তাই দিয়ে, একটি গবেষণাগার স্থাপন করা হ'ল। আর এই মহান বিজ্ঞানীরা সম্মানার্থে তার নাম দেওয়া হ'ল 'পাস্তুর ইন্‌স্টিটিউট'।

পাস্তুরের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদানের প্রতীক স্বরূপ একটি মর্মর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে, এই গবেষণা-কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে—একটি পাগলা

কুকুর একটি বালককে আক্রমণ করেছে, আর সে তাতে প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে।

একটি অপূর্ব ভাস্কর্যের নিদর্শন হিসেবে এটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১৯৮৪ সালের সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে জলাতঙ্কে প্রতি বছর প্রায় পাঁচশ' জন মারা যান, তারমধ্যে প্রায় দেড়শ' জনই কলকাতায়। বছরে এরাজ্যে প্রায় নব্বই হাজার মানুষকে কুকুরে কামড়ায়, তার মধ্যে বিশ হাজারই কলকাতায়। বিশেষজ্ঞরা বলেন, বছরে যত লোক জলাতঙ্কে আক্রান্ত হন তার নব্বই ভাগই আক্রান্ত হন কুকুরের কামড় থেকে। বাকি দশ ভাগ আক্রান্ত হন বেড়াল, শেয়াল, নেকড়ে বাঘ, নেউল প্রভৃতি শ্বদন্তওয়ালা উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট প্রাণীর কামড়ে।

কলকাতার পাস্তুর ইনস্টিটিউটের সুপারিনটেনডেন্ট ডঃ জে. দাস একটি সাক্ষাৎকারে বলেন যে, ঐ ইনস্টিটিউটের বহির্বিভাগে ১৯৮৩ সালে বিশ হাজার একশ' একানব্বই জনকে অ্যান্টি র‍্যাবিড ভ্যাক্‌সিন (সংক্ষেপে এ. আর. ভি.) দেওয়া হয়, এবং এজন্য ঐ বছরে খরচ করা হয় নয় লক্ষ টাকা। শতকরা নব্বইভাগ ভ্যাক্‌সিন কেবলমাত্র সন্দেহের বশেই দিতে হয়। কারণ, রাস্তার কুকুরের উপর নজর রাখা সম্ভব নয়।

পাগলা কুকুরে কামড়ালে, ইন্‌জেক্‌শন দিতেই হবে। কারণ, একবার রোগ প্রকাশ পেলে, মৃত্যু অনিবার্য। বেলেঘাটার সংক্রামক ব্যাধির হাসপাতাল (অর্থাৎ, আই. ডি হস্‌পিট্যাল) থেকে প্রাপ্ত সালওয়ারি হিসেবটা এই রকম—

বছর	রোগী ভর্তি	মৃত্যু
১৯৭৯	১৫৫	১৫৫
১৯৮০	১৪৪	১৪৪
১৯৮১	১৬২	১৬২
১৯৮২	১৬৬	১৬৬
১৯৮৩	১৪৫	১৪৫

হাসপাতালের এই হিসেবই বলে দিচ্ছে যে, জলাতঙ্ক হলে মৃত্যু নিশ্চিত। সুতরাং, এ বিষয়ে সকলেরই সতত সতর্ক থাকা উচিত। কলকাতা করপোরেশনের হিসেবমত কলকাতার রাস্তায় ভ্রাম্যমান বেওয়ারিশ কুকুরের সংখ্যা প্রায় দু'লক্ষ। আর পুরসভা থেকে প্রতিবছর প্রায় আড়াই হাজার পোষা কুকুরের লাইসেন্স দেওয়া হয়ে থাকে।

পাগলা কুকুরের লক্ষণ কী ? মুখ দিয়ে ক্রমাগত লালা ঝরা, পেছনের পা দুর্বল হয়ে যাওয়া। লেজ নামিয়ে রাখা, খাওয়ার প্রতি অনীহা, অথচ সব কিছু কামড়ে ধরার প্রবণতা, মুখ দিয়ে অস্বাভাবিক আওয়াজ করা প্রভৃতি হ'ল
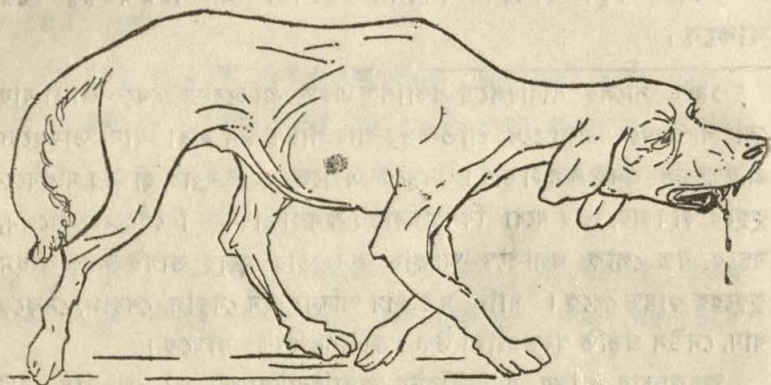
চিত্র ১৩। পাগলা কুকুর।

পাগলা কুকুরের লক্ষণ। এই রকম কুকুরে কামড়ালে, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থানটি, অন্ততঃ পনেরো মিনিট ধরে, বারবার সাবান-জল দিয়ে ধুয়ে, তারপর টিংচার আইওডিন অথবা কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দিতে হবে। এর ফলে জলাতঙ্ক রোগ হওয়ার আশঙ্কা অনেক কমে যাবে। তা সত্ত্বেও ঐ ব্যক্তিকে এ. আর. ভি. দেওয়া দরকার। আর পাগলা কুকুরে কামড়েছে একথা জানা গেলে, ভ্যাক্সিন নেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

১৯৮৫ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, পাগলা কুকুরের কামড়ে যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে জলাতঙ্ক রোগ ছড়াতে না পারে, এবং পোষা কুকুর যাতে এই "র‍্যাবিজ" রোগে আক্রান্ত না হয়, সেজন্য রাজ্যের পশুচিকিৎসা অধিকার কলকাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের সহযোগিতায় এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে গত ২১ জানুয়ারী থেকে দ্বিমুখী যে বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে, সেই অনুসারে আছে : (১) বেওয়ারিশ পথের কুকুর ধরে মেরে ফেলা, এবং (২) পোষা কুকুরকে ওই রোগের প্রতিষেধক টিকা দান। ৫ই মার্চ পর্যন্ত অভিযানটি চলবে। '৮৪-'৮৫ সালের বাজেটে এই খাতে ৩ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা বরাদ্দ আছে।

আশা করি এতে সুফল পাওয়া যাবে।

বি. সি. জি. টিকা

যক্ষ্মা অত্যন্ত সংক্রামক ব্যাধি। এই রোগের জন্য দায়ী জীবাণুর নাম 'টিউবারকল্ ব্যাসিলাস' (Tubercle bacillus, সংক্ষেপে T. B.)। বিজ্ঞানী কক্ এই জীবাণু আবিষ্কার করেন। এ জাতীয় জীবাণু ফুসফুসে, শ্বাসনলে, পাকস্থলীতে, এমনকি হাড়েও আক্রমণ করে। যক্ষ্মা রোগের জীবাণু বাসা বাঁধে ফুসফুসে।

যক্ষ্মা-জীবাণু দেহে প্রবেশ করলেই যে রোগ প্রকাশ পাবে, তা নয়। যতদিন দেহের প্রতিরোধ শক্তি প্রবল থাকে ততদিন দেহ ব্যাধিমুক্ত থাকে। কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রমে কিংবা পুষ্টির অভাবে দেহ ক্ষীণবল হলেই জীবাণু আধিপত্য বিস্তার করে, এবং তার ফলে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

সাধারণতঃ অনেকদিন ধরে ধীরে ধীরে এই রোগ প্রকাশ পায়। প্রথম অবস্থায় ঘুসঘুসে জ্বর ও কাশি আরম্ভ হয়, আর সর্বদাই ক্লান্তি বোধ হয়। কিছুদিন বাদে কাশির সঙ্গে রক্ত পড়তে থাকে। তখন রোগীর থুথু ও কাশির সাহায্যে এই জীবাণু বাতাসে ছড়ায়। তাছাড়া রোগীর এঁটো খেলে অথবা হোটেলে-রেস্তোরাঁয় যেখানে-সেখানে অপরিষ্কার পাত্রে চা, সরবত ইত্যাদি খেলেও এই রোগ সংক্রামিত হতে পারে। অন্ধকার স্যাঁত স্যাঁতে পরিবেশ, মুক্ত বায়ুর অভাব, অল্প স্থানে অত্যধিক লোকের বাস প্রভৃতি এই রোগ প্রসারে সহায়তা করে। শহর অঞ্চলের জনসংখ্যা অত্যধিক বেড়ে যাওয়ার ফলে, এবং সাধারণ লোকের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হওয়ার ফলে, যক্ষ্মা-রোগীকে সঙ্গরোধ ক'রে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে রাখার ব্যবস্থা করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। এই কারণে সুস্থ মানুষ অনবরত যক্ষ্মা-রোগীর সংস্পর্শে আসতে বাধ্য হয়, তাই এ রোগ অতি সহজেই তাদের দেহে সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ছাড়া সাধারণ লোকের অজ্ঞতা হেতু সময়মত রোগ

নির্ণয় হয় না, কাজেই অনেক রোগী, না জেনেই, সুস্থ লোকদের মাঝে অবাধে মেলামেশা ক'রেও এই রোগ বিস্তারে সহায়তা করে। এইসব কারণে শহর অঞ্চলে বসবাস করলে সব সময়ই এই ব্যাধি সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

প্রথম অবস্থায় ধরা পড়লে, এবং সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করলে, আজকাল এই রোগ সারানো যায়, একথা সত্যি। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রোগ ধরা পড়ে অনেক দেরীতে। তার আগেই জীবাণুদের সংখ্যা এতো বেশী বেড়ে যায়, এবং তারা ফুসফুসে ক্ষত সৃষ্টি ক'রে এমন স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধে ফেলে যে, তখন তাদের ধ্বংস ক'রে রোগীকে নীরোগ ক'রে তোলা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

স্বাধীনতার অল্প কিছুদিন পরেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউর বলেন,—"কিন্তু অর্থের অভাববশতঃ প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট সংখ্যক চিকিৎসালয়, হাসপাতাল ও স্যানোটোরিয়াম খুলতে আরও বহু বছর লাগবে। জীবনধারণের অতি নিম্ন-মান, বাসগৃহের অভাব, অপুষ্টি প্রভৃতি প্রতিবন্ধকগুলিকে জয় করা বিশেষ সময় সাপেক্ষ।" স্বাধীনতার আটত্রিশ বছর পরেও যে অবস্থার খুব বেশী পরিবর্তন হয়েছে তা বলা যায় না। সুতরাং, এই পরিস্থিতিতে যক্ষা-রোগ থেকে আত্মরক্ষা করার সহজ ও সার্থক উপায় হ'ল, এই রোগ-জীবাণু যাতে কোন ক্রমেই আমাদের দেহে প্রবেশ করতে না পারে, অথবা দৈবাৎ প্রবেশ করলেও যাতে কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করতে না পারে, সে-বিষয়ে রীতিমত সাবধানতা অবলম্বন করা।

বিজ্ঞানী পাস্তুর অ্যান্থ্রাক্স এবং জলাতঙ্ক রোগের টিকা আবিষ্কার করেছেন। তাঁর সুদীর্ঘকালের গবেষণার ফলে নিশ্চিত বোঝা গেছে যে, মারাত্মক রোগ-জীবাণুকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় নিস্তেজ ক'রে নেবার পর, তারই সাহায্যে টিকা নিলে মানবদেহে রোগ প্রকাশ পায় না, অথচ এর ফলে দেহের মধ্যে যে প্রতিরোধ-শক্তি জন্মায় তারই সাহায্যে পরে সেই জীবাণুর আক্রমণ থেকে

আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয়। এইভাবে টিকার বৈজ্ঞানিক তথ্য নির্ভুলভাবে জানা গেল, এবং ক্রমে কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি আরও নানাপ্রকার মারাত্মক রোগের টিকা আবিষ্কৃত হ'ল।

অন্যান্য মারাত্মক ব্যাধির ক্ষেত্রে টিকার সাফল্য লক্ষ্য ক'রে একদল বিজ্ঞানী দুরারোগ্য যক্ষ্মা-রোগের টিকা আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে গবেষণা শুরু করেন। এ বিষয়ে অগ্রণী হলেন যক্ষ্মা-জীবাণুর আবিষ্কর্তা কক্। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক চেষ্টা ক'রেও তিনি টিকার উপযোগী নিস্তেজ ও নিরাপদ ধরনের জীবাণু সৃষ্টি করতে পারলেন না। অপরদিকে দেখা গেল, মৃত জীবাণুর সাহায্যে মানবদেহে কোনরূপ প্রতিরোধ শক্তিই অর্জিত হয় না। ক্যাল্‌মেৎ (Calmette) এবং গের‍ঁা (Guerin) নামক দু'জন ফরাসী বিজ্ঞানী ১৯০৮ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত গবেষণা ক'রে শেষ পর্যন্ত যক্ষ্মা-প্রতিরোধী বি. সি. জি. টিকা (Bacillus Calmette-Guerin, অথবা B. C. G. Vaccine) আবিষ্কার করতে সক্ষম হন।

এই দু'জন ফরাসী বিজ্ঞানী গো-যক্ষ্মার জীবাণুকে আলু ও গো-পিত্ত-রস মিশ্রিত খাদ্য-মাধ্যমে ক্রমাগত বংশানুক্রমিকভাবে "কাল্‌চার" (culture) বা চাষ করতে থাকেন। দেখা গেল, এই ভাবে কাল্‌চার করার ফলে, কয়েক প্রজন্ম পরে জীবাণুগুলি নিস্তেজ ও নিরাপদ হয়ে যায়। অবশ্য এই কাজে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। কারণ, দৈবাৎ এই সব নিস্তেজ জীবাণুর সঙ্গে সামান্য দু'-একটি সতেজ জীবাণু মিশে গেলেও তারা নিশ্চিত-রূপে বিপদ ঘটাবে।

এইভাবে দু'শ' থেকে আড়াইশ' প্রজন্ম ধরে ক্রমাগত কাল্‌চার (বা, চাষ) করার পর যে নিস্তেজ জীবাণু পাওয়া গেল, তাদের সাহায্যে প্রথমে জীব-জন্তুর দেহে টিকা দেওয়া হ'ল। প্রাথমিক পরীক্ষার ফলে এই টিকার সাফল্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে, তারপর মানবদেহে এই টিকা দেওয়া হ'ল। সব ক্ষেত্রেই দেখা গেল, এই

টিকার সাহায্যে নিশ্চিতরূপে প্রতিরোধ-শক্তি বা অনাক্রম্যতা (Immunity) অর্জিত হয়, এবং তারই সাহায্যে পরে মারাত্মক যক্ষ্মা-জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।

দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনার ফলে এইভাবে বি. সি. জি. টিকা আবিষ্কৃত হওয়ায় চারিদিকে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হ'ল এবং পৃথিবীর নানা স্থানে এই টিকা সম্পর্কে আরও ব্যাপক অনুসন্ধান এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হ'ল। তার ফলে এই টিকা দেবার রীতি-নীতি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা যায়।

আগেই বলা হয়েছে, শহরে বাস করার ফলে, অথবা যক্ষ্মা রোগীর সংস্পর্শে আসার ফলে, আমাদের অজ্ঞাতসারে দেহের মধ্যে যক্ষ্মা-জীবাণু প্রবেশ করা সম্ভব। দেহের প্রতিরোধ-শক্তি প্রবল থাকলে, আমরা সুস্থ থাকি। শুধু তাই নয়, যক্ষা-জীবাণুর সঙ্গে এই সংগ্রামের ফলে আমাদের দেহের প্রতিরোধ-শক্তি আরও বেড়ে যায়। এই রকম লোককে বি. সি. জি. টিকা দেওয়া চলে না। এই কারণে, সাধারণতঃ শিশুদের অথবা অল্প বয়স্ক বালক-বালিকাদেরই এই টিকা দেওয়া হয়। তবে টিকা দেবার আগে, প্রত্যেককেই 'টিউবারকুলিন' ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে পরীক্ষা ক'রে নেওয়া উচিত।

[**Tuberculin**—Substance prepared from cultures of the bacilli of tuberculosis. Introduced by Koch in 1890, it was expected to provide an effective cure for tuberculosis. Its use proved disappointing and it virtually ceased to be used therapeutically ; but it is used in testing whether a person has ever come in contact with the tuberculosis germ. (The New Universal Encylopedia).]

এই পরীক্ষার জন্য, এক বিন্দু 'টিউবারকুলিন' বাঁ হাতের চামড়ার মধ্যে ইন্‌জেক্‌শন দিতে হয়। এর ফলে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সেই স্থানের চামড়া লাল হয়ে উঠলে, এবং সেখানে প্রদাহের সৃষ্টি হলে, বুঝতে হবে যে, এর দেহে প্রতিরোধ-শক্তি আছে। অর্থাৎ, এ:ক

বি. সি. জি. টিকা দেওয়া চলবে না। অপরপক্ষে পরীক্ষার পর চামড়া লাল না হলে, কিংবা কোন প্রদাহ না হলে, বুঝতে হবে যে, এর প্রতিরোধ-শক্তি নেই। অর্থাৎ, একে বি. সি. জি. টিকা দেওয়া উচিত।

এইভাবে পরীক্ষা ক'রে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়ার পর ছেলেটির (বা, মেয়েটির) বাঁ হাতে, কাঁধের একটু নীচে, চামড়ার মধ্যে, বি. সি. জি. টিকার ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া হয়। এরপর তিন থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে সেখানে একটি ছোট ফুসকুড়ি দেখা দেয়, এবং পরে তাই ফোঁড়ার মতো হয়ে শেষে ঘায়ে পরিণত হয়। এরপর বিনা-চিকিৎসাতেই ধীরে ধীরে ঘা-টি সম্পূর্ণ সেরে গেলে, তবেই টিকা কার্যকরী হয়। এই কারণে, ঘা-টি সারাবার জন্যে কোনরূপ ওষুধ প্রয়োগ করা চলে না।

এইভাবে টিকা কার্যকরী হলে দেহে যে প্রতিরোধ-শক্তি জন্মায়, তার সাহায্যে পাঁচ থেকে সাত বছর পর্যন্ত নিশ্চিতরূপে যক্ষ্মা-জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। তবে সাবধানতার অঙ্গ স্বরূপ,টিকা নেবার পর, প্রতি তিন বছর অন্তর পুনরায় 'টিলবারকুলিন' পরীক্ষা ক'রে দেখা উচিত, দেহে যথেষ্ট পরিমাণ প্রতিরোধ-শক্তি আছে কিনা। আর সেই পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর ক'রে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করাও খুবই প্রয়োজন।

ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতার ফলে বিজ্ঞানীরা এই টিকার কার্যকারিতা সম্পর্কে এতটা নিঃসন্দেহ হন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান (United Nations' Organisation, সংক্ষেপে U. N. O.)-এর অন্তর্ভুক্ত 'বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংস্থা' (World Health Organisation, সংক্ষেপে W. H. O.)-এর উদ্যোগে সমগ্র পৃথিবীতে এর ব্যাপক প্রয়োগ আরম্ভ করা হয়। ১৯৪৮ সালের ১লা জুলাই থেকে ১৯৫১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত তিন বছরে, উত্তরে ফিনল্যাণ্ড থেকে আরম্ভ ক'রে দক্ষিণে সিংহল বা শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত তেইশটি দেশে, প্রায় তিন কোটি শিশুকে পরীক্ষা করা হয়, এবং তাদের মধ্যে প্রায় দেড় কোটি শিশুকে এই টিকা দেওয়া হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে ভারতেও এর ব্যাপক প্রয়োগ আরম্ভ হয়েছে। একটি হিসেবে দেখা যায়, ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫৪ সালের মে মাস পর্যন্ত, একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই ২৭,৩০,৪৯৭ জনকে 'টিউবারকুলিন' দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে, এবং তাদের মধ্যে ১০,২৭,৫৭৭ জনকে এই টিকা দেওয়া হয়েছে।

সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিবছর প্রায় ৫০ লক্ষ লোক যক্ষ্মা রোগে মারা যায়। সুতরাং, 'টিউবারকুলিন-নেগেটিভ' লোকদের এইরকম ব্যাপকভাবে যদি বি. সি. জি. টিকা দেওয়া যায়, তাহলে আশা করা যায় যে, অল্প সময়ের মধ্যেই সাধারণ লোকদের মধ্যে যক্ষ্মা রোগের প্রসার অনেক কমিয়ে ফেলা যাবে। ডেনমার্ক এবং নেদারল্যাণ্ড এ বিষয়ে খুবই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে, এবং এই দু'টি দেশ যক্ষ্মা রোগকে একেবারে নির্মূল ক'রে ফেলেছে বলা যায়। যক্ষ্মা রোগের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালাবার ফলে, ১৯৫৩ সালেই সেখানে এই রোগে মৃত্যু-হার দাঁড়ায় প্রতি দশ লক্ষে মাত্র নব্বই জনে।

এই প্রসঙ্গে আরও মনে রাখা দরকার যে, শুধু বি. সি. জি. টিকা দেবার ব্যবস্থা করলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না। যারা ইতিমধ্যে রোগাক্রান্ত হয়েছে, তারা অবিরত জীবাণু ছড়িয়ে আমাদের সমাজ-জীবন বিপন্ন ক'রে তুলছে। কাজেই তাদের স্যানাটোরিয়ামে, বা অনুরূপ কোনো স্বাস্থ্যকর স্থানে, সঙ্গরোধ ক'রে রাখার এবং সুচিকিৎসার সাহায্যে তাদের দ্রুত নিরাময় করার ব্যবস্থাও অবশ্যই করতে হবে। এ ছাড়া জনস্বাস্থ্য এবং জনগণের অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের এবং পরিশেষে তাদের অপুষ্টি দূরীকরণের দিকেও সদা-সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

খুবই আশার কথা এই যে, স্বাধীনতার পর থেকে ভারত সরকার ও জনসাধারণ এ বিষয়ে ক্রমশঃ সচেতন হয়ে উঠেছেন। এদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি সঠিকভাবে রূপায়িত হলে, আশা করা যায় যে, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্তে এবং নিরাপদে সুস্থ নাগরিক জীবন যাপন করতে পারবে।

সিরাম আবিষ্কারের গোড়ার কথা

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে বার্লিনের বের্গমান হাসপাতালের ডিফ্‌থেরিয়া ওয়ার্ডে কতকগুলি অসহায় শিশু ধীরে ধীরে নিশ্চিত মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছে। কোন্ এক অদৃশ্য শত্রুর কঠিন শীতল স্পর্শে ফুলের মতো শুভ্র সতেজ শিশুগুলি যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। ডাক্তাররা অসহায়ভাবে ছোট্ট ছোট্ট খাটগুলির মধ্য দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, যদি কিছু করতে পারেন। যে হতভাগ্য শিশুর গলা থেকে বিশ্রী ঘর্ঘর আওয়াজ উঠে শ্বাসকষ্ট জানিয়ে দিচ্ছে, তার শ্বাসনালীতে ফুটো ক'রে হয়তো একটা নল লাগিয়ে শ্বাস নেবার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছেন। এছাড়া আর কি-ই বা তাঁরা করতে পারেন! তাঁরা নিশ্চিত জানেন যে, রোগাক্রান্ত দশটি শিশুর মধ্যে অন্ততঃ পাঁচটি শিশুই মা-বাবার সুখের স্বপ্ন অকালে ভেঙ্গে দিয়ে পরপারে চলে যাবে। তাই তাঁদের স্বভাব-কঠোর ভাবলেশহীন মুখেও বেদনার ছাপ ফুটে উঠেছে। এইরকম একটা অসহায় অবস্থার মধ্যে বিজ্ঞানী এমিল অ্যাডল্‌ফ ফন্ বেহরিং (Emil Adolf Von Behring) (১৮৫৪—১৯১৭) সেই হাসপাতালের একটি নিশ্চিত মৃত্যু-পথ-যাত্রী শিশুর কোমল অঙ্গে তাঁর নতুন আবিষ্কৃত একটি ওষুধের প্রথম পরীক্ষা করলেন। ওষুধে মন্ত্রের মতো কাজ হ'ল। অল্পদিনের মধ্যেই অনেকগুলি শিশুকে এই নতুন ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হ'ল। তাদের মধ্যে অনেকেই সুস্থ হ'য়ে মায়ের কোলে ফিরে গেল। এই নতুন ওষুধটির নাম হ'ল ডিফ্‌থেরিয়া সিরাম (serum)। ইতিপূর্বে এই জাতীয় কোন ওষুধের কথা কেউ জানতো না ; তাই এর সাফল্যে চিকিৎসা-শাস্ত্রে একটা নতুন যুগের সূচনা হ'ল। আর তারই স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯০১ সালে শারীরবৃত্ত ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় বিজ্ঞানী বেহরিংকে।

এখানে সেই সিরাম আবিষ্কারের কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী বর্ণনা করা হ'ল।

জার্মান বিজ্ঞানী কক্ প্রথম রোগ-জীবাণু আবিষ্কার করার পর পৃথিবীর নানা দেশে বিজ্ঞানীরা সব মারাত্মক ব্যাধির জীবাণু আবিষ্কার করার উদ্দেশ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সেই সময়ে ককের এক-জন শিষ্য ফ্রেডরিক লোয়েফ্‌লার (Friederich Loeffler) (১৮৫২—১৯১৫) বিভিন্ন হাসপাতালে ঘুরে মৃত শিশুদের অঙ্গে ডিফ্‌থেরিয়া জীবাণুর সন্ধান করতে লাগলেন।

চিত্র ১৪। এমিল অ্যাডল্‌ফ ফন্ বেহ্‌রিং।

[উল্লেখ্য যে, রক্তের তিনটি প্রধান প্রোটিন হ'ল— অ্যালবুমেন (albumen), গ্লোবিউলিন (globulin) এবং ফাইব্রিনোজেন (fibrinogen)। আর এদের মধ্যে ফাইব্রিনোজেন-এরই আণবিক আয়তন এবং ওজন সবচেয়ে বেশী।

ডিফ্‌থেরিয়া রোগে, মুখগহ্বরের ঝিল্লী-আবরণে যে প্রদাহ সৃষ্টি হয়, তাতে নির্যাসের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ফাইব্রিনোজেন নির্গত হয়। ফাইব্রিনোজেন পরিবর্তিত হয়ে ফাইব্রিন (fibrin)-এ পরিণত হয়। এজন্য প্রদাহস্থলে ফাইব্রিন-এর আধিক্য ঘটে। ফাইব্রিন একপ্রকার আঠালো প্রোটিন। এজন্য রোগীর ঝিল্লী-আবরণে, অথবা অন্য কোনো শ্লেষ্ম-ঝিল্লী আবৃত দেহাঙ্গে (যেমন—

টন্‌সিল-গ্রন্থির উপরে), ফাইব্রিন-ঋদ্ধ-প্রদাহ হয়। এরকম হলে, বিনষ্ট ঝিল্লীর সঙ্গে আঠালো ফাইব্রিন যুক্ত হয়ে একপ্রকার পাতলা চাদরের মতো আবরণ সৃষ্টি করে। এজন্য ডিফ্‌থেরিয়া রোগীর মুখগহ্বরে, অথবা টন্‌সিল-গ্রন্থির উপরে, আক্লিষ্ট স্থানে সাদা চাদরের মতো আচ্ছাদন দেখা যায়।]

চিত্র ১৫। ডিফ্‌থেরিয়া রোগীর মুখগহ্বরে, অথবা টনসিল-গ্রন্থির উপরে, আক্লিষ্ট স্থানে সাদা চাদরের মতো আচ্ছাদন দেখা যায়। ঐ আচ্ছাদনের গঠন।

দীর্ঘদিন গবেষণা ক'রে লোয়েফলার লক্ষ্য করলেন যে, প্রত্যেকটি রুগ্ন অথবা ঐ রোগে মৃত শিশুর গলায় গদার আকারের একরকম অতি ক্ষুদ্র নতুন জীবাণুর সন্ধান পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এরাই ডিফ্‌থেরিয়া রোগের জন্য দায়ী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মৃত শিশুদের দেহ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও দেহের অন্য কোথাও এইসব জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেল না।

ককের নির্দেশে লোয়েফ্‌লার এই জীবাণুর বিশুদ্ধ কাল্‌চার বা চাষ করতে লাগলেন। খরগোশের শ্বাসনালীতে এবং গিনিপিগের চামড়ার নীচে এই জীবাণুর ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে দেখা গেল, ধীরে ধীরে তাদের দেহেও ডিফ্‌থেরিয়া রোগ প্রকাশ পায় এবং রুগ্ন শিশুদের মতো তারাও অচিরে প্রাণ হারায়। বিজ্ঞানী অবাক হ'য়ে দেখলেন, এই মৃত প্রাণীগুলির দেহেও জীবাণুর কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেল

না। যেখানে ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে জীবাণু প্রবেশ করানো হয়েছিল, পরে সেখানে হয়তো বা কিছু জীবাণু দেখা যায়, কিন্তু দেহের অন্য কোন অংশে দৈবাৎ একটি জীবাণুও দেখা যায় না। জীবাণুদের স্বল্পকালের ইতিহাসে এরূপ ঘটনার কথা ইতিপূর্বে জানা যায় নি। ইতোমধ্যে যেসব জীবাণু মানুষের সন্ধানী চোখে ধরা পড়েছে, দেহের মধ্যে তাদের সংখ্যা হু হু ক'রে বেড়ে যায়, এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তারা দেহযন্ত্র বিকল ক'রে দেয়। বিস্মিত লোয়েফ্‌লার তাই ভাবলেন, এই সামান্য কয়েকটি জীবাণুরই কি এতো শক্তি যে, তাদের চেয়ে লক্ষগুণ বড় একটা শিশুর প্রাণশক্তিও কয়েকদিনের মধ্যে নিঃশেষ করে দিতে পারে! অনেক ভেবে তিনি মন্তব্য করলেন—"এই জীবাণুদের দেহ থেকে নিশ্চয়ই এক রকম বিষ নিঃসৃত হয়। ডিফ্‌থেরিয়া রোগে মৃত শিশু অথবা গিনিপিগের দেহে এই বিষ নিশ্চিত পাওয়া যাবে।" এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বললেন,—"আমি নিজে যা প্রমাণ করতে পারলাম না, তার প্রমাণ দেবে এই বিষের আবিষ্কারক।" মাত্র চার বৎসর পরেই তাঁর এই বিশ্বাস সত্য বলে প্রমাণিত হ'ল এবং ডিফ্‌থেরিয়ার এই অজ্ঞাত বিষটি আবিষ্কৃত হ'ল।

ইতোমধ্যে ফ্রান্সে বিজ্ঞানী পাস্তুর ও তাঁর সহকর্মীদের অক্লান্ত সাধনায় অ্যান্‌থ্রাক্স ও জলাতঙ্ক রোগের টিকা অসামান্য সাফল্য অর্জন করায় দেশ-বিদেশের জননীরা পাস্তুরের কাছে করুণ আবেদন জানাতে লাগলো, যাতে তিনি দুরন্ত ডিফ্‌থেরিয়া রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারে মনোযোগী হন। উপরোক্ত গবেষণায় পাস্তুরের সর্বপ্রধান সহায়ক পিয়ের পল এমিল রুক্‌স (Pierre Paul Emile Roux) (১৮৫৩—১৯৩৩) এই মহান ব্রতে ব্রতী হ'লেন। অল্প কিছুদিন পরীক্ষার পর রুক্‌সও লোয়েফ্‌লারের মতবাদ সমর্থন করলেন। তাঁরও দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে, জীবাণুগুলি যখন সংখ্যায় বেশী বৃদ্ধি পায় না তখন তারা দেহের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন বিষ ঢেলে দেয়,

আর তার ফলেই রোগী মারা যায়। কাজেই বিজ্ঞানী এই অজ্ঞাত বিষ পৃথক করার দিকে মনোনিবেশ করলেন।

তিনি একটা পাত্রে জীবাণুর চাষ করলেন এবং চারদিন পরে দ্রবণ থেকে জীবাণুগুলি ছেঁকে নেবার ব্যবস্থা করলেন। একটা কাচের লম্বা জারের মধ্যে সচ্ছিদ্র চীনেমাটি দিয়ে তৈরী মোমবাতির মতো লম্বা একটা যন্ত্র বসান হ'ল। এর ভেতরটা ফাঁপা। জীবাণু-পূর্ণ দ্রবণটি এবারে খুব সাবধানে জারে ঢেলে দেওয়া হ'ল। যন্ত্র সাহায্যে খুব চাপ দেওয়াতে দ্রবণটি ধীরে ধীরে সচ্ছিদ্র চীনেমাটির দেয়ালের ভেতর দিয়ে চুইয়ে ফাঁপা জায়গায় চলে এলো। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল, তাতে একটিও জীবাণু নেই। লোয়েফ্লার ও রুক্সের ধারণা সত্য হ'লে, এই জীবাণুমুক্ত দ্রবণের মধ্যেই সেই অজ্ঞাত ডিফ্থেরিয়া-বিষের সন্ধান পাওয়া যাবে।

রুক্স কতকগুলি খরগোশ ও গিনিপিগের দেহে এই সোনালী দ্রবণটির ইন্জেক্শন দিলেন। তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, প্রাণীগুলি অচিরে মরে যাবে। কিন্তু হায়, এতদিনের পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় সবই বুঝি ব্যর্থ হ'ল! তিনি প্রতিদিনই আশা করেন, হয়তো গবেষণাগারে গিয়ে অন্ততঃ দু'একটা প্রাণীকে মৃত দেখতে পাবেন। কিন্তু হতাশ হ'য়ে দেখেন, প্রাণীগুলি সবই সুস্থ রয়েছে, তারা সব নিশ্চিন্তে খাবার খাচ্ছে, ছুটাছুটি করছে। তাদের শরীরে বিষ তো দূরের কথা, ইন্জেক্শনের দরুণ সামান্য আঘাতের চিহ্নও যেন নেই। রুক্স ইন্জেক্শনে দ্রবণের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিয়ে নতুন ক'রে পরীক্ষা করলেন, কিন্তু এবারকার প্রাণীগুলিরও কিছুই হ'ল না। এইভাবে ক্রমাগত দ্রবণের পরিমাণ বাড়িয়ে বাড়িয়ে নতুন নতুন পরীক্ষা করতে লাগলেন, কিন্তু বিষের কোনও অস্তিত্ব বুঝতে পারলেন না। আর কেউ হ'লে হয়তো হতাশ হ'য়ে হাল ছেড়ে দিত, কিন্তু এই অসাফল্য রুক্সের কাছে বৈজ্ঞানিক মতবাদের এতই বিরোধী ব'লে মনে হ'ল যে, তিনি একেবারে

পাগলের মতো হ'য়ে গেলেন। চিকিৎসা-শাস্ত্রের সকল রীতি-নীতি বিসর্জন দিয়ে এবারে দ্রবণের মাত্রা একেবারে ত্রিশ গুণ ক'রে দিলেন। এর পরও যদি প্রাণীগুলির কিছু না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, কোথাও একটা গুরুতর গলদ নিশ্চয়ই হ'য়েছে।

পরীক্ষার জন্য একটি খরগোশ এবং একটি গিনিপিগ নেওয়া হ'ল এবং প্রত্যেকটির দেহে ৩৫ মি. লি. (বা, ঘন সেন্টিমিটার) মাত্রায় ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া হ'ল। সাধারণ নীতিবাগীশ বিজ্ঞানীরা হয়তো চোখ বড় বড় ক'রে বলবেন, ওরে বাব্‌বা, এযে প্রাণীটিকে জলে ডুবিয়ে মারার সামিল ! এর পরও কি সে বেঁচে থাকতে পারবে ? প্রাণীটি যদি তখনই মরে যেত, তাহ'লে আশ্চর্য হবার কোন কারণ ছিল না, আর তাহ'লে হয়তো এই আবিষ্কারও সম্ভব হ'ত না। তাই বিধাতার ইঙ্গিতে প্রাণী ছুটো বেঁচে রইল এবং পরদিনও বেশ সুস্থ রইল। প্রায় ৪৮ ঘণ্টা পরে তাদের দেহে সত্য সত্যই ডিফ্‌থেরিয়া রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগল, এবং ডিফ্‌থেরিয়া রোগীর মতই যন্ত্রণা ভোগ ক'রে তারা পাঁচ দিনের মধ্যেই মরে গেল। এইভাবে শেষ পর্যন্ত ডিফ্‌থেরিয়া বিষের অস্তিত্ব প্রমাণিত হ'ল।

বিজ্ঞানীরা কিন্তু তাঁর এই আবিষ্কার হেসে উড়িয়ে দিলেন। একটা ফ্লাস্ক ভর্তি জীবাণু যদি এতো সামান্য বিষ উৎপাদন করে যে, ক্ষুদ্র একটা গিনিপিগ মারতেই তার অধিকাংশ খরচ করতে হয়, তা'হলে একটা শিশুর গলায় অবস্থিত সামান্য কয়েকটা জীবাণু থেকেই তার মৃত্যু সম্ভব হয় কি করে ? এ একেবারেই অসম্ভব ! কিন্তু রুক্‌স আশার আলো দেখতে পেয়েছেন, কাজেই হাল ছাড়লেন না। তিনি ভাবলেন, মাত্র চার দিনের মধ্যে জীবাণুগুলি হয়তো সবটা বিষ ছেড়ে দেবার সুযোগ পায়নি, আরও সময় দিয়ে দেখা দরকার। সেজন্য তিনি আবার জীবাণুর চাষ ক'রে বিয়াল্লিশ দিন ধ'রে রেখে দিলেন। তারপর পূর্বের সেই যন্ত্রে ছেঁকে জীবাণুমুক্ত ক'রে নিলেন। এবারে এই বিষের

শক্তি দেখে তাঁর নিজেরই অবিশ্বাস্য ব'লে মনে হ'ল। পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, এই দ্রবণের সামান্য এক ফোঁটার ক্রিয়াতেই খরগোশ, গিনিপিগ ইত্যাদি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত এড়াতে পারে না। রুক্স এইভাবে লোয়েফ্‌লারের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য ব'লে প্রমাণ করলেন, ডিফ্‌-থেরিয়ার বিষ আবিষ্কৃত হ'ল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রুক্স এর পর আর পথের সন্ধান পেলেন না; তাই এই জীবাণুর কিংবা এই বিষের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কার করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ল না।

ইতোমধ্যে জার্মেনীতে ককের আর একজন শিষ্য বেহরিং ডিফ্‌থেরিয়ার জীবাণু ধ্বংস করতে পারে এমন একটি রসায়ন-দ্রব্যের সন্ধান ক'রছিলেন। তিনি দলে দলে গিনিপিগের দেহে ডিফ্‌থেরিয়া জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দিতেন, তারপর রুগ্ন মৃতপ্রায় প্রাণীগুলির দেহে নানা প্রকার রসায়ন-দ্রব্যের পরীক্ষা করতেন। যে-সব ওষুধের সাহায্যে পরখ-নলের মধ্যে জীবাণু ধ্বংস করা সম্ভব হ'ত, সেই সব ওষুধের সাহায্যেই জীবদেহে পরীক্ষা চালানো হ'ত, একথা ঠিক, কিন্তু প্রতিবারেই দেখা যেত, ওষুধগুলি জীবাণুর পক্ষে যেমন মারাত্মক, পরীক্ষায় নিযুক্ত জীবগুলির পক্ষেও সেই রকম মারাত্মক। কাজেই ওষুধ হিসেবে তাদের কোন মূল্য নেই। বেহরিং এইভাবে ক্রমাগত নানা ওষুধের পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ লক্ষ্য করলেন যে, আইওডিন ট্রাইক্লোরাইড (iodine trichloride) নামক ওষুধের সাহায্যে দু'একটি প্রাণী কোনক্রমে বেঁচে উঠতে পারে। বেহরিংয়ের হঠাৎ মনে হ'ল—এবারে হয়তো ডিফ্‌থেরিয়ার ওষুধ পাওয়া গেল। প্রাথমিক সাফল্যের আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে তিনি আরও অনেক রুগ্ন গিনিপিগের চিকিৎসা শুরু করলেন, কিন্তু ফলাফল দেখে মোটেই উৎসাহ পেলেন না। দু'একটি প্রাণী কোন প্রকারে বেঁচে ওঠে সত্য, কিন্তু তাদের শরীরে যেখানে আইওডিন ট্রাইক্লোরাইডের ইন্‌জেকশন দেওয়া হয়, সেখানে এতো বিশ্রী

যন্ত্রনাদায়ক ক্ষতের সৃষ্টি হয়. এবং তার জন্য প্রাণীগুলি এতো করুণ আর্তনাদ করতে থাকে যে, দেখে কষ্ট হয়। মনে সন্দেহ হয়, এরকম আরোগ্যের চেয়ে ডিফ্‌থেরিয়ায় মৃত্যুও যেন অধিক কাম্য ছিল। বেহরিং চুপি চুপি দু'একটি রুগ্ন শিশুর উপরও এই নূতন ওষধটির পরীক্ষা চালালেন, কিন্তু ফলাফল অনুসন্ধান ক'রে কোনো আশার আলো দেখতে পেলেন না।

এইভাবে নতুন ওষুধের সাফল্য সম্বন্ধে যখন তিনি আশা-নিরাশার মাঝে দুলছেন, তখন হঠাৎ একদিন আপন মনে প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, এই নতুন ওষুধের সাহায্যে বাঁচানো প্রাণীগুলি কি ডিফ্‌থেরিয়া জীবাণুর পক্ষে অনাক্রম্য (immune) ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে, তাদের দেহে অতিরিক্ত মাত্রায় দুরন্ত ডিফ্‌থেরিয়া জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দেখলেন, তাদের দেহে ব্যাধির কোন লক্ষণ প্রকাশ পেল না। এতে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল যে, বেহরিংয়ের নতুন ওষুধের সাহায্যে রোগমুক্ত জীবগুলি সত্য সত্যই অনাক্রম্য। ইতিপূর্বে পাস্তুর টিকার মূল তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন, কাজেই বেহরিংয়ের মনে হ'ল যে, এইসব রোগমুক্ত প্রাণীর দেহে এমন প্রতিষেধক বস্তু তৈরী হয়েছে, যার ক্রিয়ায় ডিফ্‌থেরিয়া জীবাণুর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, এবং তা সহজেই ধ্বংস হয়ে যায়।

এই সময় বেহরিংয়ের মনে হ'ল, ফরাসী বিজ্ঞানী রুক্‌স তো প্রমাণ করেছেন যে, ডিফ্‌থেরিয়া জীবাণু-নিঃসৃত বিষের ক্রিয়াতেই জীবের মৃত্যু হয়। কাজেই এইসব রোগমুক্ত প্রাণীদের দেহে ডিফ্‌থেরিয়ার বিষ প্রবেশ করিয়ে তার ফলাফল দেখা উচিত। পরীক্ষায় নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল যে, দুরন্ত ডিফ্‌থেরিয়া বিষের সাহায্যেও এইসব অনাক্রম্য প্রাণীর কোনো ক্ষতি করা যায় না। এই অভূতপূর্ব ঘটনা জীবাণু-সন্ধানীদের চমক লাগালো।

বেহরিং বুঝলেন, এইসব রোগমুক্ত প্রাণীর রক্তে নিশ্চয়ই

ডিফ্‌থেরিয়ার বিষ (toxin) ধ্বংস করার উপযোগী প্রতিবিষ (antitoxin) তৈরি হয়েছে। এই প্রতিবিষ পৃথক্ ক'রে তা দিয়ে নানা রকম পরীক্ষা করলেন, এর ফলে তাঁর অনুমান সত্য ব'লে প্রমাণিত হ'ল। এবারে কতকগুলি ভেড়াকে ঐভাবে রোগমুক্ত ক'রে তারপর তাদের রক্ত থেকে সিরাম তৈরি করা হ'ল, তার নাম দেওয়া হ'ল ডিফ্‌থেরিয়া সিরাম। এই ওষুধের প্রাথমিক এবং ঐতিহাসিক পরীক্ষার কথাই প্রথমে বলা হয়েছে।

ডিফ্‌থেরিয়া সিরামের এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে নানা দেশের বিজ্ঞানীরা এর ব্যবহার আরম্ভ করলেন। তিন বছরের মধ্যে প্রায় বিশ হাজার শিশুকে এই সিরামের সাহায্যে চিকিৎসা করা হ'ল। কিন্তু ক্রমে বোঝা গেল, এই সিরামের সাহায্যেও সব রোগীকে ভাল করা সম্ভব হয় না। ক্রমাগত ব্যর্থ হ'য়ে অনেক চিকিৎসকই এর উপর আস্থা হারাতে লাগলেন। এই অবস্থায় বিজ্ঞানী রুক্‌স আবার ডিফ্‌থেরিয়া নিবারণের সমস্যায় মনোনিবেশ করলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ঘোড়াকে অনাক্রম্য করার একটি নতুন এবং খুব সহজ উপায় আবিষ্কার করলেন। আজও তা সকল সভ্য দেশেই প্রচলিত রয়েছে। এই রকম ঘোড়ার দেহ থেকে যে সিরাম পাওয়া গেল, তার পরিমাণও যেমন বেশী, তার শক্তিও তেমনি কল্পনাতীত। এই নতুন সিরামের সাহায্যে তাই ডিফ্‌থেরিয়ার চিকিৎসা অনেক সহজ হয়ে গেল। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের ট্রসো হাসপাতালে ডিফ্‌থেরিয়া রোগে আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে শতকরা ষাট জন মারা যেত, সেখানে এই নতুন সিরামের চিকিৎসায় মৃত্যুর হার দাঁড়াল শতকরা মাত্র ছাব্বিশ জন। দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীরা রুক্‌সের এই আশাতীত সাফল্যের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানালেন।

টিকার সঙ্গে সিরামের পার্থক্য এই যে, টিকার বেলায়

মানুষের দেহে নিস্তেজ জীবাণু প্রবেশ করিয়ে রোগ প্রতিষেধক শক্তি সৃষ্টি করা হয়, কিন্তু এর বেলায় ঘোড়ার দেহে পর পর ক্রমাগত উর্ধ্ব মাত্রায় জীবাণু প্রবেশ করিয়ে তার রক্তে প্রতিবিষ জন্মানো হয়, এবং পরে সেই রক্ত থেকে সিরাম পৃথক্ ক'রে তাই ওষুধ হিসেবে ব্যাবহার করা হয়। সিরাম খুব শক্তিশালী ব'লে তার কাজ খুব দ্রুত হয় সত্যি, কিন্তু টিকার মতো সে ফল দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

বিজ্ঞানীদের শাসনদণ্ডের কাছে এইভাবে দুরন্ত ডিফ্‌থেরিয়া জীবাণুও শেষ পর্যন্ত বশ মেনেছে। এখন আমরা জানি যে, রোগের প্রথম অবস্থায় ধরা পড়লে, রুগ্ন শিশুকে বাঁচানো মোটেই অসম্ভব নয় (অবশ্য রোগ ধরা পডতে যত দেরী হবে শিশুকে বাঁচানো তত কঠিন হবে)। কিন্তু আজ থেকে মাত্র সত্তর-আশি বছর আগেও রুগ্ন শিশুর হতভাগ্য পিতামাতা সব কিছু অদৃষ্টের উপর ছেড়ে দিয়ে চরম দুঃসংবাদের প্রতীক্ষায় দিন গুণত। লোয়েফ্‌লার, রুক্‌স, বেহরিং এবং তাঁদের নাম-না-জানা যে-সব সহকর্মীর সম্মিলিত চেষ্টায় এই মহদুপকারী সিরাম চিকিৎসার প্রবর্তন হয়েছে, তাঁরা সবাই আমাদের নমস্য।

রোগ প্রতিরোধে শাসক-বস্তুর ব্যবহার

ইলাই মেচ্‌নিকফ (Elie Metchnikoff) (১৮৪৫-১৯১৬) ছিলেন ইহুদি, জন্ম দক্ষিণ রাশিয়ায় ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। প্রায় সাতাশ বৎসর বয়সে ওডেসা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পাস্তুর এবং ককের চমকপ্রদ আবিষ্কারে অনুপ্রাণিত হ'য়ে তিনি এখানে গবেষণা শুরু করেন। তারপর অনেকদিনের অনেক কষ্টসাধ্য গবেষণার ফলস্বরূপ প্রচার করেন যে, আমরা সব সময় শত শত জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হই, কিন্তু তা সত্ত্বেও অসুস্থ হই না প্রধানতঃ দু'টি কারণে—(১) আমাদের দেহের রোগপ্রতিরোধক শক্তি, অর্থাৎ অনাক্রম্যতা, আমাদের রক্ষা করে, এবং (২) আমাদের দেহের রক্তের সাদা কণিকা (ফ্যাগোসাইট) এই সব রোগ জীবাণুকে খেয়ে ফেলে, অথবা তাদের আক্রমণ ক'রে ধ্বংস ক'রে দেয়।

তাঁর গষেণায় আকৃষ্ট হয়ে পাস্তুর তাঁকে ফ্রান্সের পাস্তুর ইন্‌স্টিটিউটে যোগদানের জন্যে আহ্বান জানালেন। আর তিনিও এই আহ্বানে সানন্দে সাড়া দিলেন। এখানেই তাঁর এক নূতন কর্মবহুল জীবনের সূচনা হ'ল।

তখন মেচ্‌নিকফের ফ্যাগোসাইট সম্পর্কিত মতবাদ নিয়ে ইউরোপের বিজ্ঞানী মহলে তীব্র বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই মেচ্‌নিকেফ এখানে এসেই তাঁর এই মতবাদ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে শত শত পরীক্ষা ক'রে সেইসব বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করতে লাগলেন।

প্রথম দিকে এসম্পর্কে অনেকের মনেই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, কিন্তু মেচ্‌নিকফের অসংখ্য পরীক্ষার সামনে এবং তাঁর অকাট্য যুক্তিজালে তারা অভিভূত হ'য়ে গেল, এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর এই মতবাদ তারা মেনে নিতে বাধ্য হ'ল। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর

শেষ ভাগে বহু মেডেল এবং পুরস্কার দিয়ে এই অক্লান্ত কর্মীকে সম্মানিত করা হয়।

এরপর মেচ্‌নিফকের জীবনে শুরু হ'ল এক নূতন অধ্যায়। সেই সম্পর্কেই এখন ব'লব।

পাস্তুর এবং ককের চমকপ্রদ গববষণার ফলে ইতোমধ্যে আমাদের অদৃশ্য শত্রু অনেকরকম জীবাণুর কথা জানা গেল। ক্রমে যক্ষ্মা রোগের জীবাণু টিউবার্কল ব্যাক্‌টিরিয়া (সংক্ষিপ্ত নাম টি. বি.) সম্পর্কেও অনেক কথা জানা গেল। নানারকম পরীক্ষার ফলে বোঝা গেল, অন্যান্য জীবাণুর তুলনায় টি. বি.-র প্রতিরোধ শক্তি অত্যন্ত প্রবল। জলের মধ্যে এই জীবাণু কয়েক সপ্তাহ পরেও জীবিত থাকে। রোগীর থুথু শুকিয়ে রাখলে, কয়েক মাস পরেও তার জীবাণু সক্রিয় থাকে (শুকনো থুথু থেকে দশ মাস পরেও মারাত্মক জীবাণু পাওয়া গেছে), শুকনো অবস্থায় ফুটন্ত জলের উষ্ণতায় (১০০° সেন্টিগ্রেড) কুড়ি মিনিট রেখে দিলেও এ জীবাণু মরে না। এমন কি শতকরা তিন ভাগ সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে রেখে দিয়েও একে ধ্বংস করা যায় না। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে জানা গেল, এই জীবাণুর এরকম অসাধারণ প্রতিরোধ শক্তির প্রধান কারণ—এর দেহের চারিদিকে রয়েছে একটি মোমের মতো আবরণ। এই আবরণই এই
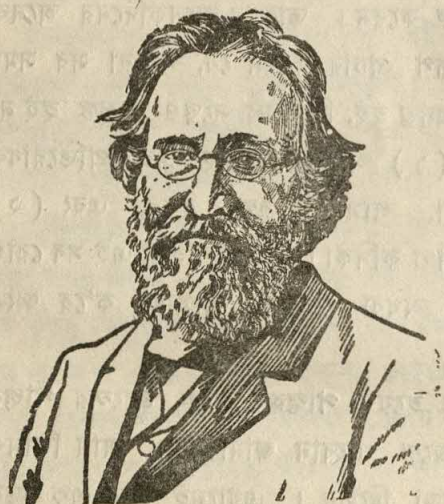
চিত্র ১৬। ইলাই মেচ্‌নিফফ্‌

জীবাণুকে উত্তাপ ও নানাপ্রকরে রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়া থেকে রক্ষা ক'রছে। প্রকৃতির দেওয়া এই অদ্ভুত আবরণ থাকাতে এই জীবাণু সহজেই আত্মরক্ষা ক'রতে। রোগীর কোন অনিষ্ট না ক'রে মোমের আবরণ ভেদ ক'রে জীবাণুকে ধ্বংস ক'রবে এমন কোন রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান তখন পর্যন্ত কারও জানা ছিল না।

মেচ্‌নিকফ তখন এই ধরনের নানা সমস্যা নিয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। একদিন তাঁর সহকর্মী মেটাল্‌নিকফকে ডেকে বুঝিয়ে দিলেন যে, যক্ষারোগের চিকিৎসায় সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান কাজ হবে এই জীবাণুর মোমের খোলস ধ্বংস ক'রতে পারে এমন একটা ওষুধ আবিষ্কার করা। তাঁর ধারনা ছিল যে, মোমের খোলসটা ধ্বংস ক'রে দিলে আবরণহীন জীবাণু কিছুতেই আত্মরক্ষা ক'রতে পারবে না। মোম খেয়ে হজম ক'রতে পারে এমন একটা ক্ষুদ্র জীবের সন্ধান পেলে হয়তো এই সমস্যার সমাধান করা যাবে, এই মনে ক'রে মেটাল্‌নিকফ একটি কাল্পনিক জীবের সন্ধান ক'রতে লাগলেন। ক্রমাগত ব্যর্থ হ'য়ে তিনি যখন এমন জীবের অস্তিত্ব সম্পর্কেই সন্দিহান হ'য়ে উঠেছেন, এমন সময় একদিন হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল,—মৌমাছি—মৌচাক—মোম। মৌচাকেই হয়তো এই এই কাল্পনিক জীবের সন্ধান পাওয়া যাবে।

সেই থেকে তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে একটার পর একটা মৌচাকে সন্ধান ক'রে বেড়াতে লাগলেন। দীর্ঘদিন অক্লান্ত সাধনার পর তিনি দেখলেন, গ্যালেরিয়া মেলো-নেলা (Galleria mello-nella) নামক মথের শুঁয়োপোকা মৌচাকে বাসা বাঁধে এবং মধু ও মোম খেয়ে বেঁচে থাকে। এই জীবটির যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য ক্রমাগত তিন বছর ধ'রে তিনি এর দেহগঠন ও জীবনবৃত্তান্ত প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ ক'রলেন। এর ফলে নিশ্চিত বোঝা গেল যে, এই শুঁয়োপোকার পাকস্থলীর পাচক-রসে মোম অতি সহজেই জীর্ণ হয়।

এতদিনে মেচ্‌নিকফের মতবাদ পরীক্ষা ক'রে দেখার সুযোগ হ'ল। মেটাল্‌নিকফ সতেজ যক্ষ্মা-জীবাণু নিয়ে এই শুঁয়োপোকার পাকস্থলীর রসে ডুবিয়ে দিলেন এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে প্রত্যক্ষ ক'রলেন এক অপূর্ব দৃশ্য। পাচক-রসের ক্রিয়ায় মোমের খোলসটা ধীরে ধীরে জীর্ণ হ'য়ে গেল, ঠিক যেমন রৌদ্রতাপে বরফ গলে যায়। খোলস হারিয়ে জীবাণু অসহায় হ'য়ে পড়ল এবং অচিরেই ধ্বংস হ'য়ে গেল। বার বার পরীক্ষা ক'রেও একই ফল পাওয়া গেল। প্রাথমিক পরীক্ষায় উৎসাহিত হ'য়ে মেটাল্‌নিকফ দশ-বারটি শুঁয়োপোকার দেহ থেকে পাচক-রস বের ক'রে একটি পরখ-নলে নিয়ে তাতে অনেকগুলো সতেজ জীবাণু ছেড়ে দিলেন। এবারেও সেই একই ফল, রোগ-জীবাণুর মোমের আবরণ খসা এবং তার ধ্বংস। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে যক্ষ্মারোগের চিকিৎসায় এই হ'ল প্রথম কার্যকরী ওষুধ। এর আগে এমন রোমাঞ্চকর সফল আবিষ্কার খুব কমই হয়েছে। সমগ্র পাস্তুর ইন্‌স্টিটিউটে সাড়া পড়ে গেল। আর এই আবিষ্কারে সবচেয়ে খুশি হ'লেন বিজ্ঞানী মেচ্‌নিকফ, কারণ এতে তাঁর মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। অদূর ভবিষ্যতেই যে যক্ষ্মার মতো দুরারোগ্য ব্যাধিরও সুচিকিৎসা সম্ভবপর হবে, এ বিশ্বাস আরও দৃঢ় হ'ল।

নব আবিষ্কারের আনন্দোচ্ছ্বাস খানিকটা প্রশমিত হ'লে, মেটাল্‌নিকফ বাস্তবক্ষেত্রে এই ওষুধের কার্যকারিতা পরীক্ষা ক'রতে মনোযোগী হ'লেন। এবার কিন্তু নিরুৎসাহ হ'তে হ'ল তাঁকে।

তাঁর চিকিৎসায় রোগগ্রস্ত গিনিপিগ অচিরেই রোগমুক্ত হ'ল সত্য, কিন্তু সামান্য একটা গিনিপিগকে নীরোগ ক'রতে কয়েক হাজার শুঁয়োপোকার দেহ-নিঃসৃত পাচক-রস নিঃশেষিত হ'ল! একটা মানুষ একটা গিনিপিগের চেয়ে কয়েকশ' গুণ ভারি কাজেই একটি মাত্র রোগীকে সুস্থ ক'রে তুলতে কয়েক লক্ষ শুঁয়োপোকার দরকার হবে। এতগুলো পোকা লালন-পালন ক'রে তাদের দেহ

থেকে এই মূল্যবান ওষুধ বের করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার! তাছাড়া একটি-দু'টি রোগীকে হয়তো এভাবে রোগমুক্ত করা যাবে, কিন্তু তাতে সমগ্র মানব সমাজের উপকার হবে কতটুকু? এইসব কথা ভেবে এবং নানারকম হিসেব-নিকেশ ক'রে মেটাল্‌নিকফ এতদূর নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়লেন যে, যক্ষ্মারোগগ্রস্ত কোন মানুষের উপর এই মূল্যবান ওষুধটির কার্যকারিতা পরীক্ষা ক'রে দেখারও প্রয়োজন বোধ করলেন না। এমন একটি মূল্যবান ও চমকপ্রদ আবিষ্কার শেষ পর্যন্ত মানুষের কোন উপকারেই এল না। কিন্তু এ থেকে এক বিস্ময়কর নূতন তথ্য জানা গেল। সবাই বুঝতে পারলেন যে, একটি ক্ষুদ্র জীবের সহায়তায় যক্ষ্মার মতো মারাত্মক রোগের জীবাণুও অনায়াসে ধ্বংস করা সম্ভব। এইভাবে মেচ্‌নিকফ এবং তাঁর সুযোগ্য শিষ্য মেটাল্‌নিকফ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে এক বিস্ময়কর নূতন রাজ্যের সিংহদ্বারে গিয়ে উপনীত হ'লেন।

এই সময় গবেষণা ক'রতে ক'রতে মেচ্‌নিকফ হঠাৎ একদিন চিন্তা ক'রলেন, আচ্ছা, আমাদের চারদিকে সব সময় অসংখ্য জীবাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে, এরা স্বাভাবিকভাবে বংশ-বিস্তার করার সুযোগ পেলে অল্প সময়ের মধ্যেই তো সমস্ত পৃথিবীটা ছেয়ে ফেলত! আর তাদের আক্রমণে মানুষ একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেত। অথচ সেরূপ হয় না কেন? তাঁর মনে হ'ল, এরা প্রতি পদে শত শত শত্রুরূপী জীবাণুর সম্মুখীন হয়, তাই এরা হয়তো সেরূপ বংশ-বিস্তার ক'রতে পারে না। এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য ব'লতে হবে।

মেচ্‌নিকফ ছিলেন ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের একজন উগ্র সমর্থক। তাই তাঁরই সঙ্গে সুর মিলিয়ে তিনি ব'ললেন, জীবজগতে যেমন বেঁচে থাকার জন্য অবিরত জীবন-সংগ্রাম চলছে, জীবাণুরাও তেমনি সুযোগ পেলেই একে অপরকে আক্রমণ ক'রে ধ্বংস করার চেষ্টা ক'রছে; আর তার ফলে, যোগ্যতমই পাচ্ছে বেঁচে থাকার অধিকার (Survival of the fittest)।

এই ধারণার বশবর্তী হ'য়ে মেচ্নিকফ এবং তাঁর সহকর্মীগণ মানুষের পক্ষে উপকারী এইসব জীবাণুর সন্ধান ক'রতে লাগলেন। কারণ তাঁদের মনে হ'ল, এদের দিয়ে হয়তো মানুষের অদৃশ্য শত্রু রোগ-জীবাণুদের ধ্বংস করা সম্ভব হবে। অনুসন্ধানের ফলে মানুষের অন্ত্রে 'ল্যাক্টোব্যসিলাস অ্যাসিডোফাইলাস' (Lactobacillus acidophillus—এরই ক্রিয়ায় দুধ থেকে দই উৎপন্ন হয়) জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেল। মানুষ সুস্থ থাকা অবস্থায়, বহিরাগত অনেক রোগ-জীবাণু এরই ক্রিয়ায় নষ্ট হ'য়ে যায়। কিন্তু মানুষ অসুস্থ হ'লে, বিশেষতঃ আমাশয়, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হ'লে এই মিত্ররূপী জীবাণুদের সংখ্যা খুবই কমে যায়। আরও প্রমাণ হ'ল যে, প্রকৃতপক্ষে এই জীবাণুর ক্রিয়ায় অন্ত্রের মধ্যে শ্বেতসার বা শর্করাজাতীয় খাদ্য থেকে ল্যাক্টিক অ্যাসিড তৈরি হয়, আর তারই সংস্পর্শে অনেক রোগ-জীবাণু ধ্বংস হ'য়ে যায়। একেই আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের অ্যান্টিবায়োটিক (antibiotic) বা শাসক-বস্তু আবিষ্কারের গোড়ার কথা বলা চলে। আর এই আবিষ্কারের পথিকৃৎ হ'লেন বিজ্ঞানী মেচ্মিকফ। এজন্য ১৯০৮ সালের শারীরবৃত্ত ও চিকিৎসাবিদ্যার নোবেল পুরস্কার দিয়ে বিজ্ঞানীকে সম্মানিত করা হয়।

এরপর ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন বিজ্ঞানী ফ্রস্ট প্রমাণ করেন যে, ভূমিবাসী অনেক জীবাণু অনেক রকম রোগ-জীবাণু ধ্বংস ক'রতে পারে। তাঁর মতে এজন্যই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সারাদিন ধুলো-মাটি নিয়ে খেলা করলেও প্রায়শঃ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয় না। বৃটিশ জীবাণুবিদ্ টর্‌জ-ও এর অনেক প্রমাণ দেন।

আমরা সাধারণতঃ দেখতে পাই, পশুদের দেহে কোথাও কেটে গেলে তারা বার বার ক্ষতস্থান চাটতে থাকে। এর ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘা বিষাক্ত হয় না। মানুষের মধ্যেও অনেকেরই অভ্যাস আছে, কোথাও কেটে গেলে তারা ক্ষতস্থানে থুথুর প্রলেপ দিয়ে

রাখে। কারণ অভিজ্ঞতার ফলে তারা জানতে পেরেছে যে, এর ফলে ঘা বিষাক্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকখানি কমে যায়। এই ধারণা যে সত্য তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেন প্রখ্যাত বৃটিশ জীবাণুবিদ্ আলেক্জাণ্ডার ফ্লেমিং, ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। নানাপ্রকার পরীক্ষার সাহায্যে তিনি প্রমাণ করেন যে, মানুষের চোখের জলে এবং লালাতে লাইসোজাইম নামক জীবাণু-নাশক একটি পদার্থ আছে। এতে চিকিৎসা-জগতে একটি নূতন পথের সন্ধান পাওয়া গেল। নানা স্থানে নানাভাবে গবেষণা চলতে লাগল। আর এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী সাফল্য অর্জন ক'রলেন বিজ্ঞানী ফ্লেমিং নিজেই। সে এক নূতন কাহিনী।

১৯২৮ সালের কথা। আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং (Alexander Fleming) এ সময়ে লণ্ডনের সেণ্ট মেরী হাসপাতালে গবেষণার কাজে লিপ্ত ছিলেন। কোন একটি পরীক্ষার জন্যে তিনি একটি কাচের চ্যাপ্টা বাটিতে জেলি-জাতীয় আগার-মাধ্যমে স্ট্যাফাই-লোকক্কাস রোগ-জীবাণু বপন ক'রে অপেক্ষাকৃত চওড়া অনুরূপ আর একটি বাটি দিয়ে ঢেকে রাখলেন (এই ডিসগুলিকে সাধারণতঃ পেট্রি-ডিস বলা হয়)। কয়েকদিন পরে তিনি লক্ষ্য ক'রলেন যে, ঐ পাত্রে শুধু যে

চিত্র ১৭। আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং।

ঐ রোগ-জীবাণু জন্মেছে তা নয়, সবুজ রঙের অন্য একটি নূতন ছত্রাকও আগার-মাধ্যমে উপনিবেশ স্থাপন ক'রেছে। সম্ভবতঃ অসাবধানতার ফলে বাতাস থেকে কোন ছত্রাক-বীজ আগার মাধ্যমে ঢুকে পড়েছে। কৌতূহলী বিজ্ঞানী আরও লক্ষ্য

ক'রলেন যে, সবুজ রঙের ঐ ছত্রাকের উপনিবেশকে ঘিরে রয়েছে একটি চক্রাকার স্বচ্ছ বেষ্টনী। আর সেই স্বচ্ছ বেষ্টনীর মধ্যস্থিত মারাত্মক রোগ-জীবাণুর বৃদ্ধি যেন মন্ত্রের বলে বন্ধ হ'য়ে গেছে।
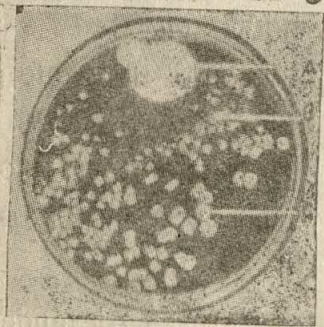
চিত্র ১৮। আলেকজাণ্ডারফ্লেমিং-এর ঐতিহাসিক পরীক্ষা—কাল্‌চার প্লেটে দেখা যাচ্ছে, দৈবাৎ আবির্ভূত পেনিসিলিয়াম-কলোনির নিকটবর্তী অঞ্চলে স্ট্যাফাইলোকক্কাসের কলোনি বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। A. পেনিসিলিয়াম কলোনি, B. ধ্বংসোন্মুখ স্ট্যাফাইলোকক্কাস-কলোনি, C. স্বাভাবিক স্ট্যাফাইলোকক্কাস-কলোনি।

সম্ভবতঃঐ ছত্রাকের দেহ-নিঃসৃত কোন পদার্থের ক্রিয়াতেই এরূপ হয়েছে, এই তাঁর মনে হ'ল। তাই ফ্লেমিং অত্যন্ত সাবধানে এই ছত্রাকটি তুলে নিয়ে তার বংশবৃদ্ধি ক'রলেন এবং নির্ণয় ক'রলেন যে, এ হ'ল পেনিসিলিয়াম গোষ্ঠীর ছত্রাক, এর নাম পেনিসিলিয়ান নোটেটাম (*Penecillium notatum*)। নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে তিনি এও প্রমাণ ক'রলেন যে, এই ছত্রাক বংশবৃদ্ধির সময় তার দেহ থেকে এমন একটি পদার্থ নিঃসরণ করে যা স্ট্যাফাই লোকক্কাস জাতীয়রোগ-জীবাণুর বৃদ্ধি দমন ক'রতে পারে। উপরিউক্ত ছত্রাকের দেহ-নিঃসৃত রস থেকে তিনি হলদে রঙের একটি বস্তু পৃথক ক'রলেন এবং তার নাম দিলেন পেনিসিলিন (Penicillin)। পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, এর কক্কাস-জাতীয় জীবাণু ধ্বংস করার ক্ষমতা অসীম। তারপর সুস্থ প্রাণীর দেহে একে প্রয়োগ ক'রে দেখলেন যে, এর বিষক্রিয়া নেই বললেই চলে। এতে তাঁর মনে আশা হ'ল, এই আবিষ্কার হয়তো চিকিৎসার কাজে লাগানো যাবে। কিন্তু ফ্লেমিং ছিলেন জীবাণুবিদ্। এ থেকে বিশুদ্ধ পদার্থটি পৃথক করার জন্য একজন জৈব রসায়নবিদের যে

অভিজ্ঞতা এবং কুশলতার প্রয়োজন ছিল তা তাঁর ছিল না। তাই তাঁর পক্ষে এই পদার্থ টি আরও ঘনীভূত অথবা বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রস্তুত করা সম্ভব হ'ল না। আবার রোগীদের চিকিৎসায় ওষুধটি প্রয়োগ করা সম্পর্কে ডাক্তারদের মতো বিস্তারিত পরীক্ষা করার সুযোগ-সুবিধাও তাঁর ছিল না, তাই তিনি তা ক'রতে পারেন নি। এজন্য তাঁর এই চমকপ্রদ আবিষ্কারটি তখনকার মতো শুধু কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হ'য়ে রইল। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য,—"Penicillin while it was very active against some bacteria, has no injurious effect on leucocytes. In this it was unique, and it was this property which suggested its possibilities as a therapeutic agent. But penicillin was an unstable substance. Its activity disappeared in a few days or a week, according to the conditions in which it was kept, and it was not known how it could be sterilised." তবে ফ্লেমিং একেবারে হাল ছাড়লেন না। তিনি জীবাণুর মিশ্রণ থেকে কতকগুলি জীবাণু নষ্ট ক'রে এবং অন্যগুলিকে বিশোধিত ক'রে তাদের বীজ সযত্নে সংরক্ষণ ক'রে রাখলেন ভবিষ্যতের জন্য।
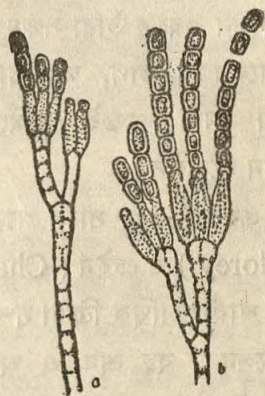
চিত্র ১৯। পেনিসিলিয়াম ছত্রাক (বিবর্ধিত)।

১৯৩২ সালে অক্সফোর্ডের দুই জীবাণুবিদ্ ক্লাটারবাক (Clutterbuck) ও লোভেল (Lovell) এবং ছত্রাক-রসায়নবিদ্

রাইস্ট্রিক (Raistrick) লবণ ও গ্লুকোজ মিশ্রিত পোষক-মাধ্যম থেকে বিশুদ্ধ পেনিসিলিন তৈরি করার কাজে মনোযোগী হলেন। অম্লীয় ইথারের সাহায্যে ঐ পোষক-মাধ্যম থেকে পেনিসিলিন নিষ্কাশন করতে তাঁরা সক্ষম হলেন। কিন্তু অচিরেই তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, তাপ, ক্ষার বা অম্লের আধিক্যে এ-বস্তু সহজেই বিনষ্ট হয়। আর এজন্যই ফ্লেমিংয়ের পক্ষে এ-জিনিস উদ্ধার করা এতো কঠিন হয়েছিল।

এরপর ১৯৩৮ সালে অক্সফোর্ডেরই দু'জন জীব-রসায়নবিদ্ ফ্লোরি (Florey) ও চেইন (Chain) এই বস্তুটির রাসায়নিক প্রকৃতি এবং শারীরতাত্ত্বিক ক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণায় মনোনিবেশ ক'রলেন। বহু শ্রম ও অর্থ ব্যয়ের পরে ১৯৪০ সালে তাঁরা খনিকটা ব্রাউন রঙের গুঁড়ো প্রস্তুত ক'রতে সক্ষম হলেন। তারপর গবেষণাগারে ইঁদুরের উপরে পরীক্ষা ক'রে তাঁরা নিশ্চিত বুঝলেন যে, এই পেনিসিলিন স্ট্রেপ্টোকক্কাস এবং স্ট্যাফাইলোকক্কাস জাতীয় জীবাণুর সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে, কিন্তু ঐ প্রাণীটির দেহে কোনরূপ বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে না। অর্থাৎ, ওষুধটি বেশ নিরাপদ। তাঁরা এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত পরীক্ষা ক'রে নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করলেন যে, এই ওষুধের ব্যবহারে সেপ্টিসিমিয়া, নিউমোনিয়া প্রভৃতি মারাত্মক অথচ দুরারোগ্য ব্যাধির বেলাতে মন্ত্রের মতো কাজ হয়, অথচ এর বিষক্রিয়া নেই। নিশ্চিত বোঝা গেল যে, এ একটি বিস্ময়কর ওষুধ। এর ফলে বিজ্ঞান জগতে একটা দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি হ'ল, আর অল্পদিনের মধ্যেই পৃথিবীর সর্বত্র এই নূতন শাসক-বস্তুর সাহায্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রচলিত হ'ল ; আর সেই থেকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নূতন দিগন্তের দ্বার খুলে গেল। এজন্য ১৯৪৫ সালে ফ্লেমিং, ফ্লোরি এবং চেইন—এই তিন জনকেই সম্মিলিত ভাবে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

প্রথম দিকে সমস্যা ছিল, কি ক'রে এই ওষুধটি অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করা যায়। কারণ, তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ একেবারে তুঙ্গে, চতুর্দিকে যুদ্ধের দামামা বাজছে। এ বিষয়ে ইংল্যাণ্ডে কিছু করা সম্ভবও নয়। এজন্য ফ্লোরি তাঁর অর্জিত জ্ঞান এবং গবেষণার কাগজ-পত্রসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান, এবং সেইখানেই এর প্রচুর প্রস্তুতির ব্যবস্থা করেন। তার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই এই অত্যাশ্চর্য ওষুধটি বিক্রির ব্যবস্থা করা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ওষুধটি পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত হ'ল। চিকিৎসা জগতে এলো যুগান্তর।

পেনিসিলিনের মতো শক্তিশালী ওষুধও কিন্তু কয়েকটি মারাত্মক রোগের ক্ষেত্রে কার্যকরী হ'ল না কাজেই নানাদেশের বিজ্ঞানীরা আরও নূতন নূতন শাসক-বস্তুর সন্ধানে মেতে গেলেন। ইতোমধ্যে মর্কিন বিজ্ঞানী ওয়াক্সম্যান (Waksman) ও তাঁর সহকর্মীগণ লক্ষ্য ক'রেছেন যে, অনেক রোগ-জীবাণু মাটিতে পড়লে আর বংশ বিস্তার ক'রতে পারে না, বরং অল্প সময়ের মধ্যেই একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায় (ধনুষ্টংকার, গ্যাস গ্যাংগ্রিণ প্রভৃতি রোগের জীবাণু অবশ্য এভাবে সহজে বিনষ্ট নষ্ট হয় না)। এজন্য তাঁদের বিশ্বাস হয় যে, মাটিতে নিশ্চয়ই এমন জিনিস আছে যার ক্রিয়াতে এ-সব রোগ-জীবাণু অতি সহজেই নষ্ট হ'য়ে যায়। তাঁদের পরীক্ষায় প্রমাণিত হ'ল যে, মাটিতে অনেক রকম জীবাণু আছে, আর এদের দেহ-নিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শেই রোগ-জীবাণু ধ্বংস হ'য়ে যায়। তাঁরা গবেষণাগারে এক-একপ্রকার ভূমিবাসী জীবাণুর চাষ করেন এবং এবং তার দেহ-নিঃসৃত শাসক-বস্তু পৃথক্ ক'রে বিভিন্ন প্রকারের রোগের চিকিৎসায় তার কার্যকারিতা পরীক্ষা ক'রে দেখেন। সুদীর্ঘ ২৮ বছরের অক্লান্ত সাধনার ফলে ১৯৪৪ সালে, ওয়াক্সম্যান স্ট্রেপটো-মাইসিস গ্রেসিয়াস (*Streptomycis Gresius*) নামক এক প্রকার জীবাণুর কালচার (বা, চাষ) ক'রে, তা থেকে পেনিসিলিনের মতোই আর একটি শক্তিশালী ওষুধ স্ট্রেপ্টোমাইসিন, আবিষ্কার

ক'রতে সক্ষম হলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বোঝা গেল, এরও রোগ-জীবাণু নষ্ট করার শক্তি খুব বেশী, অথচ বিষক্রিয়া নেই বললেই চলে। যেসব রোগে পেনিসিলিন কার্যকরী হয়নি, তাদের নিয়ে পরীক্ষা ক'রে আশাতিরিক্ত সুফল পাওয়া গেল। নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল যে, এই নূতন ওষুধের সাহায্যে দুরারোগ্য যক্ষা রোগীকেও সম্পূর্ণ রোগমুক্ত করা সম্ভব।

ইতিপূর্বে যক্ষারোগে আক্রান্ত হ'লে হতভাগ্য রোগী সুদীর্ঘকাল ধ'রে রোগযন্ত্রণা ভোগ ক'রে, সমগ্র পরিবারকে সর্বস্বান্ত ক'রে এবং সমাজ-জীবনকে বিপন্ন ক'রে, নিশ্চিত মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলতো। কিন্তু স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন আবিষ্কৃত হওয়ায় এখন মারাত্মক যক্ষা-রোগীরও সুচিকিৎসা সম্ভবপর হয়েছে। তাই এখন অনেকেই সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হ'য়ে আবার মানুষের মতো বেঁচে থাকবার এবং সুস্থ নাগরিক জীবন যাপন করার সুযোগ পাচ্ছে। আর তার ফলে কত পরিবারে আবার সুখ-শান্তি ফিরে আসছে। শান্তির নীড় আবার সকলের হাসি-আনন্দে মুখরিত হ'য়ে উঠছে। আশা করা যায়, স্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের সাহায্যে চিকিৎসা চালিয়ে পৃথিবীর সকল সভ্যদেশ থেকেই এই রোগের জীবাণু একেবারে নির্মূল ক'রে ফেলা যাবে। অনেকেই মনে করেন, পেনিসিলিন আবিষ্কৃত না হ'লে এই ওষুধটাই সবচেয়ে শক্তিশালী ও উপকারী ওষুধ ব'লে পরিগণিত হ'ত। স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন আবিষ্কৃত হওয়ায় মানব সমাজের যে অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়েছে, তারই স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৫২ সালে শারীরবৃত্ত ও চিকিৎসাবিদ্যার নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞানী ওয়াক্সম্যানকে।

পেনিসিলিন ও স্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের সাফল্য লক্ষ্য ক'রে নানা-দেশে আরও নূতন নূতন শাসক-বস্তু আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে জোর অনুসন্ধান চলতে থাকে। এর ফলে আজ অবধি শতাধিক শাসক-বস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু বিষক্রিয়া থাকায় কিংবা অন্যান্য

দোষ থাকায়, এদের অধিকাংশই বর্জিত হয়েছে। পেনিসিলিন এবং স্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের পরে আর যেগুলো মহদুপকারী ওষুধ ব'লে সর্বত্র সমাদৃত হয়েছে, তাদের মধ্যে ক্লোরোমাইসিটিন, অরিওমাইসিন, টেরামাইসিন, টেট্রাসাইক্লিন, প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আশা করা যায় যে, এরূপ শাসক-বস্তুর সাহায্যে চিকিৎসা ক'রে পৃথিবীর সকল সভ্যদেশ থেকেই নানাপ্রকার জীবাণুজনিত ব্যাধির প্রসার অনেক কমিয়ে ফেলা সম্ভব হবে।

রস্ বনাম গ্র্যাসী—কে বড়?

ভাপসা জলার আশেপাশে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ বেশী দেখা যেত। তাই লোকে ভাবতো, দূষিত বায়ুর জন্যই ম্যালেরিয়া হয়। একজন ইটালিয়ান, তাঁর নাম হ'ল টার্টি, এই রোগের নাম দেন ম্যালেরিয়া। কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'ল মন্দ বাতাস (Mal aire)।

আগে ভারতে, বিশেষ ক'রে বাংলাদেশে, ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ ছিল খুবই বেশী। তখন এদেশে ম্যালেরিয়া রোগে যত বেশী লোক মরতো, অন্য কোন রোগে বোধ করি তত মরতো না। বাংলার এক-একটা বর্ধিষ্ণু গ্রাম যে এই রোগে একেবারে জনশূন্য হয়ে গেছে, অতীতের বড় বড় ভাঙা দালান-কোঠা দেখলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইটালীতেও বহুকাল ধ'রে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল অত্যন্ত বেশী। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে এবং খ্রীষ্টের মৃত্যুর পর ষষ্ঠ, সপ্তম, একাদশ, দ্বাদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইটালীতে ম্যালেরিয়ার মড়ক লেগেছিল বলে জানা গেছে। প্রাচীনকালে গ্রীস, ম্যাসিডোনিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশেও যে ম্যালেরিয়ার প্রচণ্ড প্রকোপ ছিল তারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সভ্য মানুষ প্রায় তিন হাজার বছর ধরে ম্যালেরিয়ায় ভুগছে। এই রোগ নিবারণের জন্যে চেষ্টার কোন ত্রুটি হয় নি, কিন্তু দুঃখের বিষয় ম্যালেরিয়ার উপদ্রব আজও খুব কমেনি। এখনও সারা পৃথিবীতে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। প্রতি বছর প্রায় আশি কোটি লোক এই রোগে ভোগে এবং মারা যায় প্রায় তিরিশ লক্ষের মতো। পশ্চিম বাংলায় ম্যালেরিয়া একেবারে নির্মূল হয়েছে, একথা এখনও বলা চলে না। ১৯৪৬ সালে মারা যায় ১,০৩৩৩৯ জন, আর ১৯৫৭ সালে ৮২,৫৩৯ জন। ম্যালেরিয়া

উচ্ছেদ করবার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজকোষ থেকে প্রতি বছর প্রায় বিশ হাজার কোটি টাকা খরচ করা হয়। তবুও সে দেশের সতেরটি রাজ্য থেকে আজও ম্যালেরিয়া একেবারে উচ্ছেদ করা সম্ভব হয় নি। কাজেই এই রোগ যে সভ্য সমাজের একটি দারুণ অভিশাপ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর এই অভিশাপ থেকে যাতে সভ্য সমাজকে মুক্ত করা যায়, তার জন্য বিজ্ঞানীদের সাধনারও অন্ত নেই। নানাদেশের বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত সাধনার ফলে ধীরে ধীরে ম্যালেরিয়া রোগের অনেক রহস্যই উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং তার ফলে এই রোগের প্রকোপ এখন আগের চেয়ে অনেকখানি কমানো গেছে। কি ভাবে সেটা সম্ভব হয়েছে, তাই এখানে বলবো।

১৮৮০ সালের ৬ই নভেম্বরের ঘটনা। ফরাসী ডাক্তার চার্লস লুই আল্‌ফন্‌স্ লাভেরাঁ (Charles Louis Alphanse Laveran) (১৮৪৫—১৯২২) অ্যাল্‌জেরিয়ার কন্‌স্টান্‌টিন শহরে থাকাকালে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সর্বপ্রথম ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তে একরকম প্রোটোজোয়া দেখতে পান। তিনি এর নাম দেন প্লাস্‌মোডিয়াম, এবং বলেন, প্লাস্‌মোডিয়ামই হ'ল ম্যালেরিয়া রোগের প্রধান কারণ। এই উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের জন্য ১৯০৭ সালে লাভেরাঁকে শারীরবৃত্ত এবং চিকিৎসাবিদ্যার নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এর পর বিভিন্ন জাতের ম্যালেরিয়ায় বিভিন্ন রকম প্লাস্‌মোডিয়াম আবিষ্কৃত হয়।

পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল, প্লাস্‌মোডিয়াম এক-জাতের অতি ক্ষুদ্র এককোষী প্রাণী। এরা রক্তের লাল কণিকায় বাসা বাঁধে এবং তাদের একেবারে ধ্বংস ক'রে দেয়। এইভাবে রক্তের লাল কণিকা ক্রমশঃ কমে গেলে শেষে মৃত্যু হওয়া বিচিত্র কি! এরা বংশবিস্তার করে অযৌনভাবে। জীবন-চক্রের এক অধ্যায়ে এরা শতধা বিভক্ত হ'য়ে যায় এবং লাল কণিকা বিদীর্ণ ক'রে বেরিয়ে আসে। তখনই

কম্প দিয়ে জ্বর ওঠে। কাজেই রোগের যখন বাড়াবাড়ি অবস্থা, তখন লক্ষ লক্ষ প্লাস্‌মোডিয়াম-কণা রক্তে পাওয়া যায়।

প্লাস্‌মোডিয়ামের কথা না হয় জানা গেল ; কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, রোগ-জীবাণু সংক্রমিত হয় কেমন ক'রে ? মশার সাহায্যেই যে ম্যালেরিয়ার জীবাণু সংক্রমিত হয়—এই বিচিত্র তথ্য সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন ডাক্তার রোনাল্ড রস্‌।

রোনাল্ড রস্‌ (Ronald Ross) জাতিতে বৃটিশ ; কিন্তু জন্মগ্রহণ করেন ভারতবর্ষে। পিতা ক্যাম্বল রস্‌ ছিলেন একজন নামকরা জেনারেল। সিপাহী বিদ্রোহের কিছু আগে তিনি হিমালয়ের পাদদেশে আলমোড়ায় বদলী হয়ে আসেন। সেখানেই ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মে রোনাল্ডের জন্ম হয়।
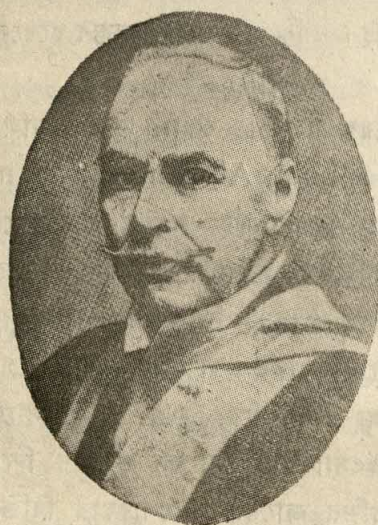
চিত্র ২০। রোনাল্ড রস্‌।

শৈশবেই পড়াশোনার জন্যে তাঁকে লণ্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নিয়মমাফিক পড়াশোনা কিংবা যুদ্ধ-বিদ্যা কিছুই তাঁর ভাল লাগত না। তবুও বাড়ির চাপে কোন প্রকারে স্কুলের পড়া শেষ করলেন। তারপর পিতার ইচ্ছানুযায়ী ভর্তি হলেন লণ্ডনের বার্থলোমিউ হাসপাতালে, ডাক্তারী পড়ার জন্য। হোস্টেলে থাকেন। অত্যন্ত একঘেয়ে জীবন। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্যচর্চা করেন, গান, কবিতা, নাটক ইত্যাদি লেখেন। এই ভাবে কিছুদিন সাহিত্য-চর্চার পরে, তিনি লণ্ডনের বিভিন্ন প্রকাশকের সঙ্গে দেখা করলেন।

কিন্তু কেউ তাঁর সাহিত্যচর্চাকে তেমন আমল দিলেন না। অতি উৎসাহী তরুণ সাহিত্যিক অগত্যা নিজেই নিজের লেখা প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। নিজের খরচেই বই ছাপালেন। কিন্তু তাঁর এইসব খেয়ালের কথা জানতে পেরে, ফৌজী পিতা রেগে আগুন হয়ে তাঁর পড়ার খরচ বন্ধ ক'রে দেবেন বলে ভয় দেখালেন। এর ফলে সাময়িকভাবে পড়াশোনায় ছেদ পড়ল। কারণ, রোনাল্ডও রেগেমেগে একটা জাহাজে চাকরি নিয়ে আমেরিকার দিকে পাড়ি জমালেন। কিন্তু সে কাজ তাঁর ভাল লাগল না। তাই আবার লণ্ডনে ফিরে এলেন, এবং সুবোধ বালকের মতো পড়াশোনায় মন দিলেন।

১৮৮১ সালে ডাক্তারী পাশ ক'রে আই. এম. এস. হ'য়ে ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। চাকরির শর্ত অনুসারে কখনও থাকেন কোয়েটায়, কখনও ব্যাঙ্গালোরে। সেখান থেকে যেতে হয় বর্মায় কিংবা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। কিন্তু এই ঘোরাঘুরি রস্-এর ভাল লাগে না। একটু স্থির হ'য়ে বসে গবেষণায় মন দিতে চান। কিন্তু তা আর হ'য়ে ওঠে না। তাই তাঁর মনে কোন সুখ নেই।

১৮৯৪ সালে রস্ ছুটি নিয়ে বিলেতে গেলেন। সেখানে তিনি প্রবীণ ডাক্তার প্যাট্রিক ম্যান্‌সনের সঙ্গে দেখা ক'রলেন। ফাইলেরিয়া রোগ যে কিউলেক্স মশার কামড়েই মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়, এই তথ্য আবিষ্কার ক'রে ম্যান্‌সন ইতোমধ্যে বিখ্যাত হ'য়ে পড়েছেন। রস্ তাঁর সঙ্গে ম্যালেরিয়া সম্পর্কে আলোচনা ক'রলেন। ম্যান্‌সন অণুবীনের সাহায্যে ম্যালেরিয়া জীবাণু দেখালেন। কি ক'রে আঙ্গুলে সূচ ফুটিয়ে রক্ত বের ক'রে স্লাইড তৈরি ক'রতে হয়, তাও রস্‌কে শিখিয়ে দিলেন।

রস্ একটি অণুবীক্ষণ-যন্ত্র বা অণুবীন সঙ্গে নিয়ে এদেশে ফিরে এলেন। মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হওয়া সম্ভব, এই ধারণা তাঁর মনে বাসা বেঁধেছে। তাই এ নিয়ে গবেষণা শুরু ক'রে দিলেন। কিন্তু বার বার ব্যর্থ হতে লাগলেন। এদিকে কিছুদিন পর পরই

বদলীর হুকুম আসে। এই গবেষণা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা ও তাদের বিরূপ মনোভাব, রসের মনে হতাশার ভাব এনে দিল। ভাবলেন, চাকরি ছেড়ে দেবেন।

মনের যখন এই রকম অবস্থা, তখন হঠাৎ বদলী হ'য়ে এলেন উটকামণ্ডে। এখানে এসে তাঁর এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হ'ল। ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত একটি স্থানে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আসবার পরই তাঁকে ম্যালেরিয়ায় ধ'রল। সেখানে যেমন ম্যালেরিয়া, তেমনি মশা। এজন্য রসের সন্দেহ আরও দৃঢ় হ'ল।

সুস্থ হওয়ার পর রস্ আবার কাজে যোগ দিলেন, সেকেন্দ্রাবাদের ফৌজী হাসপাতালে, ১৮৯৭ সালের জুন মাসে। ভাবলেন, চাকরি ছাড়বার আগে একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখা যাক। সেদিন ২০শে আগস্ট। রোজকার মতো কতকগুলি মশা নিয়ে রোগীর রক্ত পান করিয়েছেন, তারপর এক-একটি মশার পেট চিরে অণুবীনের তলায় পরীক্ষা ক'রে দেখছেন। নূতন কিছুই নজরে পড়ছে না। আলো-বাতাসহীন বদ্ধ ঘর, অসম্ভব গরম। বার বার ব্যর্থ হয়ে বিরক্তি ধ'রে গেছে। আর একটিমাত্র মশা পরীক্ষা করা বাকি রয়েছে। ধৈর্য ধ'রে সেটিকেও অণুবীনের তলায় রাখলেন, কোনপ্রকারে শ্রান্ত চোখ মেলে সেদিকে তাকালেন। কিন্তু একটু লক্ষ্য ক'রেই তিনি চমকিত হ'য়ে উঠলেন !

মশার পাকস্থলীতে এ কি একটা নূতন জিনিস দেখা যাচ্ছে ! এর আগে তো কোনদিন এ জিনিস দেখতে পাননি ! মশার পাকস্থলীর দেওয়ালের কোষের মধ্যে কালো কালো কি যেন ছড়ানো রয়েছে। রক্তের লাল কণিকার মধ্যে ম্যালেরিয়ার জীবাণু ভেঙ্গে যেমন হয়, সেইরকম এদের চেহারা। কণ্ট্রোলের মধ্যে, অর্থাৎ যে মশা ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত পান করেনি তার পাকস্থলীর মধ্যে, কখনও এ জিনিস দেখা যায় না। রস্ বুঝলেন, ম্যালেরিয়া জীবাণু মশার পাকস্থলীতে জীর্ণ হয় না, পাকস্থলীর দেওয়ালের কোষে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

রস্ আনন্দে অধীর হ'য়ে উঠলেন। তাঁর মনে হ'ল, এতদিনে তিনি ম্যালেরিয়ার রহস্য সমাধান ক'রে ফেলেছেন। মনের আবেগে একটি কবিতা লিখে ফেললেন :

This day relenting God
Hath placed within my hand
A wondorous thing ; and God
Be praised. At his command
I have found thy secret deeds
Oh, million murdering death.
I know that this little thing
A mlllion men will save—
Oh, death, where is thy sting ?
Thy victory, Oh, grave ?

[ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য এই কবিতাটির যে বাংলা অনুবাদ করেছেন, তা নীচে দেওয়া হ'ল—

"জয় হোক জগদীশ্বরের, তিনি আমার হাতে দিলেন আজ
এই ছুর্ভেদ্য রহস্যের চাবিকাঠি। পৃথিবীর লক্ষ কোটি মানবের
বিভীষিকা, হে মৃত্যু, তোমার মারাত্মক অস্ত্র পাঠাও কিভাবে
তার সন্ধান আমি জেনে গেছি। সামান্যই সেই কথা,
কিন্তু ঐটুকু জানাতেই লক্ষ মানুষের প্রাণ বাঁচবে।
হে মৃত্যু, তোমার দূতের দংশনজ্বালা আজ থেকে হবে ব্যর্থ।
তোমার ছুর্দম অভিযান আজ থেকে হবে নিরর্থক।"]

উপরিউক্ত ইংরাজী কবিতাটি খোদাই ক'রে রাখা হয়েছে প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে তাঁর মর্মর মূর্তির নীচে।

এই আবিষ্কারের বিবরণ বৃটিশ মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত হ'ল ১৮৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে।

যাই হোক, এখন প্রমাণ ক'রতে হবে, মশার পাকস্থলীর দেওয়াল

থেকে এই জীবাণু কোথায় যায় এবং কিভাবে আবার সুস্থ মানুষের শরীরে তা প্রবেশ করে। কিন্তু এই রহস্য ভেদ করার আগেই আবার বদলীর হুকুম এলো। রস্‌কে আসতে হ'ল মধ্যভারতে। সেখানে গবেষণা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হ'ল না। এতে রস্ খুবই হতাশ হ'য়ে পড়লেন। স্থির করলেন, এবারে সত্যি সত্যি চাকরি ছেড়ে দেবেন।

রসের প্রাথমিক সাফল্যে ম্যান্‌সন খুবই আনন্দিত হয়েছেন, তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিলেতে বসে রসের বিড়ম্বনার কথা এবং সেজন্য তিনি যে সঙ্কল্প করেছেন সে কথা জানতে পেরে ম্যান্‌সন অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে পড়লেন। তাঁরই একান্ত চেষ্টায় রস্‌কে বিশেষভাবে ম্যালেরিয়া সম্পর্কে গবেষণার জন্য নিযুক্ত করা হ'ল ছ' মাসের জন্য। এই কাজ নিয়ে রস্ কলকাতায় এলেন ১৮৯৮ সালে। প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে তাঁকে একটা আলাদা ল্যাবরেটরী দেওয়া হ'ল; আর সাহায্য করার জন্য দেওয়া হ'ল ছু'জন সহকারী।

এখানে এসে রস্ নূতন ক'রে পরীক্ষা শুরু ক'রলেন। তিনি ম্যালেরিয়া রোগীর গায়ে মশা ছেড়ে দিতেন এবং দূষিত রক্ত পান করবার পর সে-সব মশার পেট চিরে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জীবাণুর সন্ধান ক'রতেন। রস্ মশার জাত বিচার ক'রতে পারতেন না। তাঁর আর্দালী মহম্মদ বক্স কলকাতার আশেপাশের খানা-ডোবা থেকে যে সব মশা সংগ্রহ ক'রে আনতো তা নিয়েই তিনি পরীক্ষা ক'রতেন। কিন্তু দীর্ঘ দিন এভাবে পরিশ্রম ক'রেও মশার পেটে জীবাণুর কোন চিহ্ন দেখতে পেলেন না। যদিও ইতিপূর্বে এই জীবাণুর সন্ধান তিনি নিজেই পেয়েছিলেন। বার বার অকৃতকার্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁর দীক্ষাগুরু ম্যান্‌সন তাঁকে নানাভাবে উৎসাহিত ক'রতে লাগলেন। স্থির হ'ল পাখিদেরও ম্যালেরিয়া হয়। কাজেই গবেষণাগারে পরীক্ষার জন্যে তাদের নিয়োগ করা হয়তো অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।

নতুন পরীক্ষায় হঠাৎ একদিন তিনি দেখতে পেলেন, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত চড়ুই পাখির রক্ত পান ক'রবার পর মশার পেটে অসংখ্য জীবাণু বাসা বেঁধেছে। বার বার পরীক্ষা ক'রে একই রকম ফল পাওয়া গেল; কাজেই এবারে আর সন্দেহের অবকাশ রইল না। বোঝা গেল, ম্যালেরিয়া সংক্রমণের জন্যে মশাই দায়ী। কিন্তু তবুও প্রশ্ন রইল, মশার পাকস্থলী থেকে পুনরায় সুস্থ জীবদেহে জীবাণু যায় কোন্ পথে, কী ভাবে? ১৮৯৮ সালের জুন মাসে রস্ পুনরায় এই সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত হলেন। দীর্ঘদিন ধরে বহু কষ্টসাধ্য পরীক্ষার পর তিনি নিশ্চিতরূপেই প্রমাণ পেলেন—জীবাণুগুলি নানাভাবে রূপ বদ্‌লে অবশেষে লালা-গ্রন্থিতে গিয়ে জমা হয়। তখনই এক ঝলকে সমস্যার সমাধান তাঁর মনে এলো। মশা কামড়াবার সময়েই তো তাহলে জীবাণু রক্তের সঙ্গে মিশে রোগের সৃষ্টি ক'রে! এবার এক ঝাঁক মশাকে প্রথমে রোগগ্রস্ত পাখির রক্ত পান করিয়ে তারপর পৃথক্‌ভাবে তিনটি সুস্থ পাখির খাঁচায় ছেড়ে দেওয়া হ'ল। কলকাতার দারুণ গ্রীষ্মে ঘর্মাক্ত কলেবরে দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে রস্ পরীক্ষার ফলাফল লক্ষ্য ক'রতে লাগলেন। সফলতার আনন্দে আত্মহারা হয়ে তিনি সর্বপ্রথমে, ৯ই জুলাই তারিখে গুরু ম্যান্‌সনকে লিখলেন—তিনটি সুস্থ পাখির রক্তই এখন ম্যালেরিয়া জীবাণুতে পরিপূর্ণ হ'য়ে গেছে।

সুদীর্ঘ চার বছর ধ'রে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দারুণ অধ্যবসায়ের ফলে একটি নূতন তথ্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল। বিজ্ঞানীরা নিশ্চিতরূপে জানলেন, কিভাবে মশার সাহায্যেই রোগগ্রস্ত জীবদেহ থেকে সুস্থ জীবদেহে ম্যালেরিয়া-জীবাণু সংক্রমিত হয়। আনন্দে আত্মহারা হয়ে রস্ ছেলেমানুষের মতো চারদিকে খুব একটা হৈ-চৈ লাগিয়ে দিলেন। নানাদেশের বিজ্ঞানীদের কাছে টেলিগ্রাম ক'রে পরীক্ষার ফলাফল জানিয়ে দিলেন—প্রবন্ধ লিখে নানাদেশের বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় ছাপতে দিলেন। অবশ্য সেগুলি ছাপা হয়ে

জনসাধারণের কাছে পৌছুতে ইতোমধ্যে অনেক মাস কেটে গেল।

এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে রস্-এর দীক্ষাগুরু এবং এই গবেষণার প্রধান উৎসাহদাতা ম্যান্সন তাঁর শিষ্যের সাফল্যের কথা চারদিকে প্রচার ক'রে বেড়াতে লাগলেন। এডিনবরার মেডিক্যাল কংগ্রেসে এই আবিষ্কারের বিবরণ শোনানো হ'ল 'Great and epoch-making discovery'-র জন্য রস্‌কে তাঁরা অভিনন্দন জানালেন। যাঁরাই এই আবিষ্কারের কথা জানতে পারলেন তাঁরাই সম্মান ও অভিনন্দনের বাণী পাঠাতে লাগলেন। এর চেয়ে গৌরবের বিষয় আর কি হতে পারে ?

কিন্তু উৎসাহ-উদ্দীপনা খানিকটা কম পড়লে বিজ্ঞানী ম্যান্সন ভাবলেন—পাখির বেলায় যা ঠিক হয়েছে, মানুষের বেলায় তা তো ঠিক নাও হতে পারে! তিনি তাই রস্‌কে লিখলেন—আপনার কাজের সূচনা খুব চমৎকার এবং আশাপ্রদ হয়েছে ঠিক, কিন্তু একে শুধু সূচনা বলেই ধরতে হবে। কারণ পরীক্ষার সাহায্যে মানুষের বেলায়ও এই মতবাদের সত্যতা নিরূপণ করতে হবে। দেশপ্রেম প্রণোদিত হয়ে তিনি আরও লিখলেন—"You have time to grab the discovery for England."

কিন্তু ইংল্যাণ্ডের দুর্ভাগ্য এবং তদুপরি রস্-এরও দারুণ দুর্ভাগ্য যে, শত চেষ্টা ক'রেও তিনি মানুষের দেহে ম্যালেরিয়া সংক্রমণ-পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারলেন না। কঠোর সাধনা, অননুকরণীয় অধ্যবসায় সবই ব্যর্থ হ'ল—যদিও আপাতদৃষ্টিতে কাজটা মোটেই কঠিন ছিল না।

মশার জাত বিচার করা রস্-এর পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। কাজেই নিতান্ত অনভিজ্ঞের মতো একবার বাদামী, একবার সবুজ, আবার ধূসর—এইরূপ নানাপ্রকার মশা নিয়ে বার বার পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। কিন্তু বার বারই তাঁর পরীক্ষা ব্যর্থ হতে লাগলো।

দারুণ গ্রীষ্মে ক্রমাগত বিফল হয়ে তিনি ক্রমশঃ ধৈর্যহারা হতে লাগলেন। দারুণ দুশ্চিন্তা এবং কঠোর পরিশ্রমের ফলে তাঁকে অনিদ্রা রোগে ধরলো। অল্প দিনের মধ্যেই এগারো পাউণ্ড ওজন কমে গেল, স্মৃতি কমে গেল, নিজের উপর বিশ্বাস হারাতে লাগলেন ; কিন্তু তবুও তাঁর স্বপ্ন সফল হ'ল না। পথের উপর দাঁড়িয়েও তিনি অন্ধকারে ঘুরে মরলেন, লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারলেন না।

ম্যালেরিয়া-জীবাণু সংক্রমণের অজ্ঞাত তথ্য অবিষ্কারের সঙ্গে যে আর একটি আত্মত্যাগী বিজ্ঞানীর স্মৃতি বিজড়িত রয়েছে, তাঁর কথা আমরা ক'জনই বা জানি! ইটালী দেশীয় এই বিজ্ঞানীর নাম গিয়োভ্যানী ব্যাটিটা গ্র্যাসী (Giovani Battista Grassi)। আমরা অনেকেই হয়েতো অজ্ঞতাবশতঃ এই আবিষ্কারের যাবতীয় কৃতিত্ব রস্‌কে দেই ; কিন্তু একথা ঠিক যে, মানুষের দেহে ম্যালেরিয়া রোগ কিরূপে সংক্রমিত হয়, সে সত্য তিনি আবিষ্কার করতে পারেন নি। চড়ুই পাখিদের বেলায় তাঁর গবেষণা সাফল্যমণ্ডিত হলেও মানুষের বেলায় তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই সত্য সঠিকভাবে নির্ণয় করেন বিজ্ঞানী গ্র্যাসী। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এঁদের কারও দানই উপেক্ষণীয় নয়। রস্-এর আবিষ্কার হয়তো গ্র্যাসীর সাফল্য সহজ-সাধ্য ও ত্বরান্বিত করেছিল ; কিন্তু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, মানুষের কল্যাণের দিক দিয়ে বিচার করলে, এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব বেশীর ভাগই গ্র্যাসীর প্রাপ্য। কিন্তু ইটালীর বাইরে আজ ক'জনই বা গ্র্যাসীর নাম জানে ? ইংরেজদের অসাধারণ প্রতিপত্তি অথবা নিছক প্রোপাগাণ্ডার জোরেই হয়তো এরূপ হওয়া সম্ভব হয়েছে।

আগেই বলেছি, ভারতের মতো ইটালীতেও এককালে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ছিল অত্যন্ত বেশী। কাজেই এই রোগ নিবারণের উদ্দেশ্যে সেখানকার অনেক বিজ্ঞানীই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। গ্র্যাসী ছিলেন একাধারে ডাক্তার এবং

প্রাণিবিদ্যাবিশারদ্। রস্ কিংবা অন্য কেউ ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ বিষয়ে মশার কথা চিন্তা করবার আগেই একথা তাঁর মনে উদিত হয়েছিল এবং কিছু কিছু পরীক্ষাও করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তখন ভুল জাতের মশা নিয়ে পরীক্ষা করায় তিনি অকৃতকার্য হন। তাহলেও গ্রাসী হাল ছাড়লেন না। ইতিপূর্বেই তিনি লক্ষ্য করেছেন—মশা আছে অথচ ম্যালেরিয়া নেই, এরূপ দেখা যায় ; কিন্তু ম্যালেরিয়া আছে অথচ মশা নেই, এরূপ তো কখনও দেখা যায় না ! এর একমাত্র অর্থ এই হতে পারে যে, বিশেষ এক জাতের মশা এজন্যে দায়ী। সেটি আবিষ্কার করাই হ'ল প্রকৃত সমস্যা।

১৮৯৮ সাল। তিনি রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। একটা ছুটিতে বিশ্রাম না নিয়ে তিনি যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে ১৫ই জুলাই থেকে ইটালীর ম্যালেরিয়া জর্জরিত গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। নোংরা, দুর্গন্ধযুক্ত জলা জায়গায় ঘুরে ঘুরে তিনি বিভিন্ন জাতের মশা সংগ্রহ করলেন। প্রাণিবিদ্যাবিশারদ্ হওয়ায় মশার জাত বিচার করা তাঁর পক্ষে একটুও কঠিন ছিল না। এভাবে অনুসন্ধান ক'রে তিনি অতি সহজেই প্রায় ২০।২২ জাতের মশাকে ম্যালেরিয়া সংক্রমণের দায় থেকে অব্যাহতি দিলেন।

ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত পরিবার পেলেই তিনি প্রশ্ন করতেন—আপনার পরিবারে কতজন ম্যালেরিয়ায় ভুগ্ছে, আর কত জনের হয় নি ? রোগগ্রস্ত শিশু থাকলে, তাকে গত সপ্তাহে কতবার মশা কামড়েছে ?—ইত্যাদি। প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে গৃহস্বামী হয়তো বিরক্তভরে উত্তর দিতেন—আমরা ম্যালেরিয়ায় ভুগি, এটা ঠিক, কিন্তু তাই বলে কখনও মশা নিয়ে মাথা ঘামাই না। এরূপ উত্তরে গ্র্যাসী কখনই সন্তুষ্ট হতেন না। নিজেই বাড়ীর আনাচে-কানাচে, খাটের নীচে বা জুতোর মধ্যে খুঁজে দেখতেন—মশা আছে কিনা ; আর থাকলে তা কোন্ জাতের ? তিনি লক্ষ্য করলেন—যেখানেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশী, সেখানেই অ্যানোফিলিস্ ক্ল্যাভিজার

জাতীয় মশারও সন্ধান পাওয়া গেল। ইটালীর গ্রামবাসীদের কাছে অ্যানোফিলিস মশা 'জান্-জা-রো-নে' নামে পরিচিত ছিল, আর এদের চেনাও খুব সহজ। কারণ এদের ডানায় পরিষ্কার চারটি কালো দাগ থাকে, আর এরা লেজটা উপরের দিকে উঁচিয়ে বসে। কিউলেক্স মশা যখন বসে তখন লেজটা নীচের দিকে ঝুলে থাকে।

চিত্র ২১। অ্যানোফিলিস এবং কিউলেক্স মশার তুলনা।

শয়নে-স্বপনে গ্র্যাসীর তখন একমাত্র চিন্তা—অ্যানোফিলিস্ ক্ল্যাভিজার। ছুটির বিশ্রাম, গৃহের সুখ-শয্যা ছেড়ে গ্রামের এঁদো পুকুর, নালা, নোংরা খাল-বিলের ধারে ধারে তিনি অ্যানোফিলিস্ মশা সংগ্রহ করতে লাগলেন। তাঁকে প্রায়ই দেখা যেত অতি

ক্লান্তিদায়ক অপরিচ্ছন্ন তৃতীয় শ্রেণীর রেলগাড়ীতে—অনাহার ও অনিদ্রাজনিত দৈহিক ক্লান্তি অগ্রাহ্য ক'রে চলেছেন ম্যালেরিয়ার জন্যে কুখ্যাত অচেনা গ্রামের উদ্দেশ্যে। সহযাত্রীদের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের গল্প, হাসি-ঠাট্টা—কিছুতেই তাঁর মন নেই। আপন মনে গুণে দেখছেন, সেদিন কতগুলো অ্যানোফিলিস্ মশা সংগ্রহ করতে পেরেছেন। এই ভাবে বাস্তব ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের ফলে ম্যালেরিয়া সংক্রমণ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এরূপ বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, গবেষণাগারে কোনরূপ পরীক্ষা ক'রবার আগেই, সেই বৎসর ২৮শে সেপ্টেম্বর তিনি লিন্সাই অ্যাকাডেমীতে একটি প্রবন্ধ পাঠ করবার সময় বললেন—মশা যদি সত্যই ম্যালেরিয়া-জীবাণু বহন করে, তবে একমাত্র অ্যানোফিলিস্ মশকীর পক্ষেই তা করা সম্ভব।

এই মতবাদ প্রমাণ ক'রবার জন্যে স্থির হ'ল, ডাঃ ব্যাস্টিয়ানেলীর সহযোগিতায় 'হোলি স্পিরিট' হাসপাতালে সোলা-র দেহে প্রাথমিক পরীক্ষা চালানো হবে। রোমের সুউচ্চ পাহাড়ে অবস্থিত এই হাসপাতালের আশেপাশে কোন দিন মশা দেখা যায় নি, কিংবা এখানে ম্যালেরিয়ার নামও কেউ কোনদিন শোনে নি—কাজেই পরীক্ষার পক্ষে এইটিই উপযুক্ত স্থান। গ্র্যাসী প্রথমে কিউলেক্স মশা নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন। একটা অন্ধকার ঘরে সোলাকে রেখে ঐ জাতের শত শত মশা ছেড়ে দেওয়া হ'ল। আবদ্ধ ঘরে ক্রমাগত কয়েক রাত ধ'রে মশার কামড় খেয়ে সোলা ছট্‌ফট্ ক'রে কাটালেন। কিন্তু তাঁর যন্ত্রণা ভোগ করাই সার হ'ল। রোগের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। এরপর ম্যালেরিয়ার জন্যে কুখ্যাত পল্লী থেকে ধ'রে আনা শত শত অ্যানোফিলিস্ মশা ছেড়ে দেওয়া হ'ল। বিজ্ঞানের সাধনায় সোলার এই নির্যাতন এবার সার্থক হ'ল। দশ দিন পরে ভদ্রলোকের কম্প দিয়ে জ্বর এলো। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেল, তাঁর রক্তে ম্যালেরিয়া-জীবাণু কিলবিল্ করছে।

এই হাসপাতালে বার বার পরীক্ষা ক'রে গ্র্যাসী একই রকম ফল পেতে লাগলেন। চারদিকে এই নিয়ে সাড়া পড়ে গেল। এতদিন পরে নিশ্চিতরূপে বোঝা গেল যে, অ্যানোফিলিস্ মশকী ম্যালেরিয়া-রোগ সংক্রমণের জন্যে দায়ী। কেউ কেউ তাঁর মত সমর্থন করলেন, আবার কেউ কেউ ভয়ানক সমালোচনা শুরু ক'রে দিলেন। খবরের কাগজে এই নিয়ে নানাপ্রকার ব্যঙ্গচিত্র এবং বিরুদ্ধ সমালোচনাও ছাপা হতে লাগলো। কিন্তু প্রাথমিক সফলতার আনন্দে আত্মহারা গ্র্যাসী সব কিছু অগ্রাহ্য ক'রে তাঁর এই মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রবার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন।

এই অবস্থায় একদিন ইটালীর নীরব কর্মী গ্র্যাসীর কাছে রস্-এর আবিষ্কারের বিবরণ পৌঁছালো। ইতোমধ্যে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে গবেষণা ক'রে একই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন ; কাজেই রস্-এর কাজে তাঁর কৌতূহল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। রস্-এর বিবরণে মশার জাত সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না থাকায় তাঁর বৈজ্ঞানিক মন সহজেই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলো। বুঝতে পারলেন, মানুষের বেলায় ঠিক জাতের মশা নির্বাচন করতে পারেন নি বলেই রসের পরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে। নতুন আলোর সন্ধান পেয়ে অ্যানোফিলিস্ মশকীর সাহায্যে তখনই তিনি রস্-এর অনুরূপ পরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করলেন। অচিরেই তাঁর এই অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত হ'ল। রোগগ্রস্ত মানুষের রক্ত পান ক'রবার পর মশার পেটে অসংখ্য জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেল। শুধু তাই নয়, হুবহু রস্-এর বর্ণনামত এরাও নানারকম রূপ বদ্‌লে শেষে মশার লালা-গ্রন্থিতে গিয়ে জমা হ'ল। এরপর আরও নানা দুঃসাধ্য পরীক্ষা দ্বারা গ্র্যাসী নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করলেন—যে মশকী পাখির দেহে ম্যালেরিয়া সংক্রামিত করে, তা কখনই মানুষের দেহে ম্যালেরিয়া সংক্রমণ করতে পারে না। আবার, মানুষের ম্যালেরিয়া জীবাণুর যারা বাহক, তারা কখনই পাখির ম্যালেরিয়া জীবাণু বহন করতে পারে না।

এই দু'জন অক্লান্ত কর্মীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে ম্যালেরিয়া-

জীবাণুর জীবন-চক্র সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা গেল। মশার কামড়ের ফলে যে প্লাস্‌মোডিয়াম দেহে প্রবেশ করে তার নাম স্পোরোজোইট (Sporozoite)। স্পোরোজয়েট দেখতে তর্কু বা টাকু (Spindle)-এর মতো। এরা সাময়িকভাবে যকৃতের কোষ আশ্রয় ক'রে থাকে। এরা বৃদ্ধি পেয়ে প্রাক-বিভাজন সিজোণ্ট (Schizont)-রূপ গ্রহণ করে, এবং অবশেষে বিভাজিত হয়ে অনেকগুলি মেরোজয়েট (Morozoite) সৃষ্টি করে। এইভাবে প্রতিটি সিজোণ্ট থেকে প্রায় ১২০০০ মেরোজয়েট উৎপন্ন হয়। এরা যকৃতের কোষে, অথবা রক্তের লাল কণিকায় প্রবেশ করে। মেরোজয়েট রক্তের লাল কণিকায় প্রবেশ ক'রে প্রথমে ট্রোফোজোইট (Trophozoite)-এ পরিণত হয়। তা ক্রমশঃ গোলাকার ধারণ করে, এবং বিভাজিত হয়ে অনেকগুলি (প্রায় ১৬টি) মেরোজয়েট উৎপন্ন করে। মেরোজয়েট হ'ল প্লাস্‌মোডিয়ামের অযৌনরূপ। এগুলি লাল কণিকা বিদীর্ণ ক'রে আবার রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় একপ্রকার বিষ (Toxic substance) রক্তে নির্গত হয়। তাই কাঁপুনি দিয়ে প্রবল জ্বর আসে। নবজাত মেরোজয়েটগুলি নতুন নতুন লাল কণিকাকে আক্রমণ করে। এজন্য প্লাস্‌মোডিয়ামের প্রজাতি অনুযায়ী ৪৮ বা ৭২ ঘণ্টা পর পর এক সঙ্গে অনেকগুলি ক'রে মেরোজোইটের সৃষ্টি হয়। কাজেই ৪৮ বা ৭২ ঘণ্টা পর পর জ্বরের পালা। ম্যালেরিয়াকে এই কারণে পালাজ্বর বলা হয়। বেশীদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগলে, রোগীকে রক্তশূন্য ও ফ্যাকাসে দেখায়। অসুখের শুরু থেকেই জীবাণু প্লীহাতে আশ্রয় নেয়। লাল কণিকার ধ্বংসাবশেষের প্রাচুর্য প্লীহার স্বাভাবিক কর্মক্ষমতার উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। এর ফলে প্লীহার বিশিষ্ট কিছু কোষের নিরন্তর বৃদ্ধি ঘটে। তাই রোগীর প্লীহা বড় হয়ে যায়। একই কারণে যকৃতেরও কিছু আয়তন বৃদ্ধি ঘটে।

এছাড়া পুরুষ ও স্ত্রী এই দু'রকম গ্যামিটোসাইট উৎপন্ন হয়। এরা জীবাণুর যৌন রূপ। গ্যামিটোসাইটগুলি মানুষের রক্তস্রোতে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এদের তখন কুমার-কুমারী অবস্থা। আশ্চর্যের

বিষয় এই যে, মানবদেহে থাকতে এরা মিলিত হয়ে বংশবিস্তার করতে পারে না। রোগীকে মশা কামড়ালে, এরা মশার পেটে চলে যায়, এবং সেখানে এদের যৌন-মিলনের ফলে সৃষ্টি হয় জাইগোট। জাইগোট মশার পাকস্থলীর কোষে আশ্রয় ক'রে থাকে। এ থেকে যথাক্রমে উওসিস্ট এবং স্পোরোজোইট-এর সৃষ্টি হয়। এরা তখন মশার পাকস্থলী থেকে এসে তার লালাগ্রন্থিতে জমা হয়। জীবাণুবাহী এই মশা কোন সুস্থ মানুষকে কামড়ালে, জীবাণুগুলি তার রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। এর ফলে তার দেহে ম্যালেরিয়া রোগ সংক্রামিত হয়।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এই মহান আবিষ্কারের কৃতিত্ব অনেকাংশে গ্র্যাসীরই প্রাপ্য। কারণ, সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে অনুসন্ধান ক'রে স্বাধীনভাবেই তিনি এই সিদ্ধান্তে ইতিপূর্বেই উপনীত হয়েছিলেন। রস্-এর পরীক্ষা-প্রণালী অনুসরণ ক'রবার ফলে তাঁর মতবাদ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল মাত্র। বিজ্ঞানী হিসেবে রস্-এর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য, কিন্তু তাই বলে গ্র্যাসীও উপেক্ষণীয় নন। কারণ, রস্ শত চেষ্টা ক'রেও যা প্রমাণ করতে পারেন নি, গ্র্যাসী অতি সহজেই এবং সুষ্ঠুভাবে তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেন। তাছাড়া রস্-এর অকৃতকার্যতার কারণ দেখিয়ে সকল সমস্যার সহজ সমাধান ক'রে দেন। কিন্তু অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস, আর বিজ্ঞানীদের কি অদ্ভুত বিচারবুদ্ধি! মশা কিরূপে পাখির দেহে ম্যালেরিয়া সংক্রামিত করে—এই তথ্য আবিষ্কারের জন্য ১৯০২ সালে রস্‌কে দেওয়া হ'ল সুবিখ্যাত নোবেল পুরস্কার, যার মূল্য তখন ৭,৮৮০ পাউণ্ড। ইংল্যাণ্ডেও তাঁকে সম্মানিত করা হ'ল 'নাইট' উপাধি দিয়ে, ১৯১১ সালে। কিন্তু মানুষের কল্যাণের দিক দিয়ে যে তথ্যটি সবচেয়ে মূল্যবান তা আবিষ্কার করা সত্ত্বেও গ্র্যাসী চিরকালের মতো রইলেন উপেক্ষিত—অবজ্ঞাত!

আর একটা কথা। রস্ জন্মেছিলেন ভারতবর্ষে, আর ম্যালেরিয়া জর্জরিত বাংলাদেশের কলকাতা শহরে বসেই রস্ তাঁর জীবনের
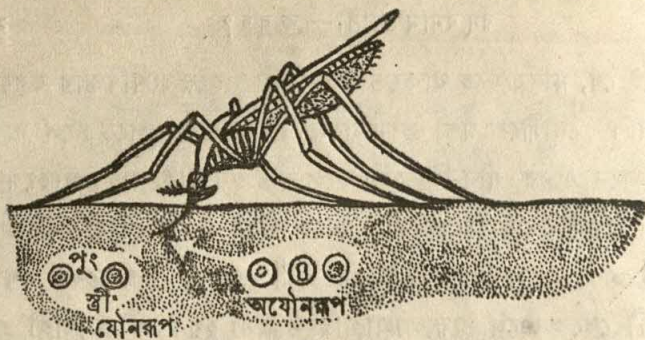
(i) ম্যালেরিয়া রোগীকে মশা কামড়াল

(ii)
জীবাণু পাকস্থলী থেকে লালাগ্রন্থিতে উপস্থিত হল

(iii) সেই মশা সুস্থ মানুষকে কামড়াল

চিত্র ২২। ম্যালেরিয়া সংক্রমণ-পদ্ধতি।
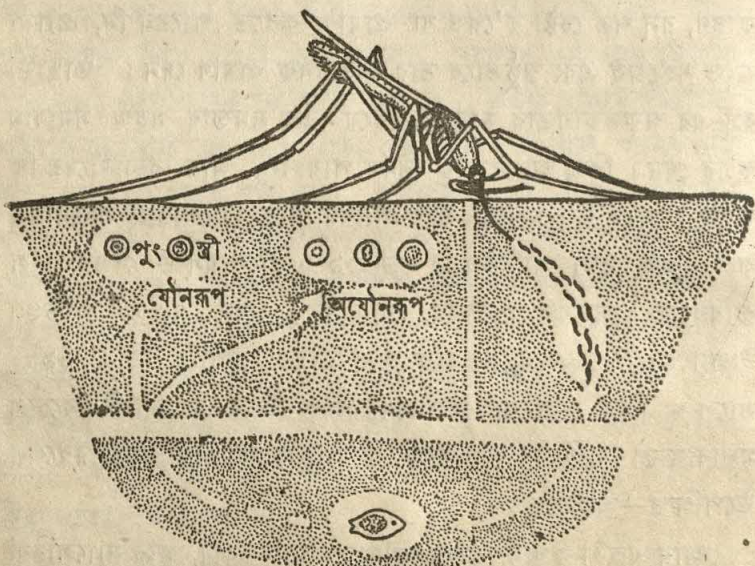
ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্লাস্মোডিয়ামের জীবনচক্র
(১) মশার দেহ—
(মশার পাকস্থলীতে
যৌন-চক্র)
গ্যামিটোসাইট্স্
পুরুষ+স্ত্রী
(মশা কামড়ালে
এগুলি মশার
পাকস্থলীতে
যায়)
জাইগোট
উওসিস্ট
স্পোরোজোইট
(২) মানব-দেহ—
(মশার পাকস্থলী থেকে
এসে তার লালাগ্রন্থীতে
জমা হয়।)
(মশার কামড়ে মানুষের
রক্তে মিশলো এবং
ক্রমশঃ অন্যরূপ পরিগ্রহ
ক'রল।)
(মানুষের
রক্তে
অযৌন চক্র)
ট্রোফোজোইট
সিজোণ্ট
মেরোজোইট
গ্যামিটোসাইট্স্
(পুরুষ ও স্ত্রী)

চরম সাফল্য অর্জন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই চমকপ্রদ ও কল্যাণকর আবিষ্কারের গৌরব ভারত পায়নি, পেয়েছে ইংল্যাণ্ড। পরাধীন ভারতের এই গ্লানি ভোলবার নয়।

গ্র্যাসী ছিলেন একাধারে দেশপ্রেমিক এবং বাস্তব বিজ্ঞানী। এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব কার কতখানি—এই তর্কের মীমাংসায় বৃথা কালক্ষেপ না ক'রে ইটালী থেকে ম্যালেরিয়া নির্বাসনের মহান ব্রতে তিনি আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি বুঝলেন—ম্যালেরিয়া রোগী, অ্যানোফিলিস্ মশকী এবং সুস্থ মানুষ—এই তিনের যোগাযোগ ছাড়া ম্যালেরিয়া রোগ ছড়াতে পারে না। তাই তিনি মিশনারীদের মতো গ্রামে গ্রামে ঘুরে মশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার জন্যে গ্রামবাসীদের আহ্বান করতে লাগলেন। তাঁর মূল মন্ত্র হ'ল—'জান-জা-রো-নে' মশা থেকে দূরে থাক, তাহলে দু-এক বছরের মধ্যেই ইটালী থেকে ম্যালেরিয়া রোগও নির্বাসিত হবে। সংশয়াকুল গ্রামবাসীদের কখনও মিষ্টি কথায় বশীভূত ক'রে, কখনও চোখ রাঙ্গিয়ে, আবার অবস্থাবিশেষে ঘুষ দিয়ে, মশার কামড় থেকে দূরে থাকবার জন্যে উদ্বোধিত করতে লাগলেন। অল্প দিনের মধ্যেই সুফল দেখা যেতে লাগলো। যেখানে ছেলে-বুড়ো সবাই অহরহ ম্যালেরিয়ায় ভুগতো, সেখান থেকেও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আশ্চর্যরূপে কমে যেতে লাগলো। একটা জয়াগার কথা গ্র্যাসী লিখেছেন—"In the so much feared station of Albanella, from which for years so many coffins had been carried, one could live as healthily as in the healthiest spot in Italy !"

রস্- বড়, না গ্র্যাসী বড়—এই বিতর্কে গিয়ে কোনো লাভ নেই। তবে যে আত্মত্যাগী বিজ্ঞানী মানবের কল্যাণকল্পে এতখানি করেছিলেন, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ না করা আমাদের পক্ষে সত্যই লজ্জার কথা।

যারা মরণের সাথে করে কোলাকুলি

প্রায় একশ' বছর আগেকার কথা। উত্তর আর দক্ষিণ আমেরিকার মাঝে পানামা যোজক। সেখানে একটা খাল কাটার ব্যবস্থা হ'ল। তা না হলে মার্কিন নৌবহর পূব থেকে পশ্চিমে নিয়ে যাওয়া এক কঠিন সমস্যা, যেতে হয় সুদূর দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে।

কয়েকজন ধনবান ফরাসী মিলে একটি কোম্পানি গঠন করলেন। সেই কোম্পানি কলম্বিয়া রাষ্ট্রের কাছ থেকে অনুমতি পেলেন এই খাল কাটার জন্য। সুয়েজ খাল নির্মাতা বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার কাউন্ট স্থ লেসেপ্সকে এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হ'ল।

ইঞ্জিনিয়ার কন্ট্রাক্টর, তাদের সহকারী এবং হাজার হাজার শ্রমিকের এক বিরাট বাহিনী একদিন গিয়ে হাজির হ'ল পানামার সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে। নির্জন ধূ-ধূ মাঠ হঠাৎ একদিন মুখরিত হয়ে উঠলো শ্রমিকদের কোলাহলে। খাল-কাটার কাজ শুরু হয়ে গেল।

কিন্তু অল্পদিন পরে হঠাৎ একদিন কান্নার রোল উঠলো মজুরদের পল্লীতে। অস্বাভাবিক কিছুই নয়। একটি শ্রমিক জ্বরে মারা গেছে। কিন্তু তখন কে জানতো যে এ হ'ল আরও অনেক কান্নার ভূমিকা মাত্র!

একটির পর একটি শ্রমিক জ্বরে পড়ছে, আর টপাটপ মারাও পড়ছে। ডাক্তাররা শ্রমিকদের পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে রোগী দেখছেন, ওষুধ দিচ্ছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। অল্পদিনের মধ্যেই এই জ্বর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো মহামারীরূপে।

ইঞ্জিনীয়ার, কন্ট্রাক্টার আর ডাক্তার সবাই শঙ্কিত হ'য়ে উঠলেন। আরও বড় বড় নামকরা সব ডাক্তারদের নিয়ে আসা হ'ল পানামা

পল্লীতে। কিন্তু তাঁরাও ব্যর্থ হলেন। তবে তাঁরা এইটুকু নিশ্চিত বুঝলেন যে, সর্বনাশা 'ইয়োলো ফিভার' বা পীত-জ্বরের আক্রমণ শুরু হয়েছে।

যমের চেয়েও ভয়ংকর এই রোগ, তাই ডাক্তাররা এর নাম দিয়েছিলেন—'ইয়োলো জ্যাক' অর্থাৎ 'হল্‌দে দানো'। দুরন্ত, পীত-জ্বরের আক্রমণে একটির পর একটি মজুর মারা যেতে লাগলো। ইঞ্জিনিয়ার কণ্ট্রাক্টাররাও বাদ গেলেন না। এর ফলে চারিদিকে ভয়ানক ত্রাসের সঞ্চার হ'ল।

রোজই কামাইয়ের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। ধীরে ধীরে জনশূন্য হ'তে লাগলো মজুরদের পল্লী। চারিদিকে আতঙ্কের ছায়া নেমে এলো। মজুররা প্রাণভয়ে রাতারাতি, কোনো খবর না দিয়েই, পালিয়ে যেতে লাগলো পানামা অঞ্চল ছেড়ে। শেষে একদিন ইঞ্জিনিয়ারদের নিতান্ত বাধ্য হ'য়েই খাল কাটার কাজ বন্ধ ক'রে দিতে হ'ল।

এই মারাত্মক রোগে সবশুদ্ধ প্রায় বিশ হাজার লোক মারা গেল। ষোলজন ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে পনের জনই প্রাণ হারালেন। কোম্পানির ক্ষতি হ'ল প্রায় পাঁচ কোটি পাউণ্ড। একটি বিরাট পরিকল্পনা এইভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'ল। আর এর জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী হ'ল 'ইয়োলো জ্যাক্' বা 'হল্‌দে দানো'।

এরপর যবনিকা উঠলো কিউবায়। কিউবায় তখন আমেরিকানদের সঙ্গে স্প্যানিয়ার্ডদের তুমুল লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

১৯০০ সালের কথা। কিউবার সান ক্রিস্টোবাল দ্য হাভানাতে দুরন্ত পীত-জ্বরের আক্রমণে এখন এক নারকীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্রোহী স্পানিয়ার্ডদের বন্দুকের গুলিতে যত মার্কিন সৈন্য মারা গেছে, তার চেয়ে অনেক বেশী সৈন্য ইতোমধ্যে মারা গেছে এই ব্যাধির আক্রমণে। সাধারণতঃ নোংরা অপরিচ্ছন্ন আবহাওয়াতেই কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতির মড়ক লাগে, এই হ'ল

বিজ্ঞানীদের সাধারণ অভিজ্ঞতা। কিন্তু এই রোগের বেলায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সযত্নে লালিত বড় বড় অফিসাররাই মারা গেল বেশী। কর্তৃপক্ষের তাই টনক নড়ল। তাঁরা ওআল্টার রীড (Walter Reed)-এর নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করলেন। এতে রইলেন, ডাক্তার জেম্‌স ক্যারল্ (James Carroll) শিক্ষিত জীবাণু-সন্ধানী জেসি ল্যাজিয়ার (Jesse Lazear) এবং একজন এসিস্ট্যাণ্ট এরিস্টাইডিস এগ্রামণ্টে (Aristides Agramonte)।

পীত-জ্বরের সংক্রমণ নিবারণের জন্য এতকাল ধ'রে মানুষের ধারণায় যা সম্ভব তা সবই করা হয়েছিল। ওষুধ দিয়ে ঘর-বাড়ি, জামা-কাপড় জীবাণুমুক্ত করা হ'ত। রোগীর ব্যবহৃত জামা-কাপড় ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত ক'রে তারপর পুড়িয়ে ফেলা হ'ত। যে বাড়িতে রোগ দেখা দিত, সেই বাড়ির লোকজনদের একেবারে সঙ্গ-রোধ ক'রে রাখা হ'ত। এমন কি তাদের সঙ্গে করমর্দন করাও নিষিদ্ধ ছিল। মৃতদেহ সম্বন্ধেও যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করা হ'ল। কিন্তু ডাক্তার ও বিজ্ঞানীদের এতসব ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এই কালব্যাধি একের পর এক বলি সংগ্রহ ক'রে চলতো। অন্তত একটা জিনিস সবাই লক্ষ্য করতো, শীতের প্রারম্ভে চারদিকে বরফ পড়া শুরু হ'তেই এই ব্যাধির প্রকোপও একেবারে কমে যেত। তখন দেশবাসী যেন একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচতো। কিন্তু কয়েক মাস একটু নিশ্চিন্তে কাটাবার পরই জনসাধারণ সত্রাশে লক্ষ্য করতো যে, এই অজানা মৃত্যুর দূত সবার অলক্ষ্যে কখন যেন আবার কবর থেকে উঠে এসেছে, তার পাওনা আদায় ক'রে নেবার উদ্দেশ্যে। দীর্ঘদিনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞার ফলে জনসাধারণ এইটুকু নিশ্চিত বুঝেছিল যে, এই রোগ দেখা দিলে তা থেকে পরিত্রাণ পাবার সবচেয়ে সহজ এবং বোধকরি একমাত্র নিশ্চিত উপায় হ'ল সেই দেশের ত্রিসীমানা থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে যাওয়া।

দেশের অজ্ঞ এবং অক্ষম বিজ্ঞানীর দল যখন তাঁদের বুদ্ধি

এবং যুক্তি অনুসারে সব ব্যবস্থা ক'রেও পীত-জ্বর প্রতিরোধ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলেন, তখন সে দেশের প্রবীণ ডাক্তার কার্লো ফিন্‌লে (Carlos Finlay) ঘোষণা করলেন, "তোমরা সবাই ভুল করছো! পীত-জ্বর সংক্রমণের জন্যে দায়ী হ'ল একজাতের মশা।" কিন্তু কিউবার অধিবাসীদের একান্ত দুর্ভাগ্য যে দাম্ভিক বিজ্ঞানীদের দল ফিনলের এই মতবাদকে 'কল্পনা-বিলাসী পাগলা বুড়ো'-র প্রলাপ বলে হেসে উড়িয়ে দিল।

কমিশন একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে এগিয়ে যেতে লাগলেন। প্রথমেই আঠার জন রোগীর দেহে তন্ন তন্ন ক'রে জীবাণুর সন্ধান করা হ'ল, কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। অথচ এইসব রোগীর অনেকেই অল্প কয়েকদিন পরেই মারা গেল। বিজ্ঞানীরা একদিকে যেমন এইরূপ ব্যর্থ অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন, অন্যদিকে তখন একের পর এক রুগ্ন সৈন্য হাসপাতাল থেকে বিদায় নিচ্ছিল—সুস্থ হয়ে পায়ে হেঁটে নয়, অসাড় প্রাণহীন অবস্থায় শববাহীদের কাঁধে চড়ে! সবার অলক্ষ্যে থেকে এই রকম এক মর্মান্তিক উপায়ে জীবাণু তার অস্তিত্বের কথা সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছিল। এ থেকে বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত হ'ল এই যে, পীত-জ্বরের জীবাণু নিশ্চয় আছে, কিন্তু তা এতো ছোট যে, অত্যন্ত শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও তাকে দেখা সম্ভব হচ্ছে না।

এইভাবে ক্রমাগত বিফল হবার পর রীড সম্ভব অসম্ভব সকল মতবাদই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ক'রে দেখতে লাগলেন। এই সময় হঠাৎ সেই 'কল্পনা-বিলাসী পাগলা বুড়ো'-র কথা তাঁর মনে পড়ল। তিনি ভেবে দেখলেন, ইতিপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে যে, টেক্সাস জ্বর সংক্রমিত হয় এক রকম কীটের সাহায্যে, টেট্‌সি মাছি কুম্ভকর্ণ রোগের জীবাণু বহন করে, আর অ্যানোফিলিস্ মশা বহন করে ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু। কাজেই পীত-জ্বরও একজাতের মশার সাহায্যে সংক্রমিত হওয়া অসম্ভব নয়। কমিশন তাই এ বিষয়ে

ডাঃ ফিন্‌লের সঙ্গে আলোচনা করলেন। ফিন্‌লে আবার বেশ জোরের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব মত সমর্থন করলেন এবং তাঁদের কাছে খুব ছোট কাল কাল কয়েকটি মশার ডিম দিয়ে বললেন, "এ থেকেই প্রকৃত আসামীর সন্ধান পাওয়া যাবে।" বিজ্ঞানী ল্যাজিয়ার এদের নিয়ে গবেষণাগারে সযত্নে তা দেবার ব্যবস্থা করলেন। কিছুদিন পরেই এ থেকে রূপালী ডোরাকাটা কতকগুলি মশার বাচ্চা বেরিয়ে এলো। ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে বিজ্ঞানী নিশ্চিতরূপে বুঝলেন যে, এগুলি হ'ল স্টেগোমিয়া জাতের মশা (*Stegomyia fasciata*)। বর্তমানে এর বৈজ্ঞানিক নাম ঈডিস ঈজিপ্‌টি (*Aedes aegypti*)

চিত্র ২৩। পীতজ্বরের জীবাণুবাহী মশা (স্ত্রী)—ঈডিস ঈজিপটি *Aedes aegypti*) (সাতগুণ বিবর্ধিত)।

কিন্তু গবেষণার কাজে একটা কঠিন বাধা এসে উপস্থিত হ'ল! দেখা গেল, গিনিপিগ, খরগোশ প্রভৃতি প্রাণী, এমনকি মানুষের স্বগোত্র বানর জাতীয় কোন প্রাণীর দেহে জীবাণু প্রবেশ করিয়েও এই রোগ সৃষ্টি করা যায় না। ফিন্‌লের মতবাদ সত্য কিনা তা যাচাই ক'রে দেখতে হলে, এখন একমাত্র উপায়, গিনিপিগ বা ঐরূপ কোন প্রাণীর বদলে মানুষের দেহেই এই মারাত্মক পরীক্ষা চালাতে হবে! এইভাবে কয়েকজন মানুষ আত্মাহুতি দিলে তবেই হয়তো শত শত মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব হবে। বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে

বিজ্ঞানীরা শত শত জীব হত্যা করেন, তা আমরা জানি, কিন্তু এইরূপ অনিশ্চিত পরীক্ষায় মানুষ বলি দেবার কথা এর আগে আর কোন দিনই শোনা যায়নি। সমস্যা গুরুতর হলেও মানুষ কোন দিন ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসতে জানে না। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না।

এই অবস্থায় রীড কমিশনের এক সভায় বললেন, "সবার আগে কমিশনের সভ্যরা নিজেরাই যদি ভলান্টিয়ার বা স্বেচ্ছাসেবকরূপে এগিয়ে আসেন এবং পীতজ্বরের রোগীর রক্ত পান করেছে এইরূপ মশাকে তাঁদের দেহে দংশন করতে দেন, তা হলে তাঁদের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও অনেকেই হয়তো সাহস ক'রে এগিয়ে আসবেন।" এই প্রস্তাব শুনে ল্যাজিয়ার এবং ক্যারোল—এই দু'জন সদস্যই সঙ্গে সঙ্গে এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন, যদিও তাঁরা জানেন যে, শত্রুর বুলেটের চেয়েও এই মশার কামড় অনেক বেশী মারাত্মক হতে পারে।

ইতোমধ্যে কর্তব্যের খাতিরে রীডকে ওয়াশিংটন যেতে হ'ল। কিন্তু যাবার আগে তিনি কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের এই দুঃসাহসিক পরীক্ষা শুরু ক'রে দেবার পরামর্শ দিয়ে গেলেন, যদিও তাঁরা জানেন যে, কর্তৃপক্ষ এইরূপ নরহত্যায় ব্রতী হ'বার কোনো অধিকার তাঁদের দেন নি। তাই ল্যাজিয়ার এবং ক্যারোল খুব সাবধানে এবং অত্যন্ত গোপনে সব ব্যবস্থা ক'রতে লাগলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সাতজন স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া গেল। ল্যাজিয়ার কতকগুলি মশাকে গুরুতর পীত-জ্বরাক্রান্ত রোগীর রক্ত পান করালেন এবং পরে সেগুলিকে নিজদেহে এবং ঐ সাতজন স্বেচ্ছাসেবকের দেহে দংশন করতে দিলেন। কিন্তু ল্যাজিয়ার নিতান্ত হতাশ হয়ে দেখলেন যে এতে কারও কিছুই হ'ল না। ক্যারোল তখন ল্যাজিয়ারকে অনুরোধ করলেন, যাতে এবারে তাঁর দেহে এই পরীক্ষা চালানো হয়। ২৭শে আগস্ট একটি মশাকে পর পর চারটি গুরুতর রোগীর রক্তপান করানো হ'ল এবং তারপর তাকে

ক্যারোলের হাতে দংশন করতে দেওয়া হ'ল। এবারে ফল পাওয়া গেল। দু'দিন পরে ক্যারোল অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন এবং আরও দু'দিন পরে তিনি রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। পরীক্ষায় নিযুক্ত মশার কামড়ে তিনিই সর্বপ্রথম রোগগ্রস্ত হলেন। ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ যে, তিনি জীবন্মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে কয়েকদিন কাটাবার পর আবার ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন।

এবারে নূতন তিনজন স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা হ'ল এবং তাদের দেহে এই পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করা হ'ল। এবারে মশা নেওয়া হ'ল চারটি—ক্যারোলের দেহে যে মশাটি জীবাণু সংক্রমিত করেছিল, সেইটি এবং নূতন আরও তিনটি মশা, যারা ইতোমধ্যে ছয়জন গুরুতর রোগীর রক্তপান করেছে। এবারে তিনজনের মধ্যে একজনের দেহে পীত-জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পেল।

এইসব পরীক্ষায় নূতন আলোর সন্ধান পাওয়া গেল। কিন্তু ফলাফল দেখে ল্যাজিয়ার খুব সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। মশার কামড়ে এগারজন মানুষের মধ্যে মাত্র দু'জন মানুষের দেহে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু তারা আগে থেকেই বিপজ্জনক এলাকায় রয়েছেন। কাজেই পরীক্ষায় নিযুক্ত মশা-ই যে তাদের দেহে জীবাণু সংক্রামিত করেছে তার নিশ্চয়তা কি? অল্প দিনের মধ্যেই একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনার ভেতর দিয়ে এই প্রশ্নেরও চরম মীমাংসা হয়ে গেল।

১৩ই সেপ্টেম্বর ল্যাজিয়ার পীত-জ্বরের ওয়ার্ডে কতকগুলি মশাকে রোগীদের রক্তপান করাতে ব্যস্ত ছিলেন। এই সময় একটা জংলা মশা হঠাৎ তাঁর হাতের উপর বসল এবং তার রক্ত পান করতে লাগলো। কাজের ব্যাঘাত হবে বলে তিনি এটা গ্রাহ্য করলেন না। ভাবলেন, "এতে আর কি হবে? এটা জীবাণুবাহী মশা না হওয়াই সম্ভব।" কিন্তু তিনি ধারণাও করতে পারেননি যে, এই মশাটি ইতোমধ্যে হাসপাতালের বহু গুরুতর ও মুমূর্ষু

রোগীর রক্ত পান ক'রে সাক্ষাৎ যম সদৃশ্য হয়ে রয়েছে। এই সামান্য অবহেলার চরম শাস্তি তাকে গ্রহণ করতে হ'ল অল্পদিনের মধ্যেই। ১৯শে সেপ্টেম্বর ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালের পীত-জ্বরের ওয়ার্ডে সরিয়ে নেওয়া হ'ল, এবং ২৫শে সেপ্টেম্বরই তিনি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে পড়লেন। অদৃষ্টের এমনই নির্মম পরিহাস যে, এই জীবন-মরণ পরীক্ষায় প্রথম বলি হলেন কমিশনেরই একজন সদস্য, বিজ্ঞানী ল্যাজিয়ার।

রীড কিউবাতে ফিরে এলেন। ল্যাজিয়ারের অকাল-মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছেন। কিন্তু এর ফলে তাঁর ধারণা আরও বদ্ধমূল হ'ল যে, স্টেগোমিয়া মশকীই প্রকৃতপক্ষে পীত-জ্বর সংক্রমণের জন্য দায়ী। তবে ত্রুটিহীন পরীক্ষার সাহায্যে এর প্রমাণ দিতে হবে। এতদিনে কর্তৃপক্ষ তাঁর পরিকল্পনা সমর্থন করলেন, এবং এ বিষয়ে যথাকর্তব্য স্থির করতে তাঁকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হ'ল। এ ছাড়া তাঁকে প্রচুর অর্থ দেওয়া হ'ল, যাতে অভাবগ্রস্ত মানুষকে অর্থে বশীভূত ক'রে এই মারাত্মক পরীক্ষায় ভলান্টিয়ার হিসেবে নিযুক্ত করা যায়।

পরীক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে ঘোষণা প্রচার করার সঙ্গে সঙ্গে কিসেন্‌জার এবং মোরান নামে দু'জন আমেরিকান রীডের সঙ্গে দেখা ক'রে বললেন যে, তাদের উপর এই পরীক্ষা চালানো যেতে পারে। রীড তাঁদের ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলেন যে, এই পরীক্ষায় তাঁদের জীবন সংশয় হওয়া, এমনকি মৃত্যু হওয়াও বিচিত্র নয়। তবে তাঁরা এইরূপ বিপদের ঝুকি নিচ্ছেন বলে সৎসাহসের পুরস্কার স্বরূপ তাঁদের প্রত্যেককে ২০০ ডলার (তখনকার হিসেবে প্রায় এক হাজার টাকা) ক'রে দেওয়া হবে। এর উত্তরে তাঁরা দু'জনেই বললেন, "আমরা কোনরূপ ক্ষতিপূরণ গ্রহণ ক'রব না, একমাত্র সেই শর্তেই স্বেচ্ছাসেবকরূপে কাজ করতে প্রস্তুত আছি।" তাঁদের অসীম সাহস এবং উদার মনের

পরিচয় পেয়ে রীড অভিভূত হয়ে পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের অভিবাদন জানালেন।

এই ঐতিহাসিক পরীক্ষার জন্য কিমাডো থেকে মাইল খানেক দূরে একটি ক্যাম্প বসানো হ'ল। প্রথম শহীদের নামানুসারে তার নাম দেওয়া হ'ল 'ক্যাম্প ল্যাজিয়ার'। পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য কিসেনজার ও মোরানকে একটি ঘরে সঙ্গ-রোধ ক'রে রাখা হ'ল, যাতে পরীক্ষার আগেই অন্য কোন উপায়ে তাঁদের দেহে রোগজীবাণু প্রবেশ করতে না পারে। ৫ই ডিসেম্বর কিসেন্‌জারের দেহে দংশন করার জন্য যে পাঁচটি মশা নিযুক্ত করা হ'ল তাদের অন্ততঃ দু'টি ইতিপূর্বে এমন লোককে কামড়েছে যারা এর মধ্যে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে পড়েছে। দংশনের পাঁচদিন পরেই কিসেন্‌জার গুরুতর পীত-জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। তবে তিনি আবার ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন।

এইসব আত্মত্যাগী বীর আমেরিকানদের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক আসতে লাগল। এবারে কিউবায় সদ্য আগত পাঁচজন স্প্যানিয়ার্ড এই পরীক্ষায় নিযুক্ত হ'ল। মশার কামড়ে এদের মধ্যে চারজনের দেহেই পীত-জ্বর সংক্রামিত হ'ল। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় এরচেয়ে বেশী সাফল্য লাভের আশা করা যায় না। এই বিদেশী স্পেনিয়ার্ডরা এর আগে কোনদিনও পীত-জ্বর-এলাকার আশেপাশেও ছিল না। তাছাড়া পরীক্ষার আগে ঘন তারের জাল দিয়ে ঘেরা একটি ঘরের মধ্যে তাদের মশার সংস্পর্শ এড়িয়ে রাখা হয়েছিল। কাজেই এখন নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, স্টেগোমিয়া জাতীয় মশকীর দংশনের ফলেই পীত-জ্বর সংক্রমিত হয়।

বিজ্ঞানী রীড কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি সব রকম সন্দেহ নিরসনের জন্য আরও ভয়াবহ পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর নির্দেশে কয়েকজন সেচ্ছাসেবক রোগীর। ভেদ-বমি মাখানো পুতিগন্ধময় বিছানা-বালিস, জামা-কাপড় প্রভৃতি ব্যবহার ক'রে

তারের জাল দিয়ে ঘেরা একটি ঘরে দিনের পর দিন কাটালো, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা সম্পূর্ণ সুস্থ রইল। আবার আর একদল স্বেচ্ছাসেবক অনুরূপ অবস্থায় সত্মৃতের জামা-কাপড় প'রে এবং রোগীর রক্ত-মাখানো বিছানায় রাতের পর রাত শুয়ে. কাটিয়েও রোগাক্রান্ত হ'ল না। এইভাবে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল যে, স্টেগোমিয়া মশকীর কামড় ছাড়া অন্য কোন উপায়েই পীত-জ্বর সংক্রামিত হওয়া সম্ভব নয়।

এইভাবে রীডের নেতৃত্বে কতকগুলি দুঃসাহসী এবং আত্মত্যাগী আমেরিকানের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত ফিন্‌লের মতবাদই সত্য বলে প্রমাণিত হ'ল। রীডের একান্ত সৌভাগ্য যে, এই জীবন-মরণ খেলায় মাত্র একজনের আত্মাহুতিতেই অভিপ্রেত ফল লাভ করা গেল। এ বিষয়ে সত্যের সন্ধান পাওয়া মাত্র আমেরিকানরা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ ক'রে মৃত্যুর অগ্রদূত স্বরূপ স্টেগোমিয়া মশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রল! তাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় এই জাতের মশা এবং সেই সঙ্গে পীত-জ্বরের জীবাণু পৃথিবী থেকে একরূপ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বলা চলে। আরও কয়েক বছর ধরে এই অভিযান সক্রিয় রাখতে পারলে হয়তো অনেকের কাছেই পীত-জ্বরের এই কাহিনী রূপকথার মতোই কাল্পনিক বলে মনে হবে।

বলা বাহুল্য, পানামা অঞ্চলেও ডাক্তার পাঠানো হ'ল। তাঁরা সেখানে গিয়ে প্রথমেই খানা-ডোবা ভরাট করলেন, মশা তাড়ালেন এবং সেখানকার পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত ক'রলেন। তারপর ইঞ্জিনিয়াররা গিয়ে নির্বিঘ্নে খাল কাটার কাজ শেষ ক'রলেন।

আমেরিকানরা কিন্তু রীড, ল্যাজিয়ার এবং স্বেচ্ছাসেবকদের কারও কথাই ভুলে গেল না। তারা কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ রীড, ল্যাজিয়ার এবং ক্যারোল—এদের প্রত্যেকের বিধবাকে বাৎসরিক দেড় হাজার ডলার (তখনকার হিসেবে, প্রায় সাত হাজার টাকা) হিসেবে বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা ক'রল। আর স্বেচ্ছাসেবকদের আদর্শ স্বরূপ কিসেন্‌জারকে নগদ প্রায় ৫০০ টাকা এবং একটি সোনার ঘড়ি উপহার দিয়ে আমেরিকানরা তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা জানালো।

আন্ত্রিক রোগ

আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগকে সাধারণভাবে আন্ত্রিক রোগ (Gastro-enteritis) বলা হয়। কারণ, এইসব রোগের জীবাণু দ্বারা আমাদের অন্ত্র আক্রান্ত হয়। তবে অন্ত্র আক্রমণকারী বিশেষ বিশেষ রোগ-জীবাণুর নামানুসারে রোগের বিশেষ নামকরণ হয়ে থাকে। যেমন, অ্যামিবার নামানুসারে রোগের নাম অ্যামিবায়াসিস্ (Amoebiasis), জিয়ারডিয়ার নামে জিয়ারডিয়াসিস্ (Giardiasis), শিগালা ব্যাসিলাসের নামে শিগালাসিস্ (Shigallasis) ইত্যাদি।

আন্ত্রিক রোগে বারবার পায়খানা হয়। আর এইসব রোগের জীবাণু, রোগীর মলের সঙ্গে রোগীর অন্ত্র থেকে বাইরে পরিত্যক্ত হয়। তারপর খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে তা অন্য সুস্থ মানুষের দেহে প্রবেশ করে। বিজ্ঞানীর মতে, এর নাম 'পায়ু থেকে মুখে সংক্রমণ' (Anus to mouth infection)। একথা সকলেরই মনে রাখা দরকার যে, আমাদের অসাবধানতার ফলে, কোন না কোন ভাবে, রোগীর মলের কিছু অংশ আমাদের পেটে যাওয়ার ফলেই আমাদের আন্ত্রিক রোগ হয়ে থাকে। সেই বুঝে এবিষয়ে সকলেরই প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

এই কারণে প্রত্যেক নাগরিকেরই মল অপসারণের সুব্যবস্থার কথা সর্বাগ্রে বিবেচনা করা দরকার। কারণ, মল-অপসারণের সুব্যবস্থা না থাকলে, এইসব রোগ-জীবাণু সহজেই সংক্রামিত হতে পারে, এবং তারফলে অল্প সময়ের মধ্যেই রোগের মহামারী সৃষ্টি হতে পারে। শহরে সকল নাগরিকের জন্য সামগ্রিকভাবে মল-অপসারণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, কিন্তু পল্লীগ্রামে তা হয় না। পল্লীগ্রামে প্রত্যেক পরিবারের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করতে হয়। এই

সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার, যাতে মলমূত্র থেকে পুকুর বা কুয়োর জল দূষিত হতে না পারে। খাদ্য এবং পানীয় সম্পর্কেও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

মাছি এবং পিঁপড়ে আমাদের পরম শত্রু। এরা আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি আন্ত্রিক রোগের জীবাণু বহন ক'রে, এবং ঐসব রোগ সংক্রমিত ক'রে, আমাদের পরম অনিষ্ট সাধন করে। মাছি শুধু নোংরা জায়গায় কিংবা শুধু ঘর-বাড়ির মধ্যে থাকলে, আমাদের এতো ক্ষতি হ'ত না। মাছির কৌতূহল সীমাহীন। তাই সে কর্মব্যস্তভাবে উড়ে উড়ে অবিরত মলমূত্র, থুথু, নোংরা আবর্জনা প্রভৃতির উপর বসছে, আবার খানিকক্ষণ পরেই হয়তো
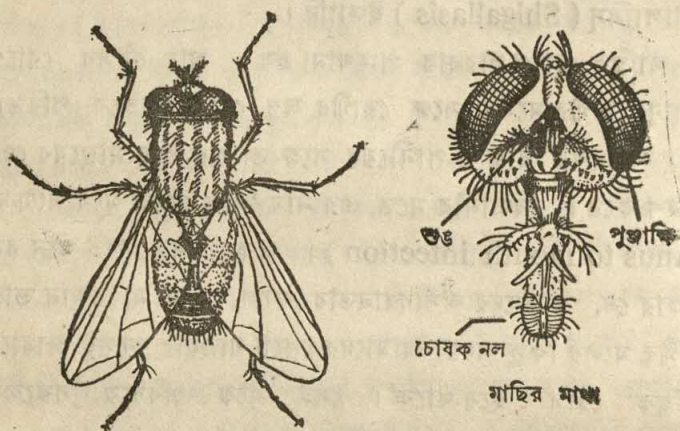
চিত্র ২৪। একটি মাছি এবং মাছির মাথা (বিবর্ধিত)।

রান্নাঘরে এসে খাদ্য ও পানীয়ের উপর বসছে। এর ফলে শত-সহস্র রোগ-জীবাণু মাছির পা অথবা গায়ের সঙ্গে লেগে এসে খাদ্য, পানীয় প্রভৃতির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। এজন্য এদের সাহায্যে অতি সহজেই নানারকম ব্যাধি সংক্রামিত হয়ে থাকে।

আর একটা কথা। মাছির মাথার নীচের দিকে স্পঞ্জের মতো নরম এবং মাংসল একটি শুঁড় বা চোষক-নল (proboscis) আছে। এই শুঁড়ের সাহায্যে মাছি তরল পদার্থ চুষে নিতে পারে।

মাছি কোনো কঠিন খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। তবে চিনি, গুড় ইত্যাদি কঠিন খাদ্য থাকলে, মাছি লালার সাহায্যে তা গুলে নিয়ে তারপর শুঁড়ের সাহায্যে চুষে নেয়। সুতরাং, এভাবেও অনেক জীবাণু খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে মিশে যায়। মাছি দ্বারা সংক্রমণ বন্ধ করতে হলে, খাদ্য ও পানীয় সবসময় ভাল ক'রে ঢেকে রাখা দরকার। আর পিঁপড়ের উৎপাত থেকে রক্ষা পেতে হ'লে, মিষ্টি খাদ্যদ্রব্য কোনো পাত্রে রেখে তা জলের উপর রাখা উচিত। তাহলে তাতে পিঁপড়ে ধরতে পারবে না।

আন্ত্রিক রোগ প্রধানতঃ জল-বাহিত। এজন্য সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা দরকার। সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা হ'ল, জল ফুটিয়ে এবং ঠাণ্ডা ক'রে তারপর পান করা।

নোংরা পরিবেশে বাসি-পচা খাবার খাওয়া উচিত নয়। তাছাড়া প্রতিবার পায়খানা করার পর, এবং হাত দিয়ে কিছু খাওয়ার আগে, সাবান দিয়ে ভাল ক'রে হাত ধুয়ে নিতে হবে। বাসনপত্র ফুটন্ত জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে নিলে সবচেয়ে ভাল হয়। আর তা সম্ভব না হলে, বিশুদ্ধ জল দিয়ে ভাল ক'রে ধুয়ে নেওয়া উচিত। যিনি রান্না করবেন, তাঁকেও প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। তাহলে আন্ত্রিক রোগ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে।

আমাশয় (Dysentery) :

আমাশয় জল-বাহিত সংক্রামক ব্যাধি। আমাশয় রোগে (Dysentery) অন্ত্রে যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতের সৃষ্টি হয়, এবং তার ফলে বার বার মলত্যাগ করতে হয়; মলের সঙ্গে শুধু শ্লেষ্মা বা আম (mucus) অথবা আম ও রক্ত দুই-ই পড়ে (গ্রীক: *Dys*—implying badness, *entera*—intestine)। 'অ্যামিবা' এবং 'ব্যাসিলাস'—এই দু'জাতের জীবাণু থেকে দু'রকম আমাশয় রোগ হয়ে থাকে।

ব্যাসিলাস-জনিত আমাশয় (Bacillary dysentery) অত্যন্ত মারাত্মক রোগ। এতে জ্বর হয়, এবং পেট কামড়ানিসহ বারবার পাতলা পায়খানা হয়, সেই সঙ্গে শ্লেষ্মা বা আম (mucus) এবং রক্ত পড়ে। শিগা (Shiga), ফ্লেক্স্নার (Flexner), সোন (Sonne) প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা কয়েক প্রকার ব্যাসিলাস সনাক্ত করতে সক্ষম হ'ন, যেগুলি এইরূপ অবস্থার জন্য দায়ী। জীবাণু সংক্রামিত হওয়ার পর সাতদিনের মধ্যে রোগের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়।

উপযুক্ত মাত্রায় সাল্ফা-ওষুধ (Sulfa-drugs) (যেমন—সালফা-গুয়ানিডিন, থ্যালাজোল ইত্যাদি), ফুরোক্সোন, কিংবা অ্যান্টিবায়োটিক (যেমন—জেন্টামাইসিন) খেলে এই রোগ সেরে যায়।

অ্যামিবা-জনিত আমাশয় (Amoebic dysentery) বা অ্যামিবায়াসিস্ (Amoebiasis) তত মারাত্মক নয়। তবে কষ্টকর নিশ্চয়ই। এই রোগেও পেট কামড়ানিসহ বার বার পায়খানা হয়, সেই সঙ্গে শুধু শ্লেষ্মা বা আম (mucus) অথবা আম ও রক্ত দুই-ই পড়ে। তবে এক্ষেত্রে সাধারণতঃ জ্বর হয় না। এ রোগের জন্য দায়ী আমিবার নাম 'এণ্টামিবা হিস্টোলিটিকা (*Entamoeba histolytica*)। এরূপ আমাশয়ের অব্যর্থ ওষুধ হ'ল এমিটিন ইন্‌জেক্‌শন। এছাড়া এণ্টেরোকুইনল, এণ্টোবেক্স, এমিক্লিন, মেট্রোজিল প্রভৃতি ট্যাবলেট, অথবা নানাপ্রকার অ্যান্টিবায়োটিক ক্যাপ্সুল (যেমন—টেরামাইসিন, ক্লোরোস্ট্রেপ, এণ্টেরোস্ট্রেপ ইত্যাদি) খেলে এই রোগ সেরে যায়।

এই সময় রোগীকে টাটকা, লঘুপাক অথচ বলকারক পথ্য দেওয়া উচিত। রোগীকে প্রচুর পরিমাণে ঘোল খাওয়ানো দরকার, তাতে উপকার হয়।

যে কোন রকম আমাশয় রোগে বারবার পায়খানা হয় ব'লে

রোগীর দেহ থেকে জলীয় অংশ এবং লবণ-জাতীয় পদার্থ বেরিয়ে যায়। সুতরাং, রোগের সূচনা থেকেই দেহে জল এবং লবণ-জাতীয় পদার্থের ঘাটতি পূরণ করার দিকে নজর দিতে হবে। এজন্য 'ইলেক্‌টোরাল', বিশুদ্ধ জলে গুলে, বারবার পান করাতে হবে। এইরূপ পানীয় নিজেরাই তৈরি ক'রে নেওয়া যায়। এজন্য এক গ্লাস বিশুদ্ধ জলে আধ চামচ নুন, আধ চামচ খাবার সোডা (সোডিয়াম বাই-কার্বনেট), দু' চামচ চিনি এবং একটু লেবুর রস ভাল ক'রে মিশিয়ে নিতে হবে। এইরূপ পানীয় এক গ্লাস ক'রে এক ঘণ্টা অন্তর অন্তর খেতে দিতে হয়। এতেই দেহের জল এবং লবণ-জাতীয় পদার্থের ঘাটতি সহজেই পূরণ হয়ে যায়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই রোগ পুরাতন ব্যাধিতে (Chronic amoebiasis) পরিণত হয়। তাতে বারবার রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর লিভার বা যকৃত বড় হওয়া, কোলাইটিস্ প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। এই অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে রোগ নিরাময় করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কারণ, এই অবস্থায় জীবাণু রক্ষাকারী আবরণযুক্ত অনেক সিস্ট (Cyst) বা বীজরেণু উৎপন্ন করে। এই সিস্ট পাকরসের অম্লতা সত্ত্বেও অক্ষত থাকে এই সিস্ট বা বীজরেণু যখন পেটে যায় তখন আন্ত্রিক রসের ক্রিয়ায় বাইরের আবরণ গলে যায়, এবং উন্মুক্ত জীবাণু অন্ত্রে গিয়ে বাসা বাঁধে এবং রোগ সৃষ্টি করে। নোংরা থাকলে, হাত না ধুয়ে খেলে, ক্রনিক রোগী বারবার নিজেকে নিজেই রোগ সংক্রমিত করতে পারে (Auto-infection)। এজন্য বেশ কিছু দিন ধরে ভাল ক'রে চিকিৎসা করা দরকার। আর এই রোগের পুনরাক্রমণ যাতে না ঘটে সে বিষয়েও সব সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। যেমন, সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে, নখ খুব ছোট ক'রে কাটতে হবে, হাত সাবান দিয়ে ধুতে হবে ইত্যাদি।

রোগীর মলে এই রোগের জীবাণু থাকে, এবং তা থেকেই খাদ্য

ও পানীয় দূষিত হয়। সাধারণতঃ মাছি ও পিঁপড়ের সাহায্যে এই রোগ ছড়ায়। দূষিত খাদ্য ও পানীয় পেটে গেল, এইসব জীবাণু অন্ত্রে গিয়ে বাসা বাঁধে। অতএব জল ফুটিয়ে খেলে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে, স্বাস্থ্যবিধিগুলি মেনে চললে, এবং সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল থাকলে, সহসা এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

আমাশয় রোগীকে স্বতন্ত্র রাখতে হবে। রোগীর মল সর্বদা জীবণু-নাশক ওযুধ দিয়ে জীবাণুশূন্য ক'রে তারপর মাটি চাপা দিয়ে রাখতে হবে। এ থেকে যাতে পানীয় জল দূষিত হতে না পারে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে! রোগীর নোংরা জামা-কাপড়ও জীবাণু-নাশক ওযুধে ডুবিয়ে শোধন ক'রে, অথবা সাবান ও সোডার জলে ডুবিয়ে ফুটিয়ে, তারপর কেঁচে নিতে হবে।

একদিকে রোগীকে যেমন সাবধানে রাখতে হবে, অপরদিকে বাড়ির সবাইকেও যথাসাধ্য রোগীর সংস্রব এড়িয়ে চলতে হবে। যিনি রান্না করেন তিনিও রোগ ছড়াতে পারেন। কাজেই তাকেও প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

মাছি, পিঁপড়ে ইত্যাদির উপদ্রব দূর করতে হবে। এজন্য রান্নাঘর এবং খাবার জায়গা রোজ ফিনাইল দিয়ে ভাল ক'রে ধোয়া দরকার। তাছাড়া খাদ্য এবং পানীয় সর্বদা এমনভাবে ঢেকে রাখতে হবে, যাতে তাতে মাছি না পড়ে, কিংবা পিঁপড়ে না ধরে।

পানীয় জলের কূয়ো বা পুকুর স্বতন্ত্র রাখা উচিত। তবে পানীয় জল সর্বদা ফুটিয়ে পান করাই বাঞ্ছনীয়। তাহলে রোগ সংক্রামিত হওয়ার সম্ভবনা বিশেষ থাকে না।

কলেরা (Cholera) :

কলেরা একটি মারাত্মক রোগ এবং প্রায়ই মহামারীরূপে দেখা দেয়। এর ফলে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যায়। এটিও প্রধানতঃ জল-বাহিত ব্যাধি।

এই রোগের জন্য দায়ী জীবাণুর নাম 'ভিবরিও কলেরি' (*Vibrio*

cholerae) অথবা 'স্পাইরিলাম কালেরি' (*Spirillum Cholerae*)। এই জীবাণু দেখতে অনেকটা 'কমা' চিহ্নের মতো, তাই একে অনেক সময় 'কমা-ব্যাসিলাস'-ও বলা হয়। অপেক্ষাকৃত উষ্ণ আবহাওয়ায়, এই জীবাণু দ্রুত বৃদ্ধি পায়, এজন্য আমাদের দেশে শীতের চেয়ে গরমের দিনেই এই রোগের প্রকোপ বেশী দেখা যায়। এই জীবাণু কলেরা রোগীর মলমূত্র, বমি এবং অদগ্ধ শবে প্রচুর পরিমাণে থাকে। আর মাছি, পিঁপড়ে প্রভৃতির সাহায্যে খাদ্য ও পানীয় জীবাণু-দুষ্ট হয়। খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে কলেরা-জীবাণু পেটে গেলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, অর্থাৎ ভেদবমি এবং খিঁচুনি আরম্ভ হয়। ক্রমে তলপেটে খিলধরা, প্রস্রাব বন্ধ হওয়া প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। কলেরা-জীবাণু অন্ত্র মধ্যে দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি করে, এবং বিষক্ষরণ দ্বারা অন্ত্রের অধিচ্ছদের ক্ষতি সাধন করে। এজন্যই কলেরা রোগে প্রচুর পরিমাণে জলীয় পদার্থ অন্ত্র মধ্যে নির্গত হয়। আর বারবার পায়খানা হয় বলে রোগীর দেহ থেকে জলীয় অংশ এবং লবণ-জাতীয় পদার্থ দ্রুত বেরিয়ে যায়। এর ফলে রক্ত জমাট বাঁধার প্রবণতা দেখা দেয়, তাই খিঁচুনি আরম্ভ হয়। সুতরাং, এক্ষেত্রেও জল ও লবণ-জাতীয় পদার্থের ঘাটতি পূরণ করার দিকে বিশেষ নজর দিতে হয়। এজন্য পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতিতে সরবত তৈরি ক'রে তা এক ঘণ্টা অন্তর অন্তর রোগীকে খাওয়াতে হয়। তাহলে বিপদের সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

বাড়িতে কলেরা-রোগীর চিকিৎসা করা খুব কঠিন। তাছাড়া এই রোগ অত্যন্ত সংক্রামক, তাই রোগ-সংক্রমণের ভয়ও আছে। এজন্য রোগ প্রকাশ পাওয়া মাত্র রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে পৃথক ক'রে রাখতে হবে। খিঁচুনি আরম্ভ হলে, রোগীকে অবিলম্বে 'স্যালাইন' ইন্‌জেক্‌শন দিতে হবে। কতকগুলি সাল্‌ফা-ওষুধ এবং অ্যান্টিবায়োটিক এই রোগে খুবই কার্যকরী ব'লে প্রমাণিত হয়েছে।

কোনো বাড়িতে বা গ্রামে কলেরা রোগ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে

রোগীকে আলাদা ক'রে ফেলতে হবে। কলেরা-প্রতিষেধক টিকা নেওয়া থাকলে ভাল। নতুবা বড়ির সবাইকে এবং শুশ্রূষাকারীদের এই টিকা দিতে হবে। রোগীকে যেমন সাবধানে রাখতে হয়, অন্যান্য সবাইকেও তেমনি খুব সাবধানে থাকতে হয়। রোগীর মলমূত্র, বমি, কাপড়-চোপড় সবই জীবাণু-নাশক ওষুধ দিয়ে জীবাণু-শূন্য ক'রে তারপর গভীর গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে। নদ-নদী, খাল-বিল বা পুকুরের জলে এসব কখনই ধোয়া উচিত নয়, কারণ তাহলে ঐসব জল দূষিত হয়ে পড়বে। এইসময় কোনো জলাশয় যাতে জীবাণু-দুষ্ট না হয়, সেজন্য প্রত্যেকটি জলাশয়ের উপর কড়া নজর রাখতে হবে। এসময় পানীয় জল ফুটিয়ে শোধন ক'রে তারপর পান করা উচিত।

মাছি, পিঁপড়ে ইত্যাদি এই রোগ ছড়াতে পারে। এজন্য ডি. ডি. টি., ফিনাইল ইত্যাদি ব্যবহার ক'রে এদের উপদ্রব একেবারে বন্ধ করতে হবে।

খাদ্যদ্রব্য সর্বদা এমনভাবে ঢেকে রাখতে হবে, যাতে তাতে মাছি না পড়ে, কিংবা পিঁপড়ে না ধরে। এই সময় টাটকা, সুপাচ্য ও পুষ্টিকর খাবার ছাড়া কোনরকম বাসি, পচা খাবার খাওয়া উচিত নয়।

বাজার থেকে যেসব তরিতরকারি আনা হবে, সেগুলি পটাশ পারম্যাঙ্গানেট মিশ্রিত জল দিয়ে ধুয়ে নিলে ভাল হয়। সব সময় মনে রাখা দরকার যে, নোংরা খাবার এবং জলই এই রোগ বিস্তারের প্রধান কারণ।

শুশ্রূষাকারীরা এই রোগ ছড়াতে পারেন। কাজেই তাঁদের এবিষয়ে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। তাঁরা সম্পূর্ণ আলাদাভাবে থাকবেন। তাঁদের হাতের নখ প্রতিদিন কেটে ফেলতে হবে। তাঁরা শুশ্রূষার পর জীবাণু-নাশক ওষুধ দিয়ে এবং জীবাণু-নাশক সাবান দিয়ে হাত-পা ভাল ক'রে ধুয়ে তারপর বাইরে আসবেন।

কলেরা জীবাণু থেকেও টিকা (ইন্‌জেকশন) তৈরি হয়েছে। রোগাক্রান্ত হওয়ার আগে, এই টিকা নিলে শরীরে রোগ-প্রতিরোধক শক্তি জন্মায়। বছরে অন্ততঃ একবার ক'রে কলেরার টিকা নেওয়া উচিত।

টাইফয়েড বা আন্ত্রিক জ্বর (Typhoid Fever) :

টাইফয়েড বা আন্ত্রিক জ্বরও জল-বাহিত সংক্রামক ব্যাধি। এটি অন্ত্রের রোগ, এবং 'স্যালমনেলা টাইফি' (*Salmonella typhi*) নামক ব্যাসিলাস্ এই রোগের কারণ। খাদ্য ও পানীয়—বিশেষ ক'রে জল দুধ, বরফ, আইসক্রীম ইত্যাদির সঙ্গে এই রোগের জীবাণু পেটে যায়। এই জীবাণু ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছালে সেখানকার ঝিল্লী-পৃষ্ঠের বৃহদণুভোজী কোষ (Phagocytic cell) জীবাণুদের গ্রাস করে। এখান থেকে জীবাণুগুলি স্থানীয় লাসিকা-টিস্যুতে উপস্থিত হয়। দিন দশেক পরে জীবাণুবাহী ভোক্তা কোষগুলি বিনষ্ট হয়, এবং অজস্র মুক্ত জীবাণু রক্তস্রোতে মিশে যায়। এই সঙ্গেই প্রস্তুতি-পর্বের (Incubation period) সমাপ্তি ঘটে, এবং আক্রান্ত ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ে। রক্তের এই জীবাণু-জর্জরিত অবস্থা চলে প্রায় সপ্তাহকাল ধরে। এই সময় রোগীর দেহের উত্তাপ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। তাই দেখা যায়, রোগের প্রথম দিকে বিশেষ ধরণের জ্বর হয়। এই জ্বর দিন দিন যেন সিঁড়ি বেয়ে ধাপে ধাপে উপর দিকে উঠতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে থাকতে পারে মাথার যন্ত্রণা ও কোষ্ঠকাঠিন্য। দ্বিতীয় সপ্তাহে অন্ত্রে ক্ষত দেখা দেয়, এবং রোগীর মলের সঙ্গে জীবাণু নিষ্ক্রান্ত হতে থাকে। এই সময় তলপেটে ব্যথা, দাস্ত, রক্তস্রাব, বিকার প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এর ফলে রোগীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ে।

এই রোগ অত্যন্ত মারাত্মক। রোগীর রক্ত পরীক্ষা করলে, এই জীবাণুর অস্তিত্ব সহজেই বোঝা যায়। ভরসার কথা এই যে, আজকাল ভাল ভাল অ্যান্টিবায়োটিক বা জীবাণু-শাসক আবিষ্কৃত

হয়েছে, যেমন—ক্লোরোমাইসিটিন। এরূপ ওষুধের সাহায্যে টাইফয়েড রোগীকে সহজেই সুস্থ ক'রে তোলা যায়।

এই রোগের সংক্রমণ বন্ধ করতে হলে, জল, দুধ ইত্যাদি ফুটিয়ে তারপর পান করা দরকার। ঠাণ্ডা সরবত, আইসক্রীম প্রভৃতি থেকেও এই রোগ সংক্রমিত হতে পারে। সুতরাং যেখানে-সেখানে এসব না খাওয়াই ভাল।

খাদ্য ও পানীয় এমনভাবে ঢেকে রাখতে হবে যাতে মাছি না পড়ে বা পিঁপড়ে না ধরে। খাদ্যদ্রব্য গরম থাকতেই খাওয়া উচিত। বাসি-পচা খাবার খাওয়া উচিত নয়।

টাইফয়েড-রোগীকে স্বতন্ত্রভাবে ও সাবধানে রাখতে হয়। তার মলমূত্র ও থুথুতে জীবাণু থাকে। কাজেই সে-সব ওষুধ দিয়ে জীবাণুশূন্য ক'রে তারপর দূরে গর্তে মাটি চাপা দেওয়া উচিত। রোগীর নোংরা জামা-কাপড় ধুয়ে কেউ পুকুর, কুয়ো প্রভৃতির জল যাতে জীবাণু-দুষ্ট করতে না পারে, সে বিষয়েও সকলের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

এ সময় বাড়ির সকলে টাইফয়েডের টিকা নেবে, এবং যথাসাধ্য রোগীর সংস্রাব এড়িয়ে চলবে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, এই রোগ-জীবাণু দেহে প্রবেশ করার পর টিকা নিলে, তার ফল ভাল হওয়ার চেয়ে মন্দ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী থাকে। তবে প্রতি বছর টাইফয়েডের টিকা নিলে এই রোগ হওয়ার আশঙ্কা বড় একটা থাকে না।

আর একটা কথা। টাইফয়েড-রোগী সেরে উঠলেও অনেকদিন পর্যন্ত তার মলমূত্রে জীবাণু থাকতে পারে, এবং সে রোগ সংক্রামিত করতে পারে। সুতরাং, বাড়ির অন্যান্য লোকজনকে অনেকদিন পর্যন্ত ঐ রোগী সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

ফাইলেরিয়া একটি দুষ্ট ব্যাধি

ফাইলেরিয়া একটি দুষ্ট ব্যাধি। এটি সংক্রামক রোগ, তবে এই রোগে সহজে মৃত্যু হয় না। কিন্তু এই রোগে আক্রান্ত হলে, প্রথমে জ্বর হয়; সেই সঙ্গে গায়ে ব্যথা এবং লসিকানালী ও গ্রন্থির প্রদাহ প্রভৃতি উপসর্গও দেখা যায়। এর ফলে রোগীর কুঁচকি, বগলের গ্রন্থি, অণ্ডকোষ অথবা স্তন ফুলে ওঠে এবং বেদনা হয়। আর দীর্ঘদিন এই রোগে ভুগলে, ধীরে ধীরে হাত, এবং বিশেষ ক'রে পা অস্বাভাবিকভাবে ফুলে ওঠে, এবং হাতির পায়ের মতো দেখায়; একে বলা হয় এলিফ্যান্টিয়াসিস্ (Elephantiasis), অর্থাৎ শ্লীপদ বা গোদ। এইভাবে আক্রান্ত অঙ্গের প্রচণ্ড বিকৃতি ঘটে। তখন আর তা কোন রকমেই সারানো যায় না। সারা জীবনের মতো সেই বিকৃতি থেকেই যায়।

অতি প্রাচীনকালেও এই রোগের কথা জানা ছিল। অনেকেরই অনুমান, এর সূচনা হয় এশিয়ায়, তারপর সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে আফ্রিকা, আমেরিকা, ভারত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে। প্রধানতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতেই, যেখানে মশার প্রাদুর্ভাব বেশী, সেইসব জায়গায় এই রোগও বেশী দেখা যায়। বর্তমানে ভারতে এই রোগ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ১৯৭৮ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, তখন ভারতে প্রায় দেড় কোটি লোক এই রোগে আক্রান্ত ছিল।

উকেরেরিয়া বান্‌ক্রফ্‌তি (*Wuchereria bancrofti*) নামক একপ্রকার গোল-কৃমি (Nematode—thread-like worm) এই রোগের জন্য দায়ী। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে উকেরের (Wucherer) মানুষের রক্তে ফাইলেরিয়া-পরজীবী দেখতে পান। পরবর্তীকালে বান্‌ক্রফ্‌ত (Bancroft) পূর্ণাঙ্গ ফাইলেরিয়া-পরজীবী আবিষ্কার করেন। তাই এই জীবাণুর এরকম নামকরণ হয়েছে।

মানুষের দেহে ফাইলেরিয়া-পরজীবী দু'রকম দশায় দেখা যায়।

একটি পরিণত বা পূর্ণাঙ্গ-ফাইলেরিয়া-রূপে (Adult filaria); অন্যটি অপরিণত বা ভ্রূণ-রূপে, একে সাধারণত মাইক্রো-ফাইলেরিয়া (Micro-filaria) বা ক্ষুদে-ফাইলেরিয়া বলা হয়।

পূর্ণাঙ্গ-ফাইলেরিয়া দেখতে সরু চুলের মতো লম্বা, বেলনাকার এবং স্বচ্ছ। ফাইলেরিয়া একলিঙ্গ প্রাণী। পুরুষ-ফাইলেরিয়া ২'৫ সে মি. থেকে ৪ সে. মি. পর্যন্ত লম্বা হয়। স্ত্রী-ফাইলেরিয়া আকারে আরও বড় হয়—প্রায় ১০ সে. মি.। পুরুষ এবং স্ত্রী-ফাইলেরিয়া সাধারণতঃ লসিকা-নালী অথবা লসিকা-গ্রন্থির মধ্যে এমনভাবে জড়াজড়ি ক'রে থাকে যে, তাদের সহজে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। পূর্ণাঙ্গ-ফাইলেরিয়া পাঁচ থেকে দশ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে।

পূর্ণাঙ্গ-স্ত্রী-ফাইলেরিয়া অসংখ্য মাইক্রো-ফাইলেরিয়া প্রসব করে। মাইক্রো-ফাইলেরিয়া স্বচ্ছ এবং বেলনাকার, দেখতে অনেকটা সাপের মতো। তবে আকারে খুবই ছোট—প্রায় ০'৩ মি. মি. লম্বা; এজন্য মাইক্রোস্কোপ বা অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদের দেখা যায় না। মাইক্রো-ফাইলেরিয়া একটি স্বচ্ছ ঝিল্লীর আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। এই আবরণটি প্রাণীটির চেয়ে একটু বড় হয়। এজন্য প্রাণীটি এই আবরণের মধ্যে সামনে-পিছনে আসা-যাওয়া করতে পারে। মাইক্রো-ফাইলেরিয়ার মাথার দিকে একটি সরু কাঁটার মতো অঙ্গ থাকে। মাইক্রো-ফাইলেরিয়া রক্তের সঙ্গে যখন মশার পাকস্থলীতে আসে, তখন এই কাঁটা দিয়ে ঝিল্লীর আবরণ ছিন্ন ক'রে প্রাণীটি বেরিয়ে আসতে পারে।
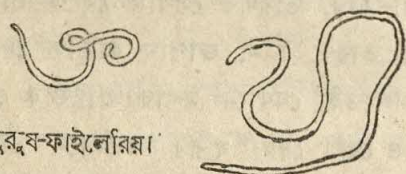
পুরুষ-ফাইলেরিয়া

স্ত্রী-ফাইলেরিয়া

চিত্র ২৫। পুরুষ ও স্ত্রী-ফাইলেরিয়া।

ফাইলেরিয়া রোগে আক্রান্ত মানুষের প্রান্তীয় রক্তস্রোতে প্রচুর মাইক্রো-ফাইলেরিয়া থাকে কিউলেক্স মশকী এই পরজীবীর বাহক। রাত্রিবেলা ঘুমের মধ্যে স্ত্রী-কিউলেক্স মশা কামড়ালে, রোগীর রক্ত চুষে নেওয়ার সময়, এই কৃমি মশার পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। এখানে মাইক্রো-ফাইলেরিয়া তার ঝিল্লীর আবরণ ছিন্ন ক'রে বেরিয়ে আসে, এবং মশার পৌষ্টিক নালীর দেওয়াল ভেদ ক'রে সেখানে ঢুকে পড়ে। তারপর মশার বক্ষপেশীতে যায়। এখানে পরপর তিনবার তার দেহের রূপান্তর ঘটে। তৃতীয় পর্যায়ের লার্ভা প্রায় ১'৫ মি. মি. লম্বা হয়। তখন এরাই সংক্রমণের উপযুক্ত হয়। এগুলি মশার মস্তকে প্রবেশ করে, এবং চোষক-নলের গোড়ায় কুণ্ডলী পাকিয়ে অবস্থান করে। তারপর এই মশা যখন কামড়ায়, তখন এরা প্রথমে মশার চোষক-নলে (proboscis) এবং তারপর মানুষের দেহে প্রবেশ করে।
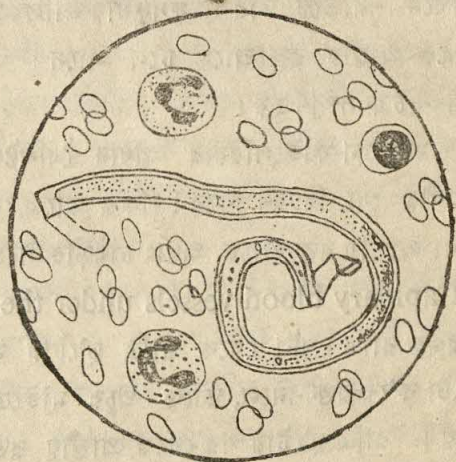
চিত্র ২৬। মানুষের রক্তে মাইক্রোফাইলেরিয়ার অবস্থান। (বিবর্ধিত)

এইরূপ কৃমিবাহী মশা যখন কোনো সুস্থ মানুষকে কামড়ায়, তখন ঐ লার্ভা প্রথমে ত্বকের নীচে প্রবেশ করে এবং সেখানেই অবস্থান করে। তারপর সেখান থেকে রক্তস্রোতে বাহিত হয়ে লসিকা-তন্ত্রে এবং অন্যান্য দেহযন্ত্রে চলে যায়। উল্লেখ্য যে, একটি মাইক্রো-ফাইলেরিয়া থেকে একটি মাত্র লার্ভা উৎপন্ন হয়।

পাঁচ থেকে আঠারো মাসের মধ্যে এরা পূর্ণাঙ্গ-ফাইলেরিয়ায়

পরিণত হয়। প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রী-ফাইলেরিয়ার মিলনের ফলে স্ত্রী-ফাইলেরিয়া গর্ভবতী হয়, এবং অসংখ্য মাইক্রো-ফাইলেরিয়া (বা, ক্ষুদে-ফাইলেরিয়া) প্রসব করে। সেগুলি লসিকা-নালী দিয়ে প্রথমে শিরাতন্ত্রে, তারপর ফুসফুসীয় জালিকায় প্রবেশ করে। সেখান থেকে প্রান্তীয় রক্তস্রোতে চলে আসে। এইভাবে ফাইলেরিয়ার জীবন-চক্র সম্পূর্ণ হয়।

মাইক্রো-ফাইলেরিয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য, দিনের বেলায় এরা ধমনীর মধ্যে বিচরণ করে ; কিন্তু রাত্রে রোগী যখন ঘুমায়, তখন এরা প্রান্তীয় রক্তস্রোতে, অর্থাৎ চামড়ার নীচে অবস্থিত নাড়ী-জালকে (Capillary blood-vessels under the skin), চলে আসে। এরজন্য রাত্রি দশটা থেকে রাত্রি হু'টোর মধ্যে আঙুলের চামড়া ফুটো ক'রে রক্ত নিলে, তাতে প্রচুর মাইক্রো-ফাইলেরিয়া পাওয়া যায়। রাত্রি হু'টোর পর থেকে প্রান্তীয় রক্তস্রোতে এদের পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে, আর সকালে একেবারে কমে যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি রাত্রে কাজ করে, এবং দিনে ঘুমায়, তার প্রান্তীয় রক্ত-স্রোতে দিনের বেলায়ই মাইক্রো-ফাইলেরিয়া পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। রোগীর এক ফোঁটা রক্তে ৫০০-৬০০ মাইক্রো-ফাইলেরিয়া পাওয়া যায়। মাইক্রো-ফাইলেরিয়া মানুষের দেহে সত্তর দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে।

ফাইলেরিয়া-কৃমি প্রত্যক্ষভাবে কোনো রোগ সৃষ্টি করে না। কিন্তু জীবিত বা মৃত কৃমিদ্বারা লসিকা-নালীসমূহ অবরুদ্ধ হয়ে যায় বলে আক্রান্ত অঞ্চলে স্ফীতি ও প্রদাহ হয়ে থাকে। রোগ পুরাতন হলে, বিভিন্ন প্রান্তীয় অঙ্গ প্রচণ্ডভাবে ফুলে ওঠে এবং গোদ সৃষ্টি করে।

উল্লেখ্য যে, ফাইলেরিয়া রোগীর দেহে পূর্ণাঙ্গ-ফাইলেরিয়া সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। এর কারণ বোধ করি এই যে, লসিকা-নালী এমনভাবে বন্ধ হয়ে যায় যে, প্রাপ্ত-বয়স্ক ফাইলেরিয়া লসিকা সংবহনে

প্রবেশ করতে পারে না। তাছাড়া বয়স্ক ফাইলেরিয়া মরে যায়, এবং অনেক সময় সেখানেই তা চুন দ্বারা আবৃত (Calcified) হয়ে থাকে।

একবার ফাইলেরিয়ায় আক্রান্ত হলে এই কৃমি নির্মূল করা অত্যন্ত কঠিন। কাস্টেলানি এবং চামার্স বলেছেন যে, রোগীকে বিছানায় শয্যাগত রেখে, প্রতিদিন ফাইব্রোলাইসিন ইন্‌জেক্‌শন করলে, তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে এই রোগ নিরাময় করা সম্ভব। বর্তমাতে হেট্রাজান, বেনেসাইড প্রভৃতি ওষুধ দিয়ে সাফল্যের সঙ্গে ফাইলেরিয়ার চিকিৎসা করা হচ্ছে।

যেহেতু এই রোগে আক্রান্ত হলে সম্পূর্ণ নিরাময় করা অত্যন্ত কঠিন, সেইহেতু রোগ যাতে না হয় সেদিকেই বেশী দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এজন্য রোগীকে সবসময় মশারির মধ্যে ঘুমাতে হবে, যাতে ঘুমের মধ্যে তাকে মশা কামড়াতে না পারে। একেবারে প্রাথমিক অবস্থায়ই ভাল ক'রে চিকিৎসা করতে হবে, যাতে সে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে। কারণ, চিকিৎসায় যত দেরী হবে, আরোগ্যলাভও তত কঠিন হয়ে পড়বে। তাছাড়া স্থায়ীভাবে অঙ্গ-বিকৃতি হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং চিকিৎসায় অবহেলা করা উচিত নয়। কিউলেক্স মশা এই মাইক্রো-ফাইলিয়ার বাহক। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কলকাতায় যত মশা আছে, তার শতকরা ৯৯.৮ ভাগই কিউলেক্স মশা। সুতরাং, মশা ধ্বংস করাই এই রোগ প্রতিরোধ করার প্রকৃষ্ট উপায়।

সাবধান, ম্যালেরিয়া আবার আসছে !

"এগার বৎসর পরে দুর্গামণি হরিপালে বাপের ভিটায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন শরতের সন্ধ্যা এমনই একটা অস্বাস্থ্যকর ঝাপসা ধুঁয়া লইয়া সমস্ত গ্রামখানার উপর হুমড়ি খাইয়া বসিয়াছিল যে—তাহার ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্রই দুর্গামণির বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। বাড়িতে বাপ-মা নাই—বড়ভাই আছেন। শম্ভু চাটুয্যের সেদিন ছিল বৈকালিক পালাজ্বরের দিন। অতএব সূর্যাস্তের পরই তিনি প্রস্তুত হইয়া বিছানা গ্রহণ করিয়াছিলেন। খবর পাইয়া সুপ্রাচীন বালাপোষে মাথা এবং দুই কান ঢাকিয়া খড়ম পায়ে খটখট শব্দে বাহিরে আসিয়া চিনিতে পারিলেন।

কে, ও দুর্গা এলি নাকি ? তা আয় আয়।

* * * *

দুর্গা এখানকার রীতিনীতি কতক জানিতেন, কারণ তিনি এই গ্রামের মেয়ে।......তাহাদের নিজেদের গ্রামটাও শহর নয় বটে, কিন্তু সেখানে রাস্তাঘাট আছে ; এমন আম, কাঁঠাল ও বাঁশঝাড়ে মাথার উপর অন্ধকার করিয়া নাই। এরূপ গোবর ও পাটপচা গন্ধ চতুর্দিক হইতে আসিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে ভারাক্রান্ত, ব্যাকুল করিয়া দেয় না। তখনও অন্ধকার হয় নাই, একটা শৃগাল উঠানের উপর আসিয়া দাঁড়াইতেই বড়ছেলেটা তাড়া করিয়া গেল। চারিদিকে অসংখ্য ঝিঁঝিঁ পোকা বিকট শব্দ শুরু করিয়া দিল। দেয়ালের গায়ে একটা শুকনা ডালে হঠাৎ অশ্রুতপূর্ব একপ্রকার বিশ্রী শব্দ শুনিয়া জ্ঞানদা সভয়ে চুপি চুপি কহিল, ওকি ডাকে মা ? মামী শুনিতে পাইয়া কহিলেন, ও যে তোক্ষোপ।

জ্ঞানদা শিহরিয়া জিজ্ঞাসা করিল তোক্ষোপ কি ? তক্ষক সাপ ?

মামী বলিলেন, হাঁ মা, তাই। ঐ যে কোন্ রাজাকে কামড়েছিল বলে !—গাছে গাছে একেবারে ভরা।

জবাব শুনিয়া জ্ঞানদা মায়ের মুখের প্রতি একবার চাহিল। ইতিপূর্বে কান্নায় তাহার সমস্ত বক্ষ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এবার সে জননীর কোলের উপর লুটাইয়া পড়িয়া একেবারে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, কহিল,এখান থেকে চল মা—এখানে আমি একদণ্ডও বাঁচব না।

মামী আশ্চর্য হইলেন। বলিলেন, ভয় কি গো, ওরা যে দেবতা। কথ্‌খনো কারুর অপকার করে না। আর সাপখোপের কামড়ে কটা লোক মরে বাছা? বরঞ্চ, ভয় যা তা ম্যালোয়ারীর। একবার ধরলে, আর তাতে বস্তু রেখে ছাড়ে না। এবছর দিন কুড়ি হ'ল তোমার মামাকে ধরেছে—এরই মধ্যে যেন শতজীর্ণ করে ফেলেছে, আর দিনকতক পরে কে কার মুখে জল দেবে মা, এ-গাঁয়ে তার ঠিক থাকবে না।

* * * *

আজ বেলা দেখিয়া বৌ দোর-গোড়ায় স্বাভাবিক চীৎকার শব্দে প্রশ্ন করিল, আজ খাওয়া-দাওয়া কি হবে না ঠাকুরঝি? হেসেল নিয়ে বসে থাকব?

দুর্গা মুখ তুলিয়া বলিলেন, মেয়েটার ভারী জ্বর হয়েচে বৌ; তোমরা খাওগে, আমরা আজ আর কেউ খাব না। বৌ কহিল, মেয়ের জ্বর, তা তোমার কি হ'ল গো? জ্বর আবার কার না হয়? নাও, উঠে এসো? দুর্গা কাতরকণ্ঠে কহিলেন, না বৌ, আমাকে খেতে বল না—মেয়ে ফেলে আমি মুখে ভাত তুলতে পারব না।

তোমাদের সব আদিখ্যেতা. বলিয়া বৌ চলিয়া গেল। রান্নাঘর হইতে পুনরায় কহিল, জ্বর হয়েচে কবরেজ ডেকে পাঁচন সিদ্ধ করে দাও। ম্যালোয়ারী জ্বরে আবার খায় না কে? আমাদের দেশে ওসব উপোস-তিরেসের পাঠ নেই বাপু! বলিয়া সে নিজের কাজে মন দিল।

অপরাহ্নবেলায় সে নিজেই একবাটি পাঁচন সিদ্ধ করিয়া আনিয়া কহিল, ওলো ও গেনি, উঠে পাঁচন খা ! ভাতে জল দিয়ে রেখেছি, চল, খাবি আয়।

মামীকে সে অত্যন্ত ভয় করিত। বিনাবাক্যে উঠিয়া খানিকটা তিক্ত পাঁচন গিলিয়া বমি করিয়া ফেলিয়া পুনরায় শুইয়া পড়িল। দুর্গা ঘরে ছিল না, বমির শব্দে ছুটিয়া আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মামী রাগ করিয়া উঠানে সমস্ত পাড়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল, এ-সব বাবুমেয়ে নিয়ে আমাদের গরীব, দুঃখীর ঘরে আসা কেন বাপু ?

সেই হইতেই জ্ঞানদার অসুখ উত্তরোত্তর বাড়িতেই লাগিল।

তাহার ভামিনী-মামী সেই যে প্রথম দিনেই বলিয়াছিল, বাছা ! পল্লীগ্রামে সাপের কাপড়ে আর ক'টা লোক মরে, মরে যা তা ঐ ম্যালোয়ারীতে। একবার ধরলে আর রক্ষা নেই। তাহার কথাটার সত্যতা সপ্রমাণ হইতে বেশী বিলম্ব ঘটিল না, অনতিকাল মধ্যেই জ্ঞানদাকে একেবারে শয্যাগত করিয়া ফেলিল।

* * * *

সংবাদ দিবার প্রয়োজন ছিল না বলিয়াই দুর্গা চিঠি না লিখিয়াই আসিয়াছিলেন। জ্ঞানদার চেহারা দেখিয়া জ্যাঠাইমা হাসিয়াই খুন—ওলো ও গেনি, গাল দু'টো তোর চড়িয়ে ভেঙ্গে দিলে কে লো ? ও মা, কি ঘেন্না ? মাথায় টাক পড়ল কি করে লো ? ও ছোটবৌ, শিগগির আয় শিগগির আয়—আমাদের জ্ঞানদা সুন্দরীকে একবার দেখে যা। গায়ের চামড়াটাও কি তোর মামা-মামীরা ছ্যাঁকা দিয়ে পুড়িয়েচে নাকি লো ?

জ্ঞানদা নিরুত্তরে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রইল। ছোট খুড়ী আসিতেই তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল।

ছোটবৌ শিহরিয়া উঠিল—ইস, একি হয়ে গেছিস মা ?

জ্যাঠাইমা নিতান্ত অত্যুক্তি করিলেন না , কহিলেন, বাঁশবনের

পেত্নী। অন্ধকারে দেখলে আঁৎকে উঠতে হয়। খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিলেন। আর কিন্তু ছোটবৌ তাহাতে যোগ দিল না। সে আর যাই হউক, সন্তানের জননী ত? মেয়েটির এই কঙ্কালসার পাণ্ডুর মুখের পানে চাহিয়া তাহার মায়ের প্রাণ যেন শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল।"

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "অরক্ষণীয়া" গ্রন্থে ম্যালেরিয়া-জর্জরিত গ্রাম-বাংলার যে চিত্র তুলে ধরেছেন, তা যেমন নিখুঁত তেমনি মর্মস্পর্শী। এর কোনো তুলনা নেই।

ভ্যাপ্‌সা জলার আশেপাশেই ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ বেশী দেখা যেত। তাই লোকে ভাবতো দূষিত বায়ুর জন্যেই ম্যালেরিয়া হয়। একজন ইটালিয়ান, তাঁর নাম হ'ল টার্টি, এই রোগের নাম দেন ম্যালেরিয়া। কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'ল 'মন্দ বাতাস' (Mal aire)।

আগে ভারতে, বিশেষ ক'রে বাংলাদেশে, ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ ছিল অত্যন্ত বেশী। বাংলার এক-একটা বর্ধিষ্ণু গ্রাম যে এই রোগে একেবারে জনশূন্য হয়ে গেছে, তার অনেক প্রমাণ রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। প্রাচীনকালে ইটালী, গ্রীস, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশেও যে ম্যালেরিয়ার প্রচণ্ড প্রকোপ ছিল, তারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। সভ্য মানুষ প্রায় তিন হাজার বছর ধরে ম্যালেরিয়ায় ভুগছে। ইদানীং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO = World Health Organisation) তরফ থেকে এই রোগের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম চালানো হচ্ছে, কিন্তু তবুও মানব সমাজকে এই দুরন্ত ব্যাধির কবল থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা এখনও সম্ভব হয় নি।

১৯৩৫ সালে ভারতে প্রায় দশ লক্ষ লোক এই রোগে মারা যায়। এ ছাড়া আরও প্রায় দশ লক্ষ লোক এই সময় ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলে এবং তারপর খুব সহজেই অন্য রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। ১৯৪২ সালে মারা যায় প্রায়

পনেরো লক্ষ, তার মধ্যে বাংলাদেশেই প্রায় তিন লক্ষ। আর ১৯৫২ সালে এই রোগে আক্রান্ত প্রায় সাড়ে সাত কোটি মানুষের মধ্যে মারা যায় প্রায় দশ লক্ষ।

এই সব কারণে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে ম্যালেরিয়া নিবারণের এক কার্যসূচী গ্রহণ করা হয় এবং এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৩ সাল থেকেই শুরু হয় ব্যাপক অভিযান (National Malaria Control Programme)। মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ হয়। এজন্যে ১৯৫৮ সাল থেকে সুরু হয় ম্যালেরিয়া, নির্মূল করবার কার্যক্রম (National Malaria Eradication Programme)। এইভাবে মাত্র আট বছরের চেষ্টায়ই, ১৯৬০ সাল নাগাদ, সারা ভারতে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারেরও নীচে নামিয়ে ফেলা সম্ভব হয়। ১৯৬১ সালেও ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা ছিল ৪৯,১৫১। কিন্তু দুঃখের বিষয় ষাটের দশকে উন্নতির এই হার বজায় রাখা সম্ভব হয় নি। ম্যালেরিয়া রোগ যে আবার ক্রমশঃ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, তা নীচের তালিকাতেই প্রতীয়মান।

১ নং তালিকা।

বছর	জন-সংখ্যা (লক্ষ হিসাবে)	পরীক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা (লক্ষ হিসাবে)	ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা	রোগের হার (শতকরা হিসাবে)
1962	4060	260	59,575	0·228
1964	4550	445	1,12,942	0·26
1966	4760	400	1,48,156	0·37
1968	5020	420	2,74,881	0·65
1970	5270	409	6,94,647	1·70
1971	5350	404	13,23,118	2·27
1972	5470	392	13,62,806	3·48

দেখা যাচ্ছে, ১৯৬২ সালেও ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০ হাজার, কিন্তু ১৯৭২ সালেই অর্থাৎ মাত্র দশ বছরের মধ্যেই সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৩ লক্ষ ৬৩ হাজারে। অতএব আমাদের শঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। দেশ থেকে ম্যালেরিয়া বিদূরিত হয়েছে এই ভেবে আত্মতুষ্টির মনোভাব নিয়ে বসে থাকলে আমাদের আর চলবে না। ম্যালেরিয়া নির্মূল করবার এই অভিযানে আমাদের আবার সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। নতুবা এর পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। [একটি খবরে প্রকাশ, ১৯৮৩-৮৪ সালে শুধু কলকাতা শহরেই ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। এটা মোটেই অবহেলা করার মতো নয়।]

ম্যালেরিয়া জীবাণু ঃ

১৮৯০ সালের ৬ই নভেম্বরের ঘটনা। আলজেরিয়ার কন্‌স্টানটিন শহরে চার্লস লুই আলফন্‌স্ লাভেরাঁ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সর্বপ্রথম ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তে এক রকম প্রোটোজোয়া দেখতে পান। তিনি এর নাম দেন প্লাস্‌মোডিয়াম। তাঁর মতে প্লাসমোডিয়ামই হ'ল ম্যালেরিয়া রোগের কারণ। ক্রমে বিভিন্ন রকম ম্যালেরিয়ায় বিভিন্ন প্রজাতির প্লাস্‌মোডিয়াম আবিষ্কৃত হয়।

পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল, প্লাস্‌মোডিয়াম এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র এককোষী প্রাণী। মানুষের রক্তে এরা বংশবিস্তার করে অযৌন-ভাবে। এরা লাল কণিকায় বাসা বাঁধে। জীবন-চক্রের এক অধ্যায়ে এরা বহুধাবিভক্ত হয়ে যায় এবং লাল কণিকা বিদীর্ণ ক'রে বেরিয়ে আসে। তখনই রোগীর কম্প দিয়ে জ্বর আসে। রোগের এই অবস্থায় লক্ষ লক্ষ প্লাস্‌মোডিয়াম-কণা রক্তে পাওয়া যায়।

ম্যালেরিয়া-জীবাণু সংক্রমিত হয় কিভাবে ?

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংরেজ বিজ্ঞানী রোনাল্ড রস এবং ইটালীয় বিজ্ঞানী গিওভ্যানী ব্যাটিস্তা গ্র্যাসী এই দু-জনের গবেষণার

ফলে প্রামাণিত হয় যে, অ্যানোফিলিস মশকীর সাহায্যেই রোগগ্রস্ত মানুষের দেহ থেকে সুস্থ মানুষের দেহে ম্যালেরিয়ার জীবাণু (*Plasmodium vivax*) সংক্রামিত হয়।[*]
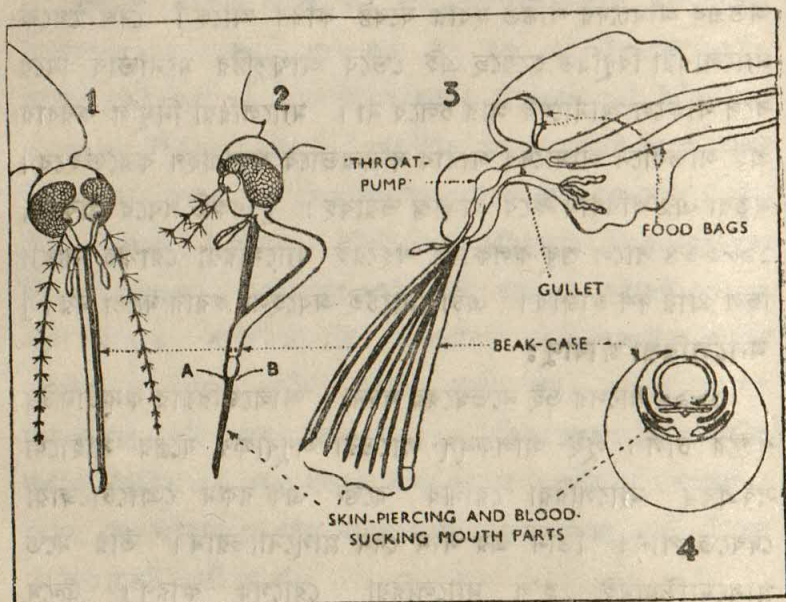
চিত্র ২১। 1. মশার মাথা এবং চামড়া ফুটো করার ও রক্ত চুষে নেওয়ার প্রত্যঙ্গসমূহ; 2. (A-B) গায়ের চামড়া; 3-4. Throat-pump—গলায় অবস্থিত পাম্প, Gullet—গলবিল; Food bags—খাদ্য-থলিসমূহ; Skin-piercing and blood-sucking mouth-parts—চামড়া ফুটো করার এবং রক্ত চুষে নেওয়ার প্রত্যঙ্গসমূহ; Beak-case—চোষক-নলের আবরণ।

---

[*]পুরুষ-মশার চোষক-নল ভোঁতা, কিন্তু স্ত্রী-মশার নল বেশ সরু। এজন্য স্ত্রী-মশাই শুধু মানুষের রক্ত পান করতে পারে। পুরুষ-মশাকে নানা প্রকার গাছের রস পান করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। রক্ত চুষে নেবার সময়, রক্ত যাতে জমে না যায়, সেজন্য মশকী রক্তের সঙ্গে ক্রমাগত লালা মিশিয়ে তরল ক'রে নেয়। এই কারণে, মশা যখন কামড়ায়, তখন লালার সঙ্গে রোগ-জীবাণু এসে সুস্থ মানুষের রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। এর ফলে ম্যালেরিয়া-রোগ সংক্রামিত হয়।

মশকীর কামড়ের ফলে যে প্লাস্‌মোডিয়াম মানবদেহে প্রবেশ করে,তার নাম স্পোরোজয়েট (Sporozoite)। স্পোরোজয়েট
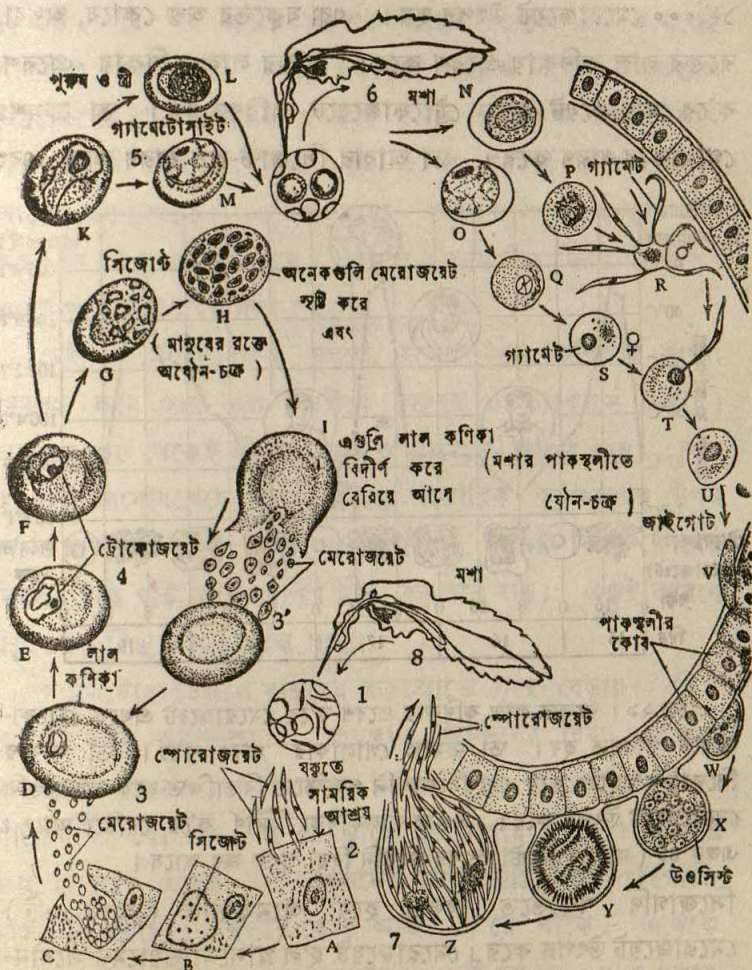
চিত্র ২৮। ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু (প্লাস্‌মোডিয়াম অ্যানোফিলিস্‌) মশকী দ্বারা এইভাবে মানবদেহে সংক্রামিত হয় এবং তার ফলে ম্যালেরিয়া রোগ দেখা দেয়।

দেখতে তর্কু বা টাকু (Spindle)-এর মতো। এরা সাময়িক-ভাবে যকৃতের কোষে আশ্রয় নেয়। এরা বৃদ্ধি পেয়ে প্রাক-বিভাজন

সিজোণ্ট-রূপ গ্রহণ করে এবং অবশেষে বিভাজিত হয়ে অনেকগুলি মেরোজয়েট সৃষ্টি করে। এইভাবে প্রতিটি সিজোণ্ট থেকে প্রায় ১২,০০০ মেরোজয়েট উৎপন্ন হয়। এরা যকৃতের অন্য কোষে, অথবা রক্তের লাল কণিকায় প্রবেশ করে। রক্তের লাল কণিকায় প্রবেশ ক'রে মেরোজয়েট প্রথমে ট্রোফোজয়েটে পরিণত হয়। তা ক্রমশঃ গোলাকার ধারণ করে। তা আবার সিজোণ্ট-রূপ ধারণ করে এবং
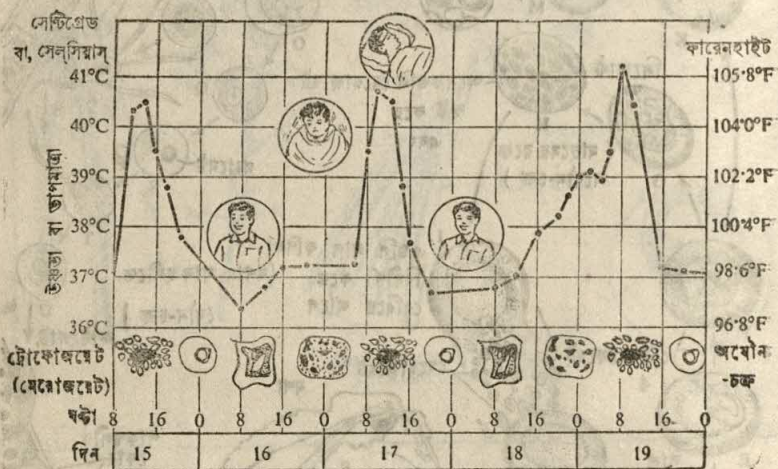
চিত্র ২৯। রক্তের লাল কণিকায় প্রবেশ ক'রে মেরোজয়েট প্রথমে ট্রোফোজয়েটে পরিণত হয়। তা ক্রমশঃ গোলাকার ধারণ করে। তা আবার সিজোট-রূপ ধারণ করে এবং সিজোগনি পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে অনেকগুলি মেরোজয়েট উৎপন্ন করে। এগুলি লালকণিকা বিদীর্ণ ক'রে বেরিয়ে আসে। এজন্য ৪৮ (বা, ৭২) ঘণ্টা পরপর কাঁপুনি দিয়া প্রবল জ্বর আসে।

সিজোগণি পদ্ধতিতে বিভক্ত হয়ে অনেকগুলি (প্রায় ১৬টি) মেরোজয়েট উৎপন্ন করে। মেরোজয়েট হ'ল প্লাসমোডিয়ামের অযৌন-রূপ। এগুলি লাল কণিকা বিদীর্ণ ক'রে বেরিয়ে আসে এবং আবার রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় একপ্রকার বিষ (Toxic substance) রক্তে নির্গত হয়। তাই কাঁপুনি দিয়ে প্রবল জ্বর আসে। নবজাত মেরোজয়েটগুলি নতুন নতুন লাল কণিকাকে আক্রমণ করে। তাই এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এজন্য প্লাস্‌মো-

ডিয়ামের প্রজাতি অনুযায়ী, ৪৮ ঘণ্টা বা ৭২ ঘণ্টা পর পর, এক সঙ্গে অনেকগুলি ক'রে মেরোজয়েটের সৃষ্টি হয়, কাজেই ৪৮ বা ৭২ ঘণ্টা পর পর জ্বরের পালা। ম্যালেরিয়াকে এই কারণেই পালাজ্বর বলা হয়। লাল কণিকায় প্রবেশ ক'রে কতকগুলি মেরোজয়েট আবার অন্যরকম হয়ে যায়। ট্রোফিক দশার শেষে এরা বিভাজিত হয় না, কিন্তু লাল কণিকা বিদীর্ণ ক'রে বেরিয়ে আসে রক্তস্রোতে। এদের মধ্যে কতকগুলি পুরুষ-রূপ এবং অন্যগুলি স্ত্রী-রূপ ধারণ করে। এগুলি প্লাস্‌মোডিয়ামের যৌন-রূপ। এদের গ্যামেটোসাইট বলা হয়।

বেশীদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগলে, রক্তের লাল কণিকার সংখ্যা ক্রমশঃ কমে যায় এবং রোগীকে রক্তশূন্য ও ফ্যাকাসে দেখায়। অসুখের শুরু থেকেই জীবাণু যকৃত ও প্লীহাতে আশ্রয় নেয়। লাল কণিকার ধ্বংসাবশেষের প্রাচুর্য প্লীহার স্বাভাবিক কর্মক্ষমতার উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। এর ফলে প্লীহার বিশিষ্ট কিছু কোষের নিরন্তর বৃদ্ধি ঘটে, তাই রোগীর প্লীহা বড় হয়ে যায়। একই কারণে যকৃতেরও কিছু আয়তনবৃদ্ধি ঘটে।

গ্যামেটোসাইটগুলি মানুষের রক্তস্রোতে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এদের তখন কুমার-কুমারী অবস্থা। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানবদেহে থাকতে এরা পরস্পর মিলিত হয়ে বংশবিস্তার করতে পারে না। রোগীকে মশা কামড়ালে এরা মশার পেটে চলে যায় এবং সেখানে এদের যৌন-মিলনের ফলে সৃষ্টি হয় জাইগোট। জাইগোট মশার পাকস্থলীর কোষ আশ্রয় ক'রে থাকে। এথেকে যথাক্রমে উওসিস্ট এবং স্পোরোজয়েটের সৃষ্টি হয়। এগুলি মশার পাকস্থলী থেকে এসে তার লালা-গ্রন্থীতে জমা হয়। এই প্রক্রিয়া শেষ হতে সময় লাগে প্রায় দশ দিন। জীবাণুবাহী এই মশা কোন সুস্থ মানুষকে কামড়ালে জীবাণুগুলি তার রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। এর ফলে তার দেহে ম্যালেরিয়া রোগ সংক্রামিত হয়।

এই আলোচনা থেকে বোঝা গেল, ম্যালেরিয়া রোগী, অ্যানোফিলিস মশকী এবং সুস্থ মানুষ—এই তিনের যোগাযোগ ছাড়া ম্যালেরিয়া রোগ ছড়াতে পারে না।

২ নং তালিকা।

ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্লাসমোডিয়ামের জীবন-চক্র।

৩ নং তালিকা। নানাপ্রকার ম্যালেরিয়া পরজীবীর বিবরণ।

প্লাসমোডিয়ামের প্রজাতি→	প্লা. ভাইভ্যাক্স	প্লা. ম্যালেরিয়ী	প্লা. ওভেল	প্লা. ফলসিপ্যারাম
১। তা দেওয়ার সময়	১১-১৪ দিন	১৮-২১ দিন	৯ দিন	৯-১২ দিন
২। সিজোগনি-পদ্ধতিতে বিভাজনের সময়	৪৮ ঘণ্টা	৭২ ঘণ্টা	৪৮ ঘণ্টা	২৪-৪৮ ঘণ্টা
৩। উৎপন্ন মেরো-জয়েটের সংখ্যা	১২-২৪	৬-১২	৬-১২	১৮-২৪
৪। মেরোজয়েট সমূহের অবস্থান	দু'টি বলয়ে	গোলাপের পাপড়ির মতো	বিশৃঙ্খল	বিশৃঙ্খল
৫। গ্যামেটো-সাইটের আকার	গোলাকার	গোলাকার	ডিমের মতো	বাঁকা চাঁদের মতো
৬। রঞ্জক পদার্থ	পীতাভ বাদামী	গাঢ় বাদামী	গাঢ় পীতাভ বাদামী	গাঢ় বাদামী

ম্যালেরিয়া নির্মূল করবার কার্যক্রম :

এই কার্যক্রম দু'টি পর্বে ভাগ করা হয়—(১) আক্রমণ-পর্ব (Attack phase), এবং (২) সদা সতর্কতা-পর্ব (Surveillance phase)।

(১) আক্রমণ-পর্ব—এই পর্বে ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত প্রতিটি অঞ্চলের প্রতিটি ঘরের দেয়ালে ও ছাদে, বছরে অন্ততঃ দু-বার ক'রে, জীবাণু-নাশক ওষুধ ডি. ডি. টি. (D. D. T. = Dichloro-diphenyl Trichloro-ethane) স্প্রে করা হয়। ফলে, ঘরের দেয়ালে ও ছাতে ডি. ডি. টি.-র একটা সূক্ষ্ম আস্তরণ পড়ে। জীবাণুবাহী মশা দৈবাৎ এরূপ দেয়ালে বা ছাতে বসলে, ড. ডি. টি.-র

সংস্পর্শে এসে বিষক্রিয়ার ফলে মারা যাবে। মশার একটা স্বভাব এই যে, বাসগৃহে প্রবেশ ক'রে মানুষের রক্ত পান করবার আগে এবং পরে, বিশেষ ক'রে দিনের বেলায়, ঘরের দেয়ালে বসে বিশ্রাম করে ! সুতরাং, এই সব মশা রক্ত পান করবার দশ দিনের মধ্যেই (অর্থাৎ, রোগ সংক্রমণের পূর্বেই) যে ডি. ডি. টি.-র সংস্পর্শে এসে মারা পড়বে, এরূপ সম্ভাবনাই বেশী। এজন্যে একটি অঞ্চলের প্রতিটি গৃহে কয়েক বছর ধরে নিয়মিতভাবে ডি. ডি. টি. স্প্রে করলে সেখানে নতুন সংক্রমণ সহজেই বন্ধ করা যায়। ফলে, কিছু দিনের মধ্যেই সেখানে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। এই সঙ্গে প্রতিটি রোগীকে ম্যালেরিয়া নিবারক ওষুধ খাইয়ে সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত এবং সুস্থ ক'রে তুলতে হয়, যাতে সে আর নতুন ক'রে রোগ সংক্রমণ করতে না পারে।

(২) সদা সতর্কতা-পর্ব—এই পর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা পনেরো বা ত্রিশ দিন অন্তর একবার ক'রে প্রতিটি গৃহে গিয়ে অনুসন্ধান করেন, সেখানে কারও জ্বর হয়েছে কি না। এরূপ কোন রোগীর সন্ধান পেলে, সঙ্গে সঙ্গে তার এক ফোঁটা রক্ত নিয়ে একটি স্লাইড তৈরি করা হয়। তারপর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়, ম্যালেরিয়ার জীবাণু আছে কিনা ; থাকলে, সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়ার নিবারক ওষুধ খাইয়ে এই জীবাণু ধ্বংস ক'রে ফেলা হয়, যাতে সে আর রোগ সংক্রমণ করতে না পারে।

এছাড়া প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসন্ধান ক'রে দেখা হয়, কোথা থেকে এবং কিভাবে এই রোগ সংক্রামিত হয়েছে ! এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া গেলে, সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করা হয়, যাতে এই রোগ আরও ছড়াতে না পারে।

পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, নতুন ক'রে সংক্রমণ না হলে, তিন বছরের মধ্যেই এই জীবাণু নির্মূল হয়ে যায়। সুতরাং, অন্য কোন ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে যাতে এই জীবাণুর আমদানী না

হয়, সেদিকেও সব সময় কড়া নজর রাখতে হয়। ভ্রমণকারীরা খুব সহজেই ম্যালেরিয়া জীবাণু বহন ক'রে আনতে পারে। কাজেই বিশেষ ক'রে তাদেরই এই বিষয়ে সতত সতর্ক থাকা দরকার। কোন ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলে যেতে হলে (তা দেশের অভ্যন্তরেই হোক বা বিদেশেই হোক), সেখানে যাবার এক সপ্তাহ আগে থেকে আরম্ভ ক'রে, সেখানে থাকাকালীন এবং সেখান থেকে ফিরে আসবার পরও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, নিয়মিতভাবে ম্যালেরিয়া প্রতি-রোধক ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। এ সবই ট্যাবলেট-রূপে পাওয়া যায়। কিছু খাবার পর, এই ট্যাবলেট জলের সঙ্গে গিলে খেতে হয়। এর কারণ, খালি পেটে ওষুধ খেলে বমির উপসর্গ দেখা দিতে পারে। অন্তঃসত্ত্বা মহিলারাও এর যে কোনটি নিশ্চিন্তমনে ব্যবহার করতে পারেন, তাতে বিপদের কোন সম্ভাবনা নেই; বরং ম্যালেরিয়া হলেই বিপদ।

৪নং তালিকা। নানাপ্রকার ওষুধের বিবরণ।

ওষুধের নাম	মাত্রা (বয়স্কদের জন্যে)
(1) প্রোগুয়ানিল (প্যালুড্রিন)	100 মিলিগ্রাম—প্রতি দিন
(2) ক্লোরোকুইন (নিভাকুইন)	300 মিলিগ্র্যাম (ক্ষারক) —সপ্তাহে একবার
(3) অ্যামোডায়াকুইন (কেমোকুইন)	300-400 মিলিগ্রাম (ক্ষারক) —সপ্তাহে একবার
(4) পাইরিমিথ্যামিন (ডায়াপ্রিম)	26-50 মিলিগ্রাম —সপ্তাহে একবার

এছাড়া মশার কামড় থেকে আত্মরক্ষার জন্যেও প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, যেমন—(১) ভ্রমণকারী যে গৃহে বাস করবেন, তার দরজা ও জানালায় সূক্ষ্ম তারের জাল থাকা দরকার, যাতে ঘরের মধ্যে মশা ঢুকতে না পারে, (২) ঘরে মশক-

নিবারক ওষুধ স্প্রে করতে হবে, বিশেষতঃ রাত্রিবেলা, এবং (৩) রাত্রে মশারির মধ্যে শুয়ে ঘুমাতে হবে। তাহলেই ম্যালেরিয়া-সংক্রমণ অনেকাংশে নিবারণ করা সম্ভব হবে।

ভারতে উপরিউক্ত দু'টি কার্যক্রম পর পর অনুসরণ করবার ফলে ষাটের দশকের গোড়ার দিকে অনেকগুলি অঞ্চলেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অনেক কমে যায়। সকলে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। কিন্তু তারপর থেকেই ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, বিশেষ করে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে। তাই এগুলি সমস্যাসঙ্কুল অঞ্চল বলে অভিহিত।

এই সব জায়গায় যে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ক্রমশঃ বাড়ছে, তার প্রধান কারণ—কোন কোন ক্ষেত্রে জীবাণুবাহী মশা কীটনাশক ওষুধ ডি. ডি. টি.-র বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-শক্তি অর্জন ক'রে ফেলেছে। তবে আশার কথা এই যে, এসব ক্ষেত্রে বিকল্প ওষুধ বি. এইচ. সি. (B. H. C. = Benzene Hexa-chloride), অর্থাৎ গ্যামেক্সেন (Gammexane = Gamma-Hexachloro-cyclohexane) প্রয়োগ ক'রে সুফল পাওয়া যাচ্ছে। এসব জায়গায় 'ম্যালাথায়ন' (Malathion) ব্যবহার ক'রেও দেখা যেতে পারে। কারণ, বিদেশে অনেক জায়গায় এই ওষুধ ব্যবহার ক'রে সুফল পাওয়া গেছে।

এছাড়া আত্মতুষ্টির মনোভাবজনিত অবহেলা এবং কীটনাশক ওষুধের অনটন প্রভৃতিও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধির জন্যে অনেকাংশে দায়ী। সুতরাং, আর কালবিলম্ব না ক'রে ম্যালেরিয়া নির্মূল করবার এই কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে, বিশেষ ক'রে সমস্যাসঙ্কুল অঞ্চলগুলিতে।

এখানে উল্লেখ্য যে, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ম্যালেরিয়া নির্মূল করবার কার্যক্রমের জন্যে ৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু তদানীন্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই অর্থ যথেষ্ট বলে মনে করেন না।

তার কারণ, বিশ্বের বাজারে কীটনাশক ওষুধের দাম অনেক বেড়ে গেছে, আর আমাদের প্রয়োজনের একটা বড় অংশ বিদেশ থেকে আমদানী করতে হবে। সমস্যার গুরুত্ব বিবেচনা ক'রে, ঐ অর্থে যে স্বল্প পরিমাণ কীটনাশক ওষুধ সংগ্রহ করা যাবে, তার সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে। একমাত্র তাহলেই আমাদের সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও বাঞ্ছিত ফল লাভের আশা করা যাবে, নতুবা নয়। যত দিন যাচ্ছে, এই সমস্যা ক্রমশঃ আরও বেড়ে যাচ্ছে। বর্তমানে এই সমস্যা আরও গুরুতর আকার ধারণ করেছে। আর সেজন্যই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আরও বেড়েছে।

সাবধান, কালাজ্বর এখনও আছে !

"উপেন্দ্রকিশোর" গ্রন্থে লীলা মজুমদার লিখেছেন— "উপেন্দ্রকিশোরের ছেলেমেয়েরা কেউই সাধারণ মানুষের মতো হননি। কম বেশি প্রত্যেকের মধ্যে একটা না একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যেত, যার মূলে তাঁদের অসাধারণ বাবার প্রভাব ছিল বলে মনে হয়।

প্রথম সন্তান সুখলতা যেমনি সুন্দর ছবি আঁকেন, তেমনি সুন্দর ছোটদের জন্যে গল্প ও কবিতা লেখেন।......

তারপর ছিলেন সুকুমার। আট বছর বয়সে তাঁর 'নদী' কবিতা প্রকাশিত হয়। খুব ছোট বেলা থেকে মজার মজার ছবি এঁকে ভাইবোনদের হাসিয়ে মারতেন। কৌতুক করবার যেমন অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, তেমনি বাপের মতো একটা গভীর গম্ভীর দিকও ছিল, ব্রাহ্মসমাজের যুবকেরা তাঁকে নেতার মতো শ্রদ্ধা করত, ব্রহ্মসঙ্গীতে তাঁর লেখা অপূর্ব সব গান আছে। কাউকে আঘাত না দিয়ে, মানুষের অহঙ্কার দুর্বলতা সম্বন্ধে এমন অনাবিল হাসির খোরাক জোগাতে মানুষের ইতিহাসে খুব কম লোকই পেরেছে।......

সুকুমার বি. এস্. সি. পাশ করে ১৯১১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি নিয়ে বিলেত গেলেন ফোটোগ্রাফি ও প্রিন্টিং সম্বন্ধে আরও শিখতে।

১৯১৩ সালে একদিন সন্ধ্যেবেলা 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি হাতে করে উপেন্দ্রকিশোর ২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এসে বসবার ঘরের দরজার কাছে হাসিমুখে দাঁড়ালেন! অমনি ঘরময় একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল।··· বাস্তবিক ঐ প্রথম সংখ্যার 'সন্দেশ' খানি পৃথিবীর যে কোনো দেশের শ্রেষ্ঠ শিশু মাসিক পত্রিকার পাশে আসন পাবার যোগ্য।

কি না থাকত সন্দেশে, পুরাতত্ত্বের সঙ্গে নতুন আবিষ্কার, জীবনী ভ্রমণকাহিনী, পৌরাণিক গল্প দেশ-বিদেশ থেকে সংগ্রহ করা, নাটক, কবিতা, গান, গল্প, হাসিতামাসা, ধাঁধা, কিছুই বাদ যেত না।

তারপরে সুকুমার যখন বিলেত থেকে ফিরে এসে সন্দেশ পরিচালনার খানিকটা ভার নিলেন, তখন এসবের সঙ্গে এমন একটা অভূতপূর্ব সরসতার সমাবেশ হল সে আর কি বলব সেটাও যেন একটা ছোঁয়াচে ব্যামো !······

প্রতিমাসে সুকুমারের লেখা অপূর্ব কবিতা কিম্বা গল্প আর তার সঙ্গে তাঁর অদ্বিতীয় তুলির আঁকা সাদাকালো ছবি বেরুতে লাগল। বাঙ্গলাদেশের ঘরে ঘরে সন্দেশের আগমনের জন্য প্রতিমাসে ছেলে-মেয়েদের সে কি আকুল প্রতীক্ষা !”

১৯২১ সালে সুকুমার রায় মারাত্মক কালাজ্বরে আক্রান্ত হলেন। সুকুমার রায়ের “সমগ্র শিশুসাহিত্য” গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁরই সুযোগ্য পুত্র সত্যজিৎ রায় লিখেছেন,—“আমার বাবার যখন মৃত্যু হয় তখন আমার বয়স আড়াই বছর।······

১৯১৫ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত আট বছর সুকুমার সন্দেশ সম্পাদনা করেছিলেন। তার মধ্যে শেষের আড়াই বছরের অধিকাংশ সময়ই তাঁর রোগশয্যায় কেটেছে। কিন্তু রুগ্ন অবস্থাতেও তাঁর কাজের পরিমাণ ও উৎকর্ষ দেখলে অবাক হতে হয়। শুধু লেখা বা আঁকার কাজই নয়, ছাপার কাজেও যে তিনি অসুখের মধ্যে অনেক চিন্তা ব্যয় করেছেন তারও প্রমাণ রয়েছে।······

লেখা ও আঁকার দিক দিয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তির প্রায় সবই এই আড়াই বছরে। হ-য-ব-র-ল-এর রচনা ১৯২২ সাল।······

সুকুমার রায়ের কোনো রচনাই তাঁর জীবদ্দশায় পূর্ণাঙ্গ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। আবোল তাবোল প্রথম প্রকাশের তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৩। অর্থাৎ সুকুমারের মৃত্যুর ঠিক নয় দিন পরে। ছাপা বই দেখে না গেলেও, তার তিনরঙা মলাট, তার অঙ্গসজ্জা, পাদপূরক দু-চার লাইনের কিছু ছড়া, টেল্‌পিসের ছবি ইত্যাদি সবই তিনি করে গিয়েছিলেন শয্যাশায়ী অবস্থায়। তাঁর শেষ রচনা ছিল আবোল তাবোলের শেষ কবিতা, যার বিচিত্র মিশ্র

রস বাংলা সাহিত্যে চিরকালের বিস্ময়ের বস্তু হয়ে থাকবে। এটি রচনার সময় যে তাঁর উপর মৃত্যুর ছায়া পড়েছিল তার ইঙ্গিত এর শেষ কয়েক ছত্রে আছে—

আদিম কালের চাঁদিম হিম
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম
ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর
গানের পালা সাঙ্গ মোর।

জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়ে এমন রসিকতা আর কোনো রসস্রষ্টার পক্ষে সম্ভব হয়েছে বলে আমার জানা নেই।"

আর এ সম্পর্কে লীলা মজুমদার লিখেছেন,—

"সত্যজিতের যখন দু'বছর বয়স, মুখে কথা ফুটেছে, তখন মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে, ময়মনসিংহের রায়কুলকে অন্ধকার করে কালাজ্বর রোগে সুকুমার স্বর্গে গেলেন।"

এই অনন্য সাধারণ প্রতিভার অপূর্ব বাণী শোনবার জন্য বাংলা-দেশের ছোট-বড় সকলেই যখন উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল, ঠিক তখনই কালাজ্বর এসে তাঁকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। আমাদের পক্ষে এটা খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয়। প্রারম্ভেই সমাপ্তির এই শোকে বাংলা সাহিত্য চিরকাল দীর্ঘশ্বাস ফেলবে।

* * * *

অনেকেই মনে করেন, আমাদের দেশে কালাজ্বর বোধ হয় আর নেই। কিন্তু তা ঠিক নয়। কালাজ্বর এখনও আছে। কিন্তু রোগটা ঠিকমত ধরা পড়ে না, এবং তার চিকিৎসাও ঠিকমত হয় না! রোগী ভুগে ভুগে একসময় মরে যায়।

আগে আমাদের দেশের ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গানদীর উভয় তীর বরাবর আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর-প্রদেশের কয়েকটি জেলা, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ এবং অধুনা বাংলাদেশ কালাজ্বরের স্বাভাবিক বাসস্থান হিসাবে পরিগণিত হ'ত। বিগত কয়েক দশক পূর্বে, কালাজ্বরের
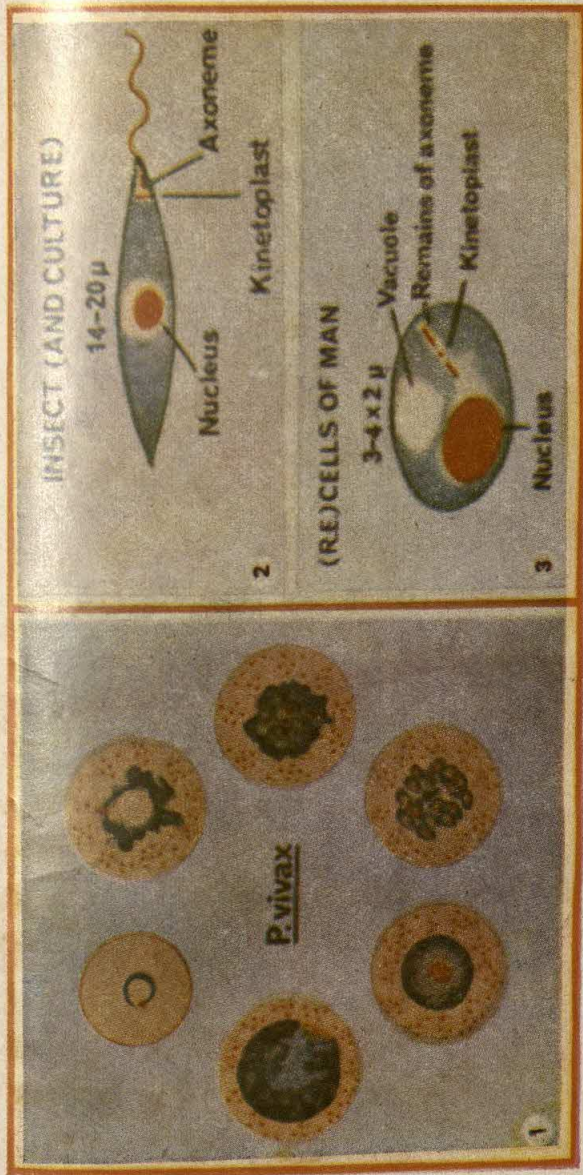
1. ম্যালেরিয়া রোগের জন্য দায়ী জীবাণু—প্লাস্‌মোডিয়াম ভাইভ্যাক্স। রক্তের লোহিত কণিকায় প্লাস্‌মোডিয়াম ভাইভ্যাক্স-এর জীবন-চক্র।
2. বালুকা-মাছির দেহে কালাজ্বরের জীবাণু।
3. মানুষের দেহে কালাজ্বরের জীবাণু।

[ডাঃ প্রদীপ কুমার রাহার সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

বিভিন্ন ফলপ্রদ ওষুধ ও হরেক রকমের কীট-পতঙ্গ নাশক আবিষ্কার এবং প্রয়োগের ফলে আমাদের দেশ থেকে ম্যালেরিয়ার মতো কালাজ্বরও প্রায় লোপ পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন আবার দেখা যাচ্ছে যে, বেশ কয়েক বছর ধরে প্রচুর পরিমাণে এবং নিয়মিতভাবে কীট-পতঙ্গ নাশক ওষুধ ব্যবহার না করার ফলে, মশা, মাছি, বালুকা-মাছি প্রভৃতি কীট-পতঙ্গগুলির অতিবৃদ্ধির ফলেই বোধ হয় আবার ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বরের করাল ছায়া আমাদের উপর পড়েছে।

১৯৮৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের একটি খবরে প্রকাশ, পশ্চিম-দিনাজপুর, মালদা, মুরশিদাবাদ, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলায় আবার কালাজ্বর দেখা দিয়েছে। জুলাই মাস পর্যন্ত, পশ্চিম-দিনাজপুরে ১,৫৫৯ জন, মালদায় ১৫৯ জন, মুরশিদাবাদে ৩৪২ জন এবং ২৪-পরগণায় ৩৪ জন এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা মনে করেন, এই রোগ এসেছে বিহার থেকে। কারণ, এই বছরের এপ্রিল পর্যন্ত, বিহারের পুর্ণিয়া জেলায় ১,৬৬২ জন কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন, এবং তার মধ্যে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে কাটিহারে ৩৫৪ জন এই রোগে আক্রান্ত হন, এবং তার মধ্যে ২ জনের মৃত্যু ঘটে। গত বছর পূর্ণিয়া জেলায় ৫,৫২৭ জন এই রোগে আক্রান্ত হন, মৃত্যু ঘটে ২৩ জনের। আর কাটিহারে আক্রান্ত হন ১,৪২৩ জন, মৃত্যু ঘটে ২ জনের। এজন্য ডাক্তাররা এখন খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। এযে খুবই আশঙ্কার কথা, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কারণ, কালাজ্বর একটি মারাত্মক এবং দীর্ঘস্থায়ী সংক্রামক ব্যাধি।

সুতরাং, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এবিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত, এবং কালাজ্বর রোগ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার।

কালাজ্বর (Kala-azar)-কে অনেক সময় দম দম জ্বরও বলা হয়। এই রোগের জন্য দায়ী প্রাটোজোয়া-জাতীয় জীবাণুর নাম

লীশ্‌ম্যানিয়া ডোনোভানি (*Leishmania donovani*)। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বিজ্ঞানী উইলিয়াম জুগ লীশম্যান কলকাতায় কালাজ্বর রোগীর প্লীহার কোমল অংশ থেকে এই পরজীবী আবিষ্কার করেন। আবিষ্কারকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই এই জীবাণুর এরূপ নামকরণ হয়েছে। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে রজার্স এই জীবাণুর লেজের মতো উপাঙ্গ আবিষ্কার করেন। তখন বোঝা যায় যে, এই জীবাণু কিছুটা রূপ পরিবর্তন করতে পারে।

ভারত, চীন, উত্তর-আফ্রিকা এবং আরও কতকগুলি গ্রীষ্মপ্রধান-দেশে এই রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী।

এই জীবাণুর বাহক হ'ল বালুকা-মাছি (Sand-fly)। লীশ্‌ম্যানিয়ার জীবনচক্রে দু'টি পোষক (Host)-এর প্রয়োজন হয়। কোন রোগগ্রস্ত মানুষকে (অথবা, কুকুরকে) বালুকা-মাছি কামড়ালে কালাজ্বরের জীবাণু (গোলাকার অবস্থার লীশ্‌ম্যানিয়া—অ্যামিস্টোগোট দশা) তার পাকস্থলীতে যায়।

সেখানে গিয়ে লীশ্‌ম্যানিয়া আকারে বড় হয় এবং সেই সঙ্গে সংখ্যায়ও বাড়ে। ক্রমশঃ লম্বাটে হয়, (অনেকটা মাকুর মতো), এবং তার লেজও দেখা দেয় (প্রম্যাস্টিগোট দশা)। তারপর এগুলি পাকস্থলী থেকে এসে গলবিল (Pharynx)-এ জমা হয়। এখানে এদের সংখ্যা এতো বেড়ে যায় যে, গলনালী প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে যায়। বালুকা-মাছির দেহে এই চক্রটি সম্পূর্ণ হতে প্রায় দশ দিন লাগে।

এরূপ বালুকা-মাছি যখন কোন সুস্থ মানুষকে (অথবা, কুকুরকে) কামড়ায়, তখন প্রথমেই তার দেহে এইসব লম্বাটে এবং অবাধে সন্তরণশীল জীবাণু ইন্‌জেকশন ক'রে দেয়, তারপর রক্ত শুষে নেয়। এজন্য সহজেই জীবাণু সংক্রামিত হয়। এই জীবাণু মানবদেহে গিয়ে আবার গোলাকার ধারণ করে (অ্যামিস্টোগোট দশা)। অ্যামিস্টোগোট দশার জীবাণু মানুষের প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতির

রেটিকিউলো এণ্ডোথেলিয়েল কোষের মধ্যে বাস ক'রে ঐ সব অঙ্গের বিকৃতি ঘটায়। এই জীবাণু কোষ-বিভাজন পদ্ধতিতে ক্রমাগত
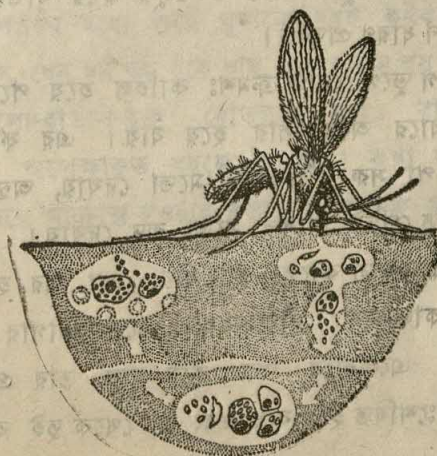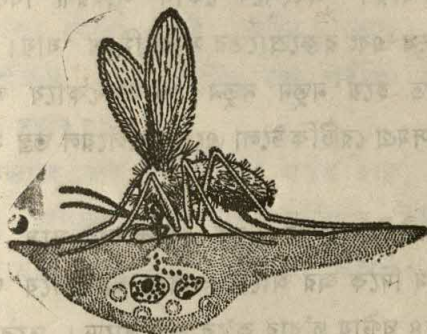
চিত্র ৩০। বালুকা-মাছি দ্বারা কালাজ্বর রোগ সংক্রমণের পদ্ধতি।

বংশবিস্তার করে। এক-একটি পোষক-কোষে ৫০ থেকে ২০০, অথবা তারও বেশী পরজীবী দেখা যায়। এজন্য পোষক কোষের আয়তন খুব বেড়ে যায়। অবশেষে কোষ আবরণী বিদীর্ণ ক'রে জীবাণু বেরিয়ে আসে এবং রক্তস্রোতের সঙ্গে মিশে যায়। তারপর রক্তস্রোতে প্রবাহিত হয়ে নতুন নতুন পোষক-কোষে অনুপ্রবেশ করে। এইভাবে সমগ্র রেটিকিউলো এণ্ডোথেলিয়েল তন্ত্র সংক্রামিত হয়।

মানবদেহে পরজীবী সংক্রমণের দুই থেকে চার মাস পরে জ্বর আরম্ভ হয়। প্রথম দিকে জ্বর আসে, আবার ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যায়। সাধারণতঃ ২৪ ঘণ্টায় দু'বার ক'রে জ্বর ছাড়ে। তবে জ্বর বেশী হলেও রোগীর বিকার হয় না, আর ক্ষুধা ভালই থাকে। বরং খাওয়ার প্রতি তীব্র আসক্তি দেখা যায়। রক্তে শ্বেতকণিকা লোহিত-কণিকা, এবং অনুচক্রিকার সংখ্যা কমে যায় ; এজন্য অত্যন্ত রক্তাল্পতা দেখা দেয়। আর গ্লোবিউলিন-জাতীয় প্রোটিনের পরিমাণ-বেড়ে যায়। যকৃৎ ও প্লীহার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে। অন্যান্য উপসর্গের মধ্যে থাকে—গায়ের চামড়া শুষ্ক, খসখসে ও কর্কশ হয়ে যাওয়া, মাথার চুল নীরস ও ভঙ্গুর হয়ে যাওয়া, কেশাল্পতা, দেহের কৃষ্ণবর্ণ ধারণ প্রভৃতি।

জ্বরে ভুগে ভুগে রোগী ক্রমশঃ কাহিল হয়ে পড়ে, এবং শেষ দিকে একেবারে অস্থিচর্মসার হয়ে যায়। এর ফলে, একদিকে রোগীর হাত-পা সরু প্যাকাটির মতো দেখায়, অন্যদিকে প্লীহার অতিবৃদ্ধি হেতু পেটটা ঢাকের মতো বড় দেখায়। রোগীর হাত-পা ও পেটের চামড়া কালো হয়ে যায়, এবং জ্বর হয়। তাইতো এর নাম কালাজ্বর। দীর্ঘদিন ধরে জ্বরে ভোগার ফলে রোগীর জীবনীশক্তি একেবারে ক্ষয় হয়ে যায়, তার প্রতিরোধ-শক্তি একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায়, এবং এক থেকে দুই বছরের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়।

যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশী, সেখানে ম্যালেরিয়ার সঙ্গে এর পার্থক্য বোঝা খুবই কঠিন। তবে অভিজ্ঞ ডাক্তার (প্যাথোলজিস্ট) দ্বারা রোগীর রক্ত পরীক্ষা করালে এই রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হলে, অভিজ্ঞ ডাক্তারের ব্যবস্থামত, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী আবিষ্কৃত 'ইউরিয়া ষ্টিবঅ্যামিন' নামক ওষুধের ইন্‌জেক্‌শন (শিরার ভিতরে) নিলে, এই রোগ সেরে যায়।

রোগ হওয়ার পরে সারিয়ে ফেলার চেয়ে রোগ যাতে না হয় সেদিকেই বেশী দৃষ্টি দেওয়া দরকার। বালুকা-মাছি এই রোগের বাহক। সুতরাং, যে-সব অঞ্চলে কালাজ্বরের প্রকোপ বেশী, সে-সব অঞ্চলে থাকতে হলে, প্রথমেই ডি. ডি. টি.-র সাহায্যে বালুকা-মাছি ধ্বংস করার বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে। বালুকা-মাছি আকারে মশার চেয়েও ছোট। কাজেই তার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে, আরও ঘন মশারি ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু গ্রীষ্ম-কালে এরূপ মশারির মধ্যে শুয়ে ঘুমানো খুবই কষ্টকর। কারণ, খুবই গরম লাগে, যেন দম বন্ধ হয়ে যায়, এরূপ মনে হয়।

প্রচুর আলো-বাতাস-যুক্ত দোতলার ঘরে, বালুকা-মাছির আক্রমণ থেকে অপেক্ষাকৃত সহজে আত্মরক্ষা করা যায়। আর তাহলে কালাজ্বরে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও অনেক কমে যায়।

যক্ষ্মারোগ ও তার প্রতিকার

'অনন্য প্রতিভা রামানুজন' গ্রন্থে রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,—

"বিশ্বের অনন্য-প্রতিভার ইতিহাসে ভারতীয় গণিতবিদ্ শ্রীনিবাস রামানুজন সত্যিই এক পরম বিস্ময়! মাত্র ৩২ বছরের জীবনকালে তিনি গণিতে যে অনন্য-সাধারণ প্রতিভার স্বর্ণ-স্বাক্ষর রেখে গেছেন তার তুলনা বিরল।...অথচ প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের পক্ষে যে পরিণত জীবনকাল, পর্যাপ্ত শিক্ষা, আর্থিক স্বচ্ছলতা ও অনুকূল পরিবেশ একান্ত প্রয়োজন, তার কোনটিই রামানুজনের ভাগ্যে জোটে নি। যে স্বল্প ক'টি বছর তিনি জীবিত থেকে গণিত সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন, তার অধিকাংশ সময়েই তাঁকে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল এবং প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়।

*   *   *   *

১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত পাঁচবছর কাল রামানুজন কেম্ব্রিজে অবস্থান করেছিলেন। এই পাঁচ বছরে যেসব গণিতজ্ঞ ও গণিত বিশারদের সংস্পর্শে রামানুজন এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই তাঁর অনন্য গণিত প্রতিভা, গণিত বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও বৈশিষ্ট্যে অভিভূত হয়েছিলেন।......

ইংল্যাণ্ডে পাঁচ বছর অবস্থানকালে রামানুজনের একুশটি গবেষণা-পত্র ইউরোপের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।......

ইউরোপের বিজ্ঞানীমহলে এই গবেষণাপত্রগুলি উচ্চ প্রশংসিত হয়। গণিতবিদ্যায় রামানুজনের অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিতে ইংল্যাণ্ডের রয়েল সোসাইটি ১৯১৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তাঁকে ফেলো নির্বাচিত করেন। যুক্তরাজ্যে বা তৎকালীন বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিজ্ঞানীমহলে এই 'এফ. আর. এস.' (F.R.S.) নির্বাচনকে সর্বোচ্চ সম্মান বলে মনে করা হত।

*   *   *   *

যে পাঁচ বছর রামানুজন কেম্‌ব্রিজে ছিলেন, সেই বছরগুলিতে তিনি গণিতচর্চা নিয়ে কঠিন মানসিক পরিশ্রম করেছিলেন। কিন্তু সেই অনুপাতে শরীরের প্রতি তিনি তেমন নজর দেন নি। ধর্মীয় সংস্কারের বশে তিনি বাইরে রান্না-করা কোনো খাদ্য আহার করতেন না, নিজের হাতে রান্না করে খেতেন।......সর্বোপরি দক্ষিণ ভারতে দুটি ঋতুর সঙ্গে রামানুজন পরিচিত ছিলেন—একটি হলো নাতিশীতোষ্ণ এবং অপরটি উষ্ণ। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে এসে তাঁকে সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি ঋতুর সম্মুখীন হতে হয়—একটি শীত এবং অপরটি অতি-শীত। একদিকে খাদ্যের অপুষ্টি, অপরদিকে অপরিচিত বিপরীত আবহাওয়া তাঁর শরীরের ওপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। ফলে তিনি যে ফুসফুসের ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হন, তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে! চিকিৎসার জন্যে রামানুজনকে ১৯১৭ সালের গ্রীষ্মকালে কেম্‌ব্রিজে একটি নার্সিং হোমে ভর্তি করা হলো। কিন্তু সেখানে বিশেষ সুফল পাওয়া গেল না। তখন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে তাঁকে প্রথমে ওয়েল্‌স-এর ও পরে লণ্ডনের একটি স্যানাটোরিয়ামে পাঠানো হয়। তাতে স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি দেখা গেল। কিন্তু তাঁর চিকিৎসকেরা সমস্ত দিক বিবেচনা করে পরামর্শ দিলেন ভারতে তাঁর পরিচিত আবহাওয়া ও আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে তাঁকে পাঠিয়ে দিলে স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে।

*   *   *   *

১৯১৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি রামানুজন 'নাগোয়া' জাহাজযোগে ইংল্যাণ্ডের তীরভূমি ছেড়ে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন।......

রামানুজন স্বদেশে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় গণিত সমিতি তাঁদের পয়লা এপ্রিলের সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। প্রস্তাবে বলা হয়ঃ 'প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ শ্রীনিবাস রামানুজন, এফ. আর. এস., দীর্ঘকাল কেম্‌ব্রিজে

থাকবায় পর অসুস্থ শরীরে মাদ্রাজে ফিরে এসেছেন। তাঁর অনন্য গণিতপ্রতিভা ও মূল্যবান মৌলিক অবদানের দ্বারা তিনি বিশ্বের দরবারে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। আমরা তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি এবং একান্তভাবে প্রার্থনা করি তিনি স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করে পূর্ণ উদ্যমে বিজ্ঞানজগতে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল কাজ সম্পাদন করুন।'

* * * *

১৯২০ সালে জানুয়ারীর গোড়ায় রামানুজনকে মাদ্রাজে নিয়ে আসা হলো এবং তাঁর জন্যে যতদূর সম্ভব সর্বোত্তম চিকিৎসা-ব্যবস্থা করা হলো। এই সময় কয়েকজন মহানুভব ব্যক্তি তাঁর চিকিৎসার জন্যে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এবং রাও বাহাদুর নাম্বেরুমল চেট্টি। শ্রীআয়েঙ্গার এই সময় রামানুজনের চিকিৎসার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন এবং শ্রীচেট্টি বিনা ভাড়ায় তাঁর নিজস্ব বাড়িটি রামানুজনের জন্যে ছেড়ে দেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সদস্যরাও রামানুজনের প্রতি তাঁদের কর্তব্য পালনে পশ্চাদ্‌পদ হন নি। তাঁরা প্রত্যেকে রামানুজনের যথোপযুক্ত চিকিৎসাব্যবস্থার জন্যে ব্যক্তিগতভাবে অর্থদান করেন। মাদ্রাজের যে অঞ্চলে শ্রীচেট্টির আবাসে রামানুজনকে রাখা হয়েছিল, সে অঞ্চলটি 'চেতপেট' নামে পরিচিত। তাই রামানুজন তাঁর স্ত্রীকে ঠাট্টাচ্ছলে বলেছিলেন : 'ওঁরা আমাকে চেতপেট-এ নিয়ে এসেছেন, যেখানে সব কিছুই হয় চেত-পা (তামিল-হিন্দীতে যার অর্থ হলো চটপট)।' রামানুজন কি তাঁর প্রস্থানের পূর্বাভাস পেয়েছিলেন ?

* * * *

দূরারোগ্য ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯১৯—২০ সালে তিনি যখন ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসে চেতপেটে শয্যাশায়ী হয়েছিলেন, তাঁর সেই অন্তিমকালের এক অন্তরঙ্গ চিত্র আমরা পাই তাঁর শ্যালক

শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের প্রতিবেদন-এ। তিনি লিখেছেন: 'রামানুজন তখন একটি আসবাবহীন বাড়িতে মাটিতে মাদুরের ওপর বালিশে মাথা দিয়ে সব সময় শুয়ে থাকতেন। সে সময় যন্ত্রণা ও দুর্বলতার দরুণ তিনি খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর চোখেমুখে বা কথাবার্তায় তার কোনো প্রতিফলন দেখা যেত না। এমন কি, কাউকে চিৎকার করে তিনি কথা বলতেন না, বা কোনরকম বিরক্তি প্রকাশ করতেন না। তিনি শয্যাশায়ী হয়ে না থাকলে কেউ বুঝতে পারতেন না যে, এই মানুষটি এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছেন।'

* * * *

মাদ্রাজে এসে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও রামানুজনের গণিতচর্চায় ভাঁটা পড়ে নি। মাদ্রাজে আসবার কয়েকদিন পরেই তিনি তাঁর গণিতচর্চার বিষয়ে অধ্যাপক হার্ডিকে চিঠি লিখেছেন। কিন্তু তাঁর শরীরের অবস্থা দিনের দিন খারাপ হতে লাগলো। তাঁর অমূল্য জীবন রক্ষার জন্যে আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, শুভাকাঙ্খী সুহৃদ সকলের সর্বপ্রকার চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। ১৯২০ সালের ২৬ এপ্রিল মাদ্রাজের উপকণ্ঠে চেতপেটের বাসভবনে আধুনিক বিজ্ঞানজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ রামানুজন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।"

মারাত্মক যক্ষ্মারোগে রামানুজনের অকাল প্রয়াণের কথা ভাবলে আমাদের মন বিষাদে ভরে ওঠে। এমনি ক'রে আরও কত প্রতিভা যে অকালে ঝরে গেছে তার হিসাব কে রাখে!

* * * *

যক্ষ্মা একটি অতি প্রাচীন রোগ। ফুসফুসের ক্ষয়রোগ হিসেবে প্রাচীন গ্রীসেও এর কথা জানা ছিল। আমাদের আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রেও ক্ষয়রোগের কথা বলা হয়েছে। এই রোগ যেমন মারাত্মক তেমনি সংক্রামক।

সভ্যতার অতি প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত চিকিৎসা-শাস্ত্রের

প্রভূত উন্নতি হয়েছে, একথা ঠিক, কিন্তু তা সত্ত্বেও যক্ষ্মা-রোগ সম্পূর্ণরূপে মানুষের আয়ত্বাধীন হয়েছে এমন কথা আজও নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না। কারণ, সমগ্র পৃথিবীতে এখনও প্রতিবছর প্রায় ৪০—৫০ লক্ষ লোক যক্ষ্মা রোগে মারা যায়। ১৯৮১ সালের একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, ভারতে প্রতি বছর প্রায় ৮ লক্ষ লোক যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়, এবং তার মধ্যে মারা যায় প্রায় নয় হাজার! আর পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্ত হয় প্রায় ৩ লক্ষ, এবং মারা যায় প্রায় নয়শ'! ভারতের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যপীড়িত, বারো মাস অপুষ্টিতে ভোগে। তাছাড়া এখানকার জনসাধারণ জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে অত্যন্ত উদাসীন। তাই বড় বড় শহরের ধোঁয়া এবং ধূলিধূসরিত অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় এই ব্যাধি ভয়াবহ দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে, এবং এখনও পড়ছে। ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসের মেডিক্যাল গেজেটে প্রকাশিত একটি তালিকা নীচে দেওয়া হ'ল। এ থেকে সহজেই বোঝা যাবে, অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনায় ভারতে মৃত্যুর হার কত বেশী। এর চল্লিশ বছর পরেও যে এখানে অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়েছে, এমন কথা বলা যায় না।

১ নং তালিকা। যক্ষ্মা-রোগে মৃত্যুর হার (১৯৪১)

শহরের নাম	প্রতি লক্ষ মানুষের মধ্যে মৃত্যুর হার
লণ্ডন — —	৯৬
প্যারিস — —	১৭৭
মেক্সিকো — —	১৭০
নিউ ইয়র্ক — —	১২৮
বার্লিন — —	১২০
বোম্বাই — —	১৪০
কলিকাতা — —	২৩০
মাদ্রাজ — —	১৯০

জার্মান বিজ্ঞানী রবার্ট কক্, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে, যক্ষ্মা-রোগের জীবাণু 'টিউবারক্‌ল্ ব্যাসিলাস' (Tubercle Bacillus) সংক্ষেপে 'টিবি' (T. B.) আবিষ্কার করেন, (ল্যাটিন, *Tuberculus*=little bump=গুটিকা)। আবিষ্কর্তার নামানুসারে একে অনেক সময় কক্-এর ব্যাসিলাসও বলা হয়। তিন রকম জীবাণুর কথা জানা গেছে—(১) মানবদেহের, (২) গবাদি পশুর, এবং (৩) পাখির। প্রথম দু'রকম জীবাণুই মানবদেহে যক্ষ্মা-রোগ সংক্রমণ করতে পারে।

যক্ষ্মা-রোগের জীবাণু প্রধানতঃ রোগীর হাঁচি-কাশি মারফৎ, সূক্ষ্ম বারিবিন্দুসদৃশ থুথু ও সিক্‌নির সাহায্যে, প্রশ্বাসের সঙ্গে অপরের দেহে প্রবেশ করে (Droplet infection)। আবার যেখানে সেখানে থুথু ফেললে, এবং তা সূর্যতাপে অথবা অন্যভাবে বিনষ্ট না হলে, ধূলোবালির সঙ্গে মিশে, প্রশ্বাসের সঙ্গে অন্যের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। তাছাড়া রোগীর এঁটো খেলে, অথবা হোটেল বা রেস্তোরাঁতে নোংরা অপরিষ্কার পাত্রে চা সরবত ইত্যাদি খেলেও এই রোগ সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই জাতীয় জীবাণু ফুসফুসে, শ্বাসনলে, পাকস্থলীতে, এমন কি হাড়ের মধ্যেও বিস্তার লাভ করতে পারে। ফুসফুসের যক্ষ্মা-রোগে (Pulmonary tuberculosis) এই জীবাণু ফুসফুসে বাসা বাঁধে, এবং রোগীর কাশি থুথু প্রভৃতির সাহায্যে এই জীবাণু চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যক্ষ্মা-জীবাণু দীর্ঘকাল নিষ্ক্রিয় থাকার পরেও, অনুকূল পরিস্থিতিতে, আবার সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। সূর্যরশ্মির 'অতি বেগুনী রশ্মি' (Ultraviolet rays) এই জীবাণুর পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক।

ক্ষয়-রোগগ্রস্ত গরুর দুধে যক্ষ্মার জীবাণু থাকে। এরূপ দুধ কখনও ভাল ক'রে না ফুটিয়ে, কিংবা পাস্তুরিত না ক'রে, খাওয়া উচিত নয়। আর গরুর যাতে যক্ষ্মা-রোগ না হয়, সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার।

কোনো শিশুই যক্ষ্মা-রোগসহ জন্মায় না। যে কোন ভাবে রোগ-জীবাণু সংক্রমণের ফলেই এই রোগ হয়ে থাকে। আর যে-কোন বয়সের যে-কোনও লোকেরই যক্ষ্মা-রোগ হতে পারে। ভারতে সাধারণতঃ ২৫—৩৫ বয়সের লোকদের মধ্যেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। আর সাধারণতঃ স্ত্রী-লোকদের চেয়ে পুরুষরাই এই রোগে বেশী আক্রান্ত হয়।

অল্প বয়সে দেহের মধ্যে যক্ষ্মা-জীবাণু প্রবেশ করলে, একদিকে বর্ধিষ্ণু যক্ষ্মা-জীবাণুদের আক্রমণ, অপরদিকে দেহের সামগ্রিক প্রতিরোধ-শক্তির ক্রমবর্ধমান সংঘাত, ক্রমাগত চলতে থাকে। এর ফলে অনেক সময় ফুসফুসে ছোট ছোট গুটিকা (nodule) উৎপন্ন হয় (Ghon's focus), কিংবা জীবাণুরা বন্দীদশা প্রাপ্ত হয়ে চুনময় খোলস দ্বারা আবৃত গ্রন্থি (Calcified gland) সৃষ্টি করে। প্রাথমিক সংক্রমণ কাটিয়ে উঠবার সময়, ছোটদের সাধারণভাবে শরীর খারাপ চলতে থাকে, এবং মাঝে মাঝে জ্বর হয়। কয়েক মাস ধরে সে ক্রমাগত এই রকম ভুগতে থাকে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে একসময় একেবারে সুস্থ হয়ে ওঠে।

কখনও কখনও, শৈশবে, কৈশোরে অথবা যৌবনে, প্রাথমিক সংক্রমণের পরে বক্ষ-গহ্বরে জল জমে যায় (Pleural effusion)। এই রোগের নাম 'প্লুরিসি' (Pleurisy)। একে যক্ষ্মা-রোগেরই বিপদ-সঙ্কেত বলেই মনে করা উচিত, এবং সেজন্য সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

যক্ষ্মা-রোগ সংক্রামিত হলে, প্রথম অবস্থায় ঘুসঘুসে জ্বর ও কাশি আরম্ভ হয়। কিছুদিন বাদে কাশির সঙ্গে রক্ত পড়তে থাকে। এছাড়া হজমের গোলমাল, অবসাদ, শারীরিক দুর্বলতা, ওজন হ্রাস, শ্বাসকষ্ট, নিশা-ঘাম (Night sweats) ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। রাতের আঁধারে চোর যেমন চুপিসারে গৃহস্থের ঘরে ঢুকে তার যথাসর্বস্ব অপহরণ করে, যক্ষ্মা-জীবাণুও তেমনি আমাদের অজ্ঞাতসারে

দেহে প্রবেশ ক'রে আমাদের সর্বনাশ ঘটায়। যতদিন দেহের প্রতিরোধ-শক্তি প্রবল থাকে, ততদিন দেহ ব্যাধিমুক্ত থাকে। কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে, কিংবা পুষ্টির অভাবে, দেহ ক্ষীণবল হলেই জীবাণু আধিপত্য বিস্তার ক'রে ক্রমশঃ ফুসফুসে ক্ষত সৃষ্টি করে। এর ফলে অচিরেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগ মাত্রই নিষ্করুণ। কিন্তু সকল রোগের মধ্যে যক্ষ্মা-রোগ অত্যন্ত ক্রূর এবং নিষ্ঠুর। তিলে তিলে হত্যা করে।

বিজ্ঞানীদের মতে, শহরবাসী অধিকাংশ লোকের দেহেই এই জীবাণু থাকে, কিন্তু তারা রোগগ্রস্ত হয় না, কারণ দেহের রোগ-প্রতিরোধক শক্তি তাদের সুস্থ থাকতে সাহায্য করে। সেই জন্য যারা দুর্বল, দীর্ঘকাল রোগে ভুগছে, অথবা যারা পুষ্টিকর খাবার খেতে পায় না, আলো-বাতাসহীন স্যাঁতস্যাঁতে বাড়িতে অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় বাস করতে বাধ্য হয়, অথবা যারা কারখানার শ্রমিক, অর্থাৎ যাদের কম খাদ্য খেয়ে অত্যধিক কায়িক পরিশ্রম করতে হয়, তাদের মধ্যেই এ রোগ ছড়াবার বেশী সম্ভাবনা থাকে। এ ছাড়া কোন কারণে দেহের স্বাস্থ্য এবং মনের স্ফূর্তি নষ্ট হলেও এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। দুঃখের বিষয় এই যে, এই রোগের লক্ষণগুলি প্রকাশ পাওয়ার আগেই রোগ-জীবাণুদের সংখ্যা এতো বেশী বেড়ে যায়, এবং তারা ফুসফুসে ক্ষত সৃষ্টি ক'রে এমন স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধে ফেলে যে, তাদের ধ্বংস ক'রে তারপর রোগীকে নীরোগ ক'রে তোলা একরূপ অসম্ভব হয়ে পড়ে বলা চলে। কাজেই কিছুদিন ধরে সর্দি, কাশি, কিংবা ঘুসঘুসে জ্বর চলতে থাকলে, একটুও অবহেলা না ক'রে, অবিলম্বে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। সন্দেহের কারণ থাকলে, থুথু পরীক্ষা করা, বুকের এক্স-রে ছবি নেওয়া এবং টিউবারকুলিন-পরীক্ষা করা দরকার। যক্ষ্মা-রোগ হয়ে থাকলে, এতেই নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যাবে। একেবারে প্রথম অবস্থায় রোগ ধরা পড়লে, এবং

সুপরিকল্পিভাবে চিকিৎসা করা হলে, সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করা যায়। আর এ বিষয়ে অবহেলা করলে, এবং সময়মত সাবধান না হলে, সে তো মারা যাবেই, তার উপর আরও অনেককে এই রোগে সংক্রামিত ক'রে তাদের জীবনও বিপন্ন করবে।

যক্ষ্মা-রোগের চিকিৎসা কঠিন। তার কারণ, এই জীবাণুর ওষুধের প্রতিরোধ করার শক্তি অত্যন্ত বেশী। শুষ্ক থুথুতে এদের মাসান্তে, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে দশ মাস পরেও, সজীব থাকতে দেখা গেছে। থুথু শুকিয়ে নেবার পর, ১০০° সেল্‌সিয়াসে (অর্থাৎ, যে উষ্ণতায় জল ফুটতে থাকে) কুড়ি মিনিট পর্যন্ত রেখে দিলেও এই জীবাণু মরে না। এমন কি শতকরা তিনভাগ সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড দ্রবণের সংস্পর্শে থাকলেও এই জীবাণুর কিছুই হয় না। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল, এর দেহের চারিদিকে পাতলা মোমের মতো একটা আবরণ থাকে। ওষুধ, দেহের রক্ত-কণিকা, অথবা অন্য জীবাণুদ্বারা আক্রান্ত হলে, সে এই খোলসের মধ্যে ঢুকে আত্মরক্ষা করে, এবং পরে আবার অনুকূল পরিবেশ পেলে, সে আবার বংশ-বিস্তার করতে থাকে। মোমের আবরণ ভেদ ক'রে জীবাণুকে ধ্বংস করতে পারে, এরকম ওষুধ পাওয়া কঠিন। কারণ, বিজ্ঞানীদের জানা সেই রকম পদার্থ সবই জীবদেহেও বিষ-ক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যক্ষ্মা-রোগের চিকিৎসায় এতকাল এইটাই ছিল সবচেয়ে বড় সমস্যা।

যক্ষ্মা-রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে, সর্বপ্রথম আগেকার মামুলী চিকিৎসা-পদ্ধতিগুলির কথা বলে নেওয়া দরকার। রোগ প্রকাশ পেলেই তখন নিয়মিতভাবে ক্যাল্‌সিয়াম ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া হ'ত, যাতে দেহের রোগ-প্রতিরোধক শক্তি বেড়ে যায়। এই সময় নানাপ্রকার পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল করার দিকেও নজর দেওয়া উচিৎ।

এক সময় যক্ষ্মা-রোগের প্রধান চিকিৎসাই ছিল 'এ. পি.' (A. P.

=Artificial Pneumothorax)। এর উদ্দেশ্য হ'ল সূচী-প্রয়োগ ক'রে বক্ষ-গহ্বরের মধ্যে বাতাস ঢুকিয়ে চাপ দিয়ে (Air pressure) রোগগ্রস্ত ফুসফুসটিকে সম্পূর্ণ-নিষ্ক্রিয় ক'রে রাখা। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এটুকু সহজেই বুঝতে পারি যে, কনুই কিংবা হাঁটুতে কোনো ক্ষত হ'লে, অঙ্গ-সঞ্চালন করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়। আর জোর ক'রে তা করলে, ক্ষত শুকাতে অনেক দেরী হয়। অপরদিকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে পারলে, ক্ষত বেশ তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। আমাদের শ্বাসক্রিয়া অবিরামভাবে চলে। আর শ্বাসক্রিয়া যতক্ষণ চলে, ততক্ষণ আমাদের ফুসফুস একটুও বিশ্রাম পায় না; প্রসারিত হয় কিংবা সঙ্কুচিত হয়। এই জন্য ফুসফুসের যক্ষ্মাজনিত ক্ষত সহজে শুকাতে চায় না। আমাদের বুকের দু'পাশে দু'টো ফুসফুস আছে। কাজেই যে পাশের ফুসফুসে ক্ষত থাকে, সেই পাশে এ. পি.' (A. P.) ক'রে সেই ফুসফুসটিকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। এই সময় অন্য পাশের ফুসফুসটির সাহায্যেই রোগী কোন প্রকারে শ্বাসকার্য চালাতে পারে। এদিকে বিশ্রাম পাওয়ায়, অনেক সহজেই ঐ ফুসফুসের ক্ষত শুকিয়ে যেতে পারে।

এই রোগে অনেক সময় ফুসফুসের বহির্ভাগ বুকের দেওয়ালের সঙ্গে জুড়ে যায়। তখন 'এ. পি.' (A. P.) ক'রে কোনো লাভ হয় না। এই অবস্থায় অনেক সময় অপারেশন ক'রে পাঁজরার কয়েকটি হাড় কেটে বাদ দেওয়া হয়। এর ফলে বুকের পেশীর চাপে সেদিককার ফুসফুস নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে বলে অল্পদিনের মধ্যেই সেখানকার ক্ষত শুকিয়ে যায়। এরূপ অপারেশনের নাম 'থোরোকোপ্লাষ্টি' (Thoracoplasty)।

বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত সাধনার ফলে যুদ্ধোত্তরকালে আমরা দু'টো মহদুপকারী ওষুধ পেয়েছি—একটি পেনিসিলিন (Penicillin), আর একটি স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন (Streptomycin)। অনেকের

মতে, পেনিসিলিন যদি আবিষ্কৃত না হ'ত, তাহলে ১৯৪৪ সালে আবিষ্কৃত স্ট্রেপ্টোমাইসিনই বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ওষুধ বলে স্বীকৃত হ'ত। প্রাথমিক পরীক্ষাতেই বোঝা গেল যে, টাইফয়েড, প্যারা-টাইফয়েড, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ প্রভৃতি কয়েকটি মারাত্মক এবং দুরারোগ্য ব্যাধির বেলায় এর সাহায্যে চিকিৎসা করা সম্ভব। এতকাল যক্ষ্মা-রোগের জন্য বলতে গেলে কোনো ওষুধই ছিল না। কাজেই স্ট্রেপ্টোমাইসিন-এর সাহায্যে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হ'ল, এবং অল্পদিনের মধ্যেই নিশ্চিতরূপে বোঝা গেল যে, এর যক্ষ্মা-জীবাণু ধ্বংস করার শক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, অথচ এর বিষক্রিয়া এতো কম যে, একে নির্ভয়ে অধিক মাত্রায় মানবদেহে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

এর অল্প কিছুদিন পরে 'প্যারা-অ্যামাইনো-স্যালিসাইলিক অ্যাসিড' (Para-Amino-Salicylic acid), সংক্ষেপে 'পাস্' (**PAS**), এবং তারপর 'আইসো নিকোটিনিক অ্যাসিড হাইড্রাজাইড' (Iso-Nicotinic acid Hydrazide, commonly known as Isoniazid) সংক্ষেপে 'আই. এন. এইচ.' (INH), নামক আরও দু'টি ওষুধের ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। আই. এন. এইচ-এর ক্রিয়ায় যক্ষ্মা-জীবাণুর বৃদ্ধি ব্যাহত হয় (Tuberculostatic)। এজন্য এর সঙ্গে স্ট্রেপ্টোমাইসিন্ প্রয়োগ করলে, তা আরও বেশী কার্যকরী হয়।

প্রথম দিকে, শুধু স্ট্রেপ্টোমাইসিন দিয়ে চিকিৎসা করার সময়, এর দু'টো ত্রুটি ধরা পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে রোগমুক্ত হওয়ার পরে রোগের পুনরাক্রমণ ঘটে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে সুফল পাওয়া যায়, কিন্তু কতকগুলি জীবাণু এমন প্রতিরোধ-শক্তি অর্জন করে যে, তাদের আর কিছুতেই ধ্বংস করা যায় না। এজন্য রোগীকে সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত করা আর সম্ভব হয় না।

এর প্রতিকারকল্পে আজকাল প্রথমেই এই ওষুধের মাত্রা খুব বেশী ক'রে দেওয়া হয়। এতে জীবাণুগুলি আর প্রতিরোধশক্তি অর্জন করার সুযোগ পায় না। তাই সহজেই ধ্বংস হয়ে যায়।

অভিজ্ঞতার ফলে আরও জানা গেছে যে, একটি মাত্র ওষুধ প্রয়োগ করলে, জীবাণু অপেক্ষাকৃত সহজে প্রতিরোধ-শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু একাধিক ওষুধ একসঙ্গে প্রয়োগ করলে, তা সম্ভব হয় না। এজন্য ডাক্তাররা এখন একটি মাত্র ওষুধ ব্যবহার না ক'রে, একযোগে দু'টি বা তিনটি ওষুধ প্রয়োগ ক'রে থাকেন। এতে আরও ভাল ফল পাওয়া যায়, এবং অনেক সহজেই রোগীকে সম্পূর্ণ নিরাময় করা সম্ভব হয়।

যক্ষ্মা দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি। কাজেই এর চিকিৎসাও দীর্ঘদিন ধরেই চালাতে হয়। অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শমত উপরিউক্ত ওষুধগুলি নিয়মিত ব্যবহার করলে, অল্পদিনের মধ্যেই সুফল পাওয়া যায়। অর্থাৎ, জ্বর ও কাশি কমে যায়, রোগী সুস্থ বোধ করতে থাকে এবং রোগীর ক্ষুধা বাড়ে। এই সময় তার খাদ্য ও পুষ্টির দিকেও বিশেষ নজর দিতে হয়। তাহলে তার শরীর ভাল হয়ে যায় এবং ওজনও বাড়তে থাকে।

এইভাবে বেশ কিছুদিন চিকিৎসা চালাবার পর যখন আর ডাক্তারী পরীক্ষায় রোগের অস্তিত্ব ধরা পড়বে না, তখনও দীর্ঘদিন পর্যন্ত ডাক্তারের উপদেশমত ওষুধ ও পথ্য গ্রহণ করতে হবে। সর্বদা সুসংযত ও সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করতে হবে, কোন রকম অনিয়ম-অত্যাচার চলবে না। অসাবধান হলে, কিংবা অনিয়ম-অত্যাচার করলে, সহজেই রোগের পুনরাক্রমণ ঘটে। চিকিৎসার ফলে সেরে উঠছে এইরূপ রোগীকে কোনো স্বাস্থ্যকর স্থানে স্যানাটোরিয়ামে (Sanatorium)-এ রাখতে পারলেই ভাল হয়। এই ভাবে সবদিক দিয়ে খুব সাবধান হয়ে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা চালাতে পারলে, তবেই সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হওয়া সম্ভব। তাছাড়া রোগীকে

এইভাবে সঙ্গরোধ ক'রে রাখার ফলে, অন্য সুস্থ মানুষের মধ্যে এই রোগ সংক্রমণের আশঙ্কাও অনেক কমে যায়।

উল্লেখ্য যে, অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এই রোগের পুনরাক্রমণ হওয়ার সম্ভবনা থাকে। এজন্য প্রতি ছয় মাস অন্তর বুকের এক্স-রে ছবি নিয়ে, এবং থুথু পরীক্ষা ক'রে, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ থাকতে হবে। এ বিষয়ে অবহেলা করলে, কিংবা অনিয়ম ও অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিলে, তার জন্য অত্যন্ত কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হতে পারে। তখন প্রাণ-বিসর্জন ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না।

যক্ষ্মা-রোগ প্রতিরোধের জন্যে বি. সি. জি. টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। এজন্য অল্পবয়সেই 'টিউবারকুলিন-পরীক্ষা' ক'রে জনসমষ্টিকে 'পজিটিভ' ও 'নেগেটিভ' এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যারা 'নেগেটিভ', অর্থাৎ যাদের দেহে কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটে না, তাদের বি. সি. জি. টিকা দেওয়া হয়। এর ফলে তারা যক্ষ্মা-রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-শক্তি অর্জন করতে পারে। এই অবস্থায় দেহের মধ্যে যক্ষ্মা-জীবাণু প্রবেশ করলেও আর যক্ষ্মা-রোগে আক্রান্ত হওয়ার কোনো ভয় থাকে না।

মানুষের সুদীর্ঘকালের সাধনার ফলে এইটুকু নিশ্চিতরূপে বোঝা গেছে যে, একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় রোগ ধরা পড়লে, এবং অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সুপরিকল্পিতভাবে চিকিৎসা করাতে পারলে, এই মারাত্মক ব্যাধি থেকেও সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করা যায়। তবে যক্ষ্মা-রোগের চিকিৎসা যেমন ব্যয়বহুল তেমনি সময় সাপেক্ষ। কিন্তু যে হতভাগ্যের বেলায় এতো ব্যয়-বহুল চিকিৎসা চালানো এবং ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না, কিংবা যার বেলায় উপরিউক্ত কোনো চিকিৎসা-ব্যবস্থাতেই সুফল পাওয়া যায় না, তাকে বাঁচিয়ে রাখা, কিংবা সম্পূর্ণ সুস্থ ক'রে তোলা মানুষের অসাধ্য। এইরূপ রোগী তিল তিল ক'রে নিশ্চিত

মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়, এবং চারিদিকে রোগ-জীবাণু ছড়িয়ে সমাজজীবন বিপন্ন ক'রে তোলে। এজন্য যক্ষ্মা-রোগ সম্বন্ধে শঙ্কান্বিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ এখনও আছে।

ভীতিপ্রদ যক্ষ্মার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে, একদিকে রোগীকে কোনো স্বাস্থ্যকর স্থানে স্যানাটোরিয়ামে বা স্বাস্থ্যনিবাসে রেখে সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে হবে, যাতে সে রোগ ছড়াতে না পারে। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য এবং অপুষ্টি দূর করার এবং সেই সঙ্গে জনস্বাস্থ্যের মান উন্নয়ন করার দিকে আরও বেশী ক'রে নজর দিতে হবে। দেশীয় সরকারের এবং সমাজের সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের এবিষয়ে এখনও অনেক কিছু করার আছে।

কুষ্ঠরোগ ও তার প্রতিকার

কৃষ্ণতনয় বীর শাম্ব অসামান্য রূপবান। কৃষ্ণের ষোল হাজার রমণী তাঁর সঙ্গলাভে আকুল। পিতা কৃষ্ণের কানে কথাটা তুললেন দেবর্ষি নারদ। পিতার বিচিত্র অসূয়া তাই অভিশাপ হয়ে নেমে এল পুত্র শাম্বের জীবনে।

"কৃষ্ণ অতঃপর তাকালেন বজ্রাহত বিস্মিত ভীত অধোমুখ শাম্বর দিকে। শাম্বর অসামান্য রূপের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হলো। পুত্রকে তিনি অভিশম্পাত করলেন, 'তোমার এই রমণীমোহন রূপ নিপাত যাক। কুষ্ঠরোগের কুশ্রীতা তোমাকে গ্রাস করুক।'

*　　　*　　　*　　　*

শাম্বর নগর প্রাকারের বাইরে সকলের চোখের অন্তরালে সমুদ্রোপকূলবর্তী বালুবেলায়, বৎসরান্তে বাসের আগেই, পিতার অভিশাপ এবং ভবিতব্য সমগ্র দেহে অতি উৎকটরূপে প্রকটিত হলো।......

শাম্বর সহসা মনে হলো, পিতার কাছে যাওয়া উচিত।......

শাম্ব বললেন, 'মহর্ষি আমাকে পথের নির্দেশ দিয়েছেন। যথাস্থানে পেঁছুতে আমার কতদিন লাগবে, তা আমি জানি না। অতএব যতো শীঘ্র সম্ভব, আমি যাত্রা করতে ইচ্ছুক। আপনি আমাকে বিদায় দিন।' এই বলে তিনি নতজানু হয়ে পিতার পদ-যুগল স্পর্শ করে মাথায় ঠেকালেন।

পুরুষোত্তমের অন্তর বিচলিত হলো। তিনি তাঁর ঔরসজাত সেই অত্যুজ্জ্বল রূপবান বংশধরের দিকে করুণ চোখে তাকালেন। দেখলেন, তাঁর নাসিকা-মধ্যস্থল দুই গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ভগ্ন। তাঁর ভ্রূযুগল কেশহীন, সমস্ত মুখমণ্ডল মলিন কালিমালিপ্ত এবং তাম্রাভ, কোথাও রক্তাভ শুষ্ক ঘা এবং অতি পলিত। বিশাল চক্ষুদ্বয়ের

কৃষ্ণপুচ্ছ সকল পতিত হয়েছে, ফলে চোখ অতি রক্তাভ দগদগে দেখাচ্ছে। তাঁর সমগ্র দেহের চর্ম স্ফীত, বিবর্ণ, হাত পা বিকলাঙ্গের ন্যায়। কেবলমাত্র চোখের দৃষ্টি অতি করুণ অসহায়।

কৃষ্ণ বললেন, 'এই দূরপথের যাত্রায় তুমি কী কী গ্রহণযোগ্য মনে করো?'

শাম্ব বললেন, 'কিছুই না। আমি অভিশপ্ত, মু্ক্তির সন্ধান ছাড়া কিছুই আমার গ্রহণীয় না।'

* * * *

শাম্বর বুকে যেন বিদ্যুতের ঝলক হেনে গেল। দেখলেন, তাঁর সামনে যে কজন এসে দাঁড়িয়েছে, তারা সকলেই তাঁর মতো কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত। শাম্ব এবং তাদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো। কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখা গেল, কয়েকজন কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত রমণীও সামনে এসে দাঁড়ালো। যাদের দু-একজনের কোলে শিশু। আশ্চর্য, শিশুরা কেউ রোগগ্রস্ত না।......

একজন বললো, 'আমরা রোজ সকালে চন্দ্রভাগায় নেয়ে, মন্দিরে গড় করে ভিক্ষে করতে বেরোই। আর এ সময়ে এসে ভিক্ষার অন্ন ফুটিয়ে খাই।'

অন্য একজন বললো, 'আমরা সংসারও করি। এই সব মেয়ে-ছেলেরা প্রতি বছরই পোয়াতি হয়, আর বাচ্চা বিয়োয়।'

ভগ্নকেশ, বিকলাঙ্গ, বিবর্ণ, পুচ্ছহীন রক্তচক্ষু রমণীরা সবাই হেসে উঠলো, এবং একজন বললো, 'আমাদের বাচ্চাগুলো প্রথমে খুব ফুটফুটে হয়ে জন্মায়। চার পাঁচ বছর বয়স হলেই ওরা আস্তে আস্তে আমাদের মতন হয়ে যায়।'

একটি রমণী তার বুকের ফুটফুটে শিশুটিকে দেখিয়ে বললো, 'এই দ্যাখো, এখন কেমন সুন্দর দেখতে। ও আমার পেটেই জন্মেছে। ওর বাবারও কুষ্ঠ ছিল, দুদিন হলো মরে গেছে। আমার এই ছেলে যখন একটু বড় হবে, তখন ওরও কুষ্ঠ হবে।'......

* * * *

শাম্ব (ঋষিকে) বললেন, 'আমি সাত ঋতু অতিক্রম করে এখানে এসে পৌঁছেছি। আমি শত শত গ্রাম জনপদ ও নগরীর মধ্য দিয়ে এসেছি। অধিবাসীদের আমাকে দেখে ভয় ও ঘৃণার জন্য, তাদের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র রাগ হয়নি। আমি নিজেকে দিয়েই তাদের মনোভাব বিচার করেছি। তথাপি তারা আমাকে খেতে দিয়েছে। দুরন্ত বর্ষায়, তীব্র শীতে, খামারে গোয়ালের ধারে বহির্বাটির মাথাঢাকা দাওয়ায় থাকতে কোনো বাধা দেয়নি। সারমেয়কুল সর্বত্রই একরকম এবং অবোধ বালক-বালিকাগণও। তারা আমাকে নানাভাবে তাড়া করেছে, পীড়ন করেছে। কিন্তু আমি রাগ করিনি। পরমাত্মার কাছে তাদের সুমতির প্রার্থনা করেছি। তবে হে মহাত্মন্, গৃহত্যাগ করার পরে, আপনার মতো দয়াময় ব্যক্তির সাক্ষাৎ আমি এই প্রথম পেলাম ; তাতে আমার এই প্রত্যয় জন্মেছে, হয়তো আমি সিদ্ধিলাভ করতে পারবো।'......

ঋষি স্বস্তিবাক্য উচ্চারণ করে বললেন, 'তোমার বিশ্বাসই তোমাকে উত্তরণের পথে নিয়ে যাবে।......যে-দ্বাদশ নামে গ্রহরাজ অভিহিত হয়ে থাকেন, আমি সেই নাম সকল বলছি। আদিত্য, সবিত্র, সূর্য, মিহির, অর্ক, প্রভাকর, মার্তণ্ড, ভাস্কর, ভানু, চিত্রভানু, দিবাকর, রবি। এই দ্বাদশ নাম ও দ্বাদশ রূপে তিনি দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ তীর্থ ও নদ নদীতে, অতি ক্রিয়াশীল থাকেন। দ্বাদশ মাসে, দ্বাদশ দিনে সেই সব নদ নদীতে স্নান ও রশ্মিযুক্ত হলে, ব্যাধির আরোগ্য ঘটে।'

* * * *

শাম্ব যাত্রার আগেই গণনা করেছিলেন, শিশু থেকে বৃদ্ধ, নানা বয়সের নরনারী সর্বসাকুল্যে সত্তরজন ছিল। দ্বাদশ স্থানে ও নদ-নদীতে স্নান করে দ্বাদশ মাস পরে তিনি যখন আবার চন্দ্রভাগাকূলে অস্তাচলমান স্থানে ফিরে এলেন, তখন তাঁকে বাদ দিয়ে চৌদ্দজন

মাত্র জীবিত। বাকি কিছু সংখ্যক ব্যতিরেকে, সকলেই পথিমধ্যে প্রাণত্যাগ করেছে। কেউ কেউ ব্যাধির অতি প্রাবল্যে মারা গিয়েছে।......কিছু সংখ্যক লোক নানা স্থানে থেকে গিয়েছে।......

শাম্ব যে-চৌদ্দজনকে নিয়ে ফিরে এলেন, তাদের মধ্যে তিনজন রমণী, দুইটি বালক-বালিকা, বাকি সকলেই পুরুষ। তাদের সকলের বিকৃত দেহে একটি পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। শাম্ব যেমন অনুভব করেছেন, ক্ষীণতর হলেও তাঁর সম্পূর্ণ অসাড় দেহে, এই এক বৎসরের মধ্যে অনুভূতিবোধ ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হচ্ছে, বাকি চৌদ্দ-জনের অভিজ্ঞতাও তাঁর মতোই। ভ্রূ বা মস্তকের কেশের ভঙ্গুরতা ও পতন বন্ধ হয়েছে। তাঁর মতো, পুরুষদের সকলের গুম্ফ ও শ্মশ্রুও এখন অভগ্ন ও ঘন। দেহের ক্ষয় ও ক্ষতের বৃদ্ধিলাভ ঘটেনি। যদিও অনেক সঙ্গীকে হারাতে হয়েছে এবং সকলেই শোকার্ত তথাপি সকলের মধ্যেই নবজীবন লাভের একটি উদ্দীপনা জেগেছে।"

কৃষ্ণপুত্র শাম্ব কীভাবে অভিশপ্ত হলেন, এবং তারপর সেই অভিশপ্ত জীবন থেকে কী ক'রে মুক্ত হলেন, তারই এক অসামান্য কাহিনী শুনিয়েছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক "কালকূট" তাঁর "শাম্ব" নামক ভ্রমণোপন্যাসে।

* * * *

সভ্যতার অতি প্রাচীনকাল থেকেই কুষ্ঠ-রোগের কথা জানা ছিল। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে কুষ্ঠ-রোগের কথা বলা হয়েছে। মিশরের প্রাচীন প্যাপিরাস-পুঁথি এবং শিলালিপিতেও কুষ্ঠ-রোগের উল্লেখ আছে। তাছাড়া বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'-এও এই রোগের উল্লেখ আছে। আর বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক অ্যারিস্টটল ৩৪৫ অব্দে এশিয়া মাইনরে এই রোগের অস্তিত্ব সম্পর্কে বলেছেন।

এর পরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—আগে আফ্রিকা, ভারতবর্ষ এবং চীনদেশেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল

অত্যন্ত বেশী। তবে মধ্যযুগে এই রোগ অত্যন্ত ব্যাপকভাবে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকের ধারণা, তুর্কী মুসলমানদের হাত থেকে জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে ইউরোপে যে-সব খ্রীষ্টান ক্রুসেড (Crusade) বা ধর্মযুদ্ধে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো মধ্যপ্রাচ্য থেকে এই রোগের বীজ বহন ক'রে নিয়ে আসেন। এই কুৎসিত ব্যাধির সংক্রমণ বন্ধ ক'রবার উদ্দেশ্যে তখন ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সরকার আইন ক'রে কুষ্ঠ-রোগীদের পৃথক ক'রে রাখবার ব্যবস্থা করেন। অপরদিকে সেন্ট লাজার (St. Lazare)-এর চেষ্টায় হতভাগ্য কুষ্ঠ-রোগীদের চিকিৎসার জন্যে তখন কতকগুলি পৃথক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই রকম হাসপাতালের নাম দেওয়া হয় 'লাজারেটো' (Lazaretto—Lazare House)।* এর ফলে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যেই ইউরোপে কুষ্ঠ-রোগীর সংখ্যা উল্লেখ-যোগ্য ভাবে হ্রাস পায়। সাধারণভাবে উষ্ণমণ্ডলের সমুদ্রতীরবর্তী আর্দ্র, স্যাঁৎস্যাঁতে ও দারিদ্র্যপীড়িত দেশগুলিতেই এই রোগের প্রকোপ বেশী। ১৯৮৪ সালের একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, সারা পৃথিবীতে কুষ্ঠ-রোগীর সংখ্যা ১ কোটি ৫০ লক্ষ, তার মধ্যে ভারতেই প্রায় ৪০ লক্ষ। অর্থাৎ, বিশ্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কুষ্ঠরোগী আছে

---

* St. Lazare, the patron saint of lepers, took its name from a house for lepers founded by a religious and military order called Lazarists in the time of the Crusades.

Lazaretto—Name given to a hospital or place of detention for persons suffering from a contagious disease. It was also known as a pest house. The term is derived from Lazarus, the begger.

Lazarus, in the parable of the callous rich man, is the begger, who lay at his gate full of sores. The sores were supposed to be due to leprosy.

ভারতে। আর ১৯৮১ সালের একটি হিসেব থেকে জানা গেছে, ভারতে প্রায় ২৫ লক্ষ কুষ্ঠ রোগীর চিকিৎসা করা হয়, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ছিল প্রায় দেড় লক্ষ। এমন রোগী অনেক আছে, যাদের রোগ ধরা পড়ে না। তাই তারা
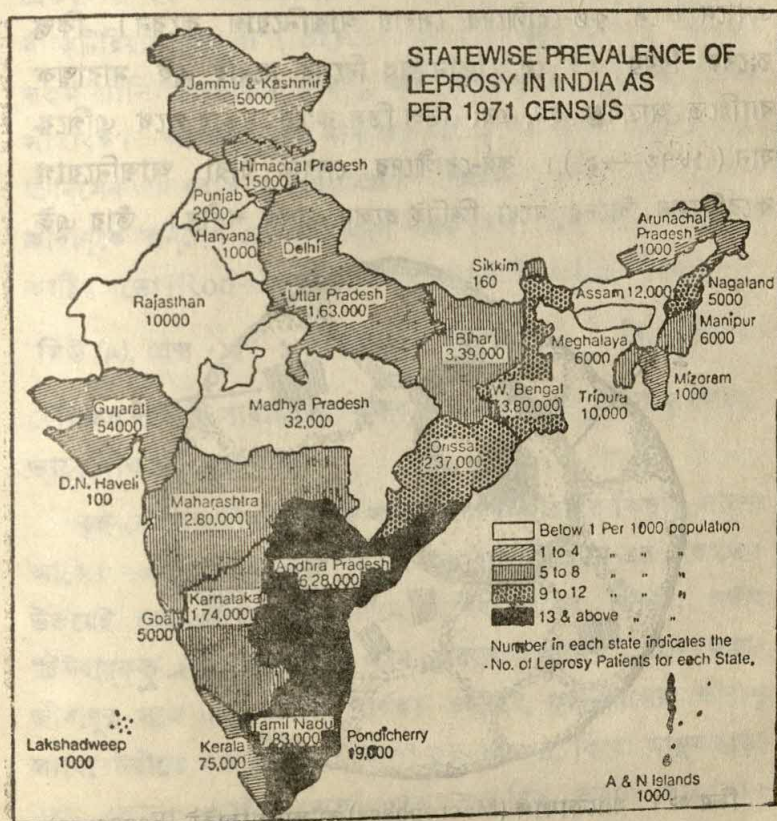
চিত্র ৩১। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কুষ্ঠ-রোগের প্রকোপ।
(১৯৭১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী।)

চিকিৎসিত হয় না। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ তামিলনাড়ু প্রভৃতি অঞ্চলে বরাবরই এই রোগ বেশী দেখা যায়। তাছাড়া ব্রহ্মদেশ এবং আফ্রিকার কোন কোন দেশে, বিশেষ ক'রে নাইজেরিয়ায়, এইরূপ রোগীর সংখ্যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (প্রতি

২০ জনের মধ্যে এক জন)। এই প্রসঙ্গে আরও একটি জায়গার নাম করতে হয়। কুষ্ঠ-রোগীদের একটা বড় রকমের উপনিবেশ আছে হাওয়াই (পূর্বনাম স্যাণ্ডউইচ) দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত মলোকাই দ্বীপে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ধর্মপ্রাণ ফাদার দামিয়েন এখানে এসে কুষ্ঠ-রোগীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি অল্প দিনের মধ্যেই এই মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, এবং তিল তিল ক'রে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যান (১৮৭৩—৮৯)। কুষ্ঠ-রোগীদের সেবায় যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনিই হলেন প্রথম শহীদ। তাঁর এই
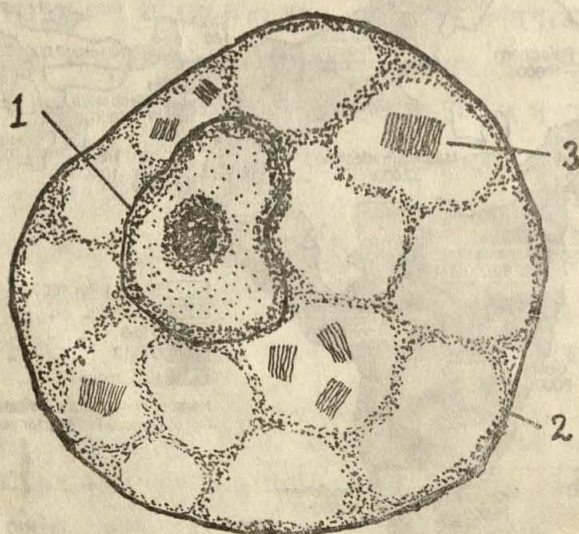
চিত্র ৩২। ম্যাক্রোফাজ (Macrophage) বা ফ্যাগোসাইট (Fagocyte), অর্থাৎ কুষ্ঠ-জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কোষ (Lepra cell)। 1. নিউক্লিয়াস ; 2. কোষ-প্রাচীর ; 3. কতকগুলি ব্যাসিলি দলবদ্ধভাবে রয়েছে।

মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তীকালে আরও অনেকেই কুষ্ঠ-রোগীদের সেবাকেই জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেন। এজন্য ইতিহাসের পাতায় ফাদার দামিয়েনের নাম চিরকাল লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে।

কুষ্ঠ একপ্রকার দীর্ঘস্থায়ী সংক্রামক ব্যাধি। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে নরওয়ের চিকিৎসা-বিজ্ঞানী গেরহার্ড হেন্‌রিক আরমান্‌স্ হ্যান্‌সেন এই রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন (তবে এ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে)। এর নাম দেওয়া হয় 'মাইকো-ব্যাক্‌টিরিয়াম লেপ্‌রী' (*Mycobacterium leprae*)। এটি এক রকম ব্যাসিলাস-জাতীয় জীবাণু, আপাতদৃষ্টিতে শুধু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আবিষ্কারকের নাম অনুযায়ী অনেক সময় কুষ্ঠ-রোগকে 'হ্যান্‌সেন-এর রোগ' (Hansen's disease), এবং কুষ্ঠ-রোগের জীবাণুকে 'হ্যন্‌সেন-এর ব্যাসিলাস' বলা হয়। এই জীবাণু দেখতে কাঠির মতো (Rod-shaped), সোজা অথবা ঈষৎ বাঁকা; দৈর্ঘ্য ১—৭ মিউ (μ), প্রস্থ ০·২—১·৪ মিউ (μ) (১ মিউ= $\frac{১}{১০০০}$ মিলিমিটার)। রোগগ্রস্ত কোষে সাধারণতঃ কতকগুলি জীবাণুকে একসঙ্গে দলবদ্ধ-ভাবে থাকতে দেখা যায়।

কুষ্ঠ-রোগের জীবাণুর সঙ্গে যক্ষ্মা-রোগের জীবাণুর কিছুটা সাদৃশ্য আছে। এই দু'রকম জীবাণুই মাইকোব্যাক্‌টিরিয়াম-এর অন্তর্গত। উভয়েই দেহকোষের ধ্বংসসাধনে বিশেষ ধরনের বিকৃতি, অর্থাৎ 'টিউবার্‌ক্‌ল' (Tubercle) গঠন করতে পারে। তবে যক্ষ্মা-জীবাণুর সঙ্গে এর প্রধান পার্থক্য এই যে, কুষ্ঠ-রোগের জীবাণু ল্যাবরেটরীতে কাল্‌চার (বা, চাষ) করা যায় না, কিংবা মানুষ ছাড়া আর কোনও প্রাণীর দেহে একে সংক্রমিত করাও যায় না। কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে গবেষণা ক'রবার পক্ষে এই হ'ল সর্বপ্রধান অন্তরায়।

জনৈক বিজ্ঞানী বলেছেন—Leprosy is a plant with two types of flowers ; অর্থাৎ একই গাছে যেন দু'রকম ফুল। একই রোগ-জীবাণু লেপ্রী অবস্থাবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকাশ করে। সংক্রমণ ক্ষমতার নিরিখে এদের প্রধানতঃ দু'টি ভাগে ভাগ

করা হয়—অসংক্রামক এবং সংক্রামক কুষ্ঠ। উল্লেখ্য যে, ভারতে কুষ্ঠরোগের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগই অসংক্রামক ধরনের কুষ্ঠ।

অসংক্রামক কুষ্ঠ তাকেই বলা হয়, যেখানে দেহে সংক্রমিত হওয়ার পর রোগ-জীবাণু কেবল দেহের মধ্যেই আবদ্ধ থাকছে, দেহকোষ ধ্বস করছে, রোগের লক্ষণ প্রকাশ করছে, কিন্তু দেহের বাইরে আসছে না, কিংবা আসার কোনো প্রবণতাও প্রকাশ করছে না। অপরদিকে যেক্ষেত্রে কুষ্ঠ-জীবাণু আক্রান্ত দেহের অংশ-বিশেষকে ধ্বংস ক'রেই কেবল ক্ষান্ত থাকছে না, সহজেই দেহের বাইরে আসছে, অন্য সুস্থ মানুষের দেহে সংক্রমণ ঘটাতে সক্ষম হচ্ছে, তখন সেরূপ কুষ্ঠকে বলা হবে সংক্রামক কুষ্ঠ।

এই রোগ-জীবাণু ঠিক কিভাবে মানুষের দেহে প্রবেশ করে, তা নিশ্চয় ক'রে বলা কঠিন। তবে সাধারণভাবে দেখা যায় যে, বহুদিন ধরে সংক্রামক কুষ্ঠ-রোগীর নিকট-সংস্পর্শে থাকলে এই রোগ সহজেই সংক্রামিত হয়। দেহের মধ্যে রোগ-জীবাণু প্রবেশ করলে, কতদিনের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাবে, তা নিশ্চয় ক'রে বলা কঠিন—কয়েক সপ্তাহ লাগতে পারে, আবার কয়েক বছরও লাগতে পারে।

কুষ্ঠ-রোগীর ক্ষত-নিঃসৃত রসে রোগ-জীবাণু থাকে। সম্ভবতঃ নাক, মুখ বা গলার শ্লৈষিক ঝিল্লীর ভিতর দিয়েই এই জীবাণু প্রথমে দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। তারপর সেখান থেকে লসিকা-সংক্রান্ত (Lymphatic) অথবা চামড়ার নীচের (Subcutaneous) টিস্যুর ভিতর দিয়ে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে।

কুষ্ঠকে বাহ্যত চর্মরোগ বলে মনে হয়। কিন্তু আসলে এটি মানুষের নার্ভ বা স্নায়ুতন্ত্র বিনষ্টকারী একপ্রকার রোগ। রোগের প্রাথমিক লক্ষণ হিসাবে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, দেহের কোন কোন জায়গায়, যেমন—হাত, পা, মুখমণ্ডল, পিঠের দু'পাশ, দাবনা প্রভৃতি স্থানে, হয়তো চামড়ার উপরে খানিকটা জায়গা জুড়ে সাদা

দাগ (Hypopigmentation) দেখা দিয়েছে। এ ধরনের দাগই এক বা একের বেশী থাকতে পারে। এখানে স্পর্শ, তাপ ও ব্যথার অনুভূতি ক্রমশঃ কমে যায়। এখান থেকে লোম ঝরে পড়ে। ফলে জায়গাটা চকচকে ও মসৃণ দেখায়। এখানে ঘাম হয় না। ক্রমে চামড়ার নীচের পেশী ও নার্ভ বা স্নায়ু আক্রান্ত হয়। এর ফলে হাত ও পায়ের আঙ্গুল নাড়াবার ক্ষমতা লোপ পাওয়া, হাত ও পায়ের চেটো ঝুলে পড়া এবং আঙ্গুল বেঁকে যাওয়া এবং চোখ ও মুখের পেশী অবশ হয়ে যাওয়া প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে (Tuberculoid type) রোগ অনেক কম সংক্রামক।

কুষ্ঠ-রোগের প্রকাশ আর এক ধরনেরও হতে পারে (Lepro-metous type), যা অত্যন্ত সংক্রামক। এক্ষেত্রে রোগীর চামড়া মোটা হয়ে যায়, নাক ও কান ছ'টি ক্রমশঃ বড় ও মোটা হয়ে ওঠে এবং গাল ছ'টি ছ-পাশে ঝুলে পড়ে। এজন্য রোগীর মুখ অনেকটা সিংহের মতো দেখায় (Leonine face)। এই অবস্থায় রোগীর গোটা মুখমণ্ডল, বিশেষ ক'রে নাক, কান ও ঠোঁট বেশ ফোলা ফোলা ও রসাল দেখায়। ত্বকও বেশ চকচকে হয়। দেখে মনে হয় যেন স্বাস্থ্য ফেটে পড়ছে। এই অবস্থায় মাঝে মাঝে জ্বর হওয়া সম্ভব।

সময়মত চিকিৎসা না হলে, রোগীর নাক, কান বা আঙ্গুলের গুটিকা (Nodule) ফেটে রস গড়াতে থাকে, এবং ঘা হয়ে যায়। ক্রমে চামড়ার নীচের পেশী আক্রান্ত হয়। সেই সঙ্গে নাক এবং হাত ও পায়ের আঙ্গুলের হাড়ও আক্রান্ত হয় (Necrosis of small bones)। এতে নাকের তরুণাস্থি নষ্ট হয়ে যায় বলে রোগীর নাক বসে যায়, এবং রোগীর মুখ কদাকার দেখায়। আর হাড় ক্ষয়ে যায় বলে হাত বা পায়ের আঙ্গুল বেঁকে যায়, কিংবা হাত বা পায়ের অগ্রভাগ ক্রমশঃ খসে যেতে থাকে। এই রকম অবস্থাই সবচেয়ে মারাত্মক।

দেহে উৎপন্ন লক্ষণসমূহ দেখে প্রাথমিক বিচার করলেও, সঠিক

সিদ্ধান্তে আসার জন্য, 'স্মিয়ার টেস্ট' করতে হয়। এর ফলে দেহে লেপ্রীর অস্তিত্ব, সংখ্যাগতভাবে তার পরিমাণ এবং আরও কতকগুলি প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যায়। এইভাবে কুষ্ঠের সেই বিশেষ অবস্থার শ্রেণীবিভাগ ক'রে তারপর তার প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

কুষ্ঠ-রোগ বংশানুক্রমিক নয়। কিন্তু দেখা গেছে, শিশুরা সহজেই এই রোগে আক্রান্ত হয়। এর কারণ কি? বিজ্ঞানীরা বলেন, পিতা বা মাতা কারও এই রোগ থাকলে, তারাই হয়তো শিশুকে আদর করতে গিয়ে, নিজেদের অজ্ঞাতসারেই, এই মারাত্মক রোগ সংক্রামিত করেন। সুতরাং, শিশুদের কুষ্ঠ-রোগীর সংস্পর্শ থেকে যথাসম্ভব দূরে রাখাই বাঞ্ছনীয়।

কুষ্ঠ-রোগের চিকিৎসায় বহুকাল যাবৎ চালমুগরার তেল (Hydnocarpus oil) বা কাসতেল ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি এক জাতীয় বন্য বৃক্ষ। এই গাছের ফলের বীজ থেকে যে তেল পাওয়া যায়, তাই কুষ্ঠ-রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আগেকার দিনে রোগীকে এই তেল নিদিষ্ট মাত্রায় খাওয়ানো হ'ত। পরে নানারূপ গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, এই তৈলজাত ওষুধের ইন্‌জেক্‌শন দিলে আরও ভাল ফল পাওয়া যায়। তবে কেবলমাত্র অসংক্রামক কুষ্ঠ, অথবা সংক্রামক কুষ্ঠের একেবারে প্রথম অবস্থায়, কিছুটা উপকার হয়।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে একজন রসায়ন-বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণাগারে একটি সাদা গুঁড়া প্রস্তুত করেন। এর নাম ডাই-অ্যামিনো ডাই-ফিনাইল সাল্‌ফোন (Diamino-Diphenyl-Sulphone, সংক্ষেপে D. D. S.)। এই অখ্যাত বিজ্ঞানী নিছক কৌতূহলের বশবর্তী হয়েও যদি ওষুধটি সাধারণ জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ ক'রে দেখতেন তাহলে একটি মহদুপকারী ওষুধ আবিষ্কারের দুর্লভ সম্মান হয়তো তিনিই অর্জন করতেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হ'ল না।

এই ঘটনার সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর পরের কথা। ইতিমধ্যে চিকিৎসা-শাস্ত্রে এসেছে যুগান্তর, বিজ্ঞানীরা সাল্‌ফার-ঘটিত ওষুধের (Sulfa-drugs) ব্যবহার শুরু করেছেন। প্রাথমিক সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বিজ্ঞানীরা নানা অজ্ঞাত উৎস থেকে নানারূপ উপকারী ওষুধ আবিষ্কার করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে জানা এবং অজানা সবরকম সাল্‌ফার-ঘটিত ওষুধ নিয়েও তাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু ক'রে দিলেন। এজন্যে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বিজ্ঞানী বাট্‌ল্ (Buttle) ডাই-অ্যামিনো ডাই-ফিনাইল সাল্‌ফোন নামক ওষুধটি আবার নতুন ক'রে তৈরি করেন। তিনি পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, এই ওষুধটি রক্তবিষাক্তকারী জীবাণু 'স্ট্রেপ্‌টোকক্কাই' অতি সহজেই বিনষ্ট করতে পারে। এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ক্রিয়া দেখা গেল যক্ষ্মা-রোগাক্রান্ত গিনিপিগের উপর। এই ওষুধের সাহায্যে পরীক্ষাগারে অনেক যক্ষ্মা-রোগাক্রান্ত প্রাণীকে রোগমুক্ত করা সম্ভব হ'ল। কিন্তু মানবদেহে প্রয়োগ ক'রে একে অত্যধিক বিষাক্ত এবং ব্যবহারের অনুপযোগী বলে মনে করা হ'ল। এজন্য বাট্‌ল্ ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এর আণবিক গঠনে সামান্য পরিবর্তন সাধন ক'রে সাল্‌ফিট্রোন (Sulfitrone) নামে আর একটি নতুন ওষুধ তৈরি করেন। কিন্তু এর গুণাগুণ সঠিকভাবে নির্ণয় করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হ'ল না।

এরপর ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বিজ্ঞানী ব্রাউনলি (Brownly) এবং তাঁর সহকর্মিগণ সব রকম সাল্‌ফোন-জাতীয় ওষুধ নিয়ে ধারা-বাহিক ও ব্যাপকভাবে পরীক্ষা শুরু করেন। তাঁরা দেখেন, অনেক ওষুধেরই রোগ-জীবাণু ধ্বংস করার ক্ষমতা থাকে বটে, কিন্তু জীবদেহে বেশীমাত্রায় প্রয়োগ করলে, নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অনেক সময় অপ্রত্যাশিতভাবে এমন কতকগুলি উপসর্গ দেখা দেয়, যার ফলে জীবটি অচিরেই প্রাণ হারায়। অবশেষে সাল্‌ফিট্রোন নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষার পর তাঁরা বুঝলেন, অনেক দিন ধরে অল্প মাত্রায় ওষুধটি প্রয়োগ করলে, এর সাহায্যে কুষ্ঠ ও যক্ষ্মা-রোগগ্রস্ত প্রাণীকে

রোগমুক্ত করা সম্ভব হবে, অথচ কোনরূপ বিষক্রিয়া দেখা দেবে না। এই পরীক্ষায় উৎসাহিত হয়ে একদল বিজ্ঞানী ভারতবর্ষে এবং আফ্রিকায় খুব সাবধানতার সঙ্গে মানবদেহে এই ওষুধের পরীক্ষা শুরু করেন। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের অনেক দিনের অধ্যবসায় শেষ পর্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হ'ল।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ডাক্তার কক্‌রেন (Cochrane)-এর অধীনে মাদ্রাজে সাল্‌ফিট্রোনের যে ব্যাপক পরীক্ষা হয়, তার ফল খুবই সন্তোষজনক হ'ল। এতে উৎসাহিত হয়ে আর একদল বিজ্ঞানী ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আফ্রিকার উজুয়াকল নামক জায়গায় ব্যাপক পরীক্ষা শুরু করেন, এবং আশাতিরিক্ত ফল পান। এজন্যে সাল্‌ফিট্রোন তখনকার মতো কুষ্ঠ-রোগের একটি অমোঘ ওষুধ বলে সর্বত্র সমাদর লাভ করে।

এই বিষয়ে গবেষণা ক'রবার সময় ডাক্তার কক্‌রেনের হঠাৎ কি খেয়াল হ'ল, তিনি একদিন অতি পুরাতন, কিন্তু বিষাক্ত বলে পরিত্যক্ত, সেই ওষুধ ডাই-অ্যামিনো ডাই-ফিনাইল সাল্‌ফোন নিয়ে আবার পরীক্ষা শুরু করলেন। বিজ্ঞানী কক্‌রেনের অক্লান্ত সাধনার ফলে বিষাক্ত ওষুধও অমৃতপ্রসূ হ'ল। এর সাহায্যে কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত মানুষকে সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত করা সম্ভব হ'ল। কক্‌রেনের ব্যবস্থামত আফ্রিকায় এই ওষুধটি ব্যবহার ক'রেও নিশ্চিত ফল পাওয়া গেছে। ওষুধটি খুবই শক্তিশালী, অল্প অল্প ক'রে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করলে, তবেই এথেকে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়। রোগীর সহ্য ক'রবার ক্ষমতা অনুযায়ী, সাধারণতঃ প্রতিদিন ২৫ থেকে ১০০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত দেওয়া হয়। [সুবিধাজনক বলে সাধারণতঃ ট্যাবলেট বা বড়ি দেওয়া হয়ে থাকে ; যেমন—ড্যাপসোন (Dapson)। তবে প্রয়োজন হলে ইন্‌জেক্‌শনও দেওয়া হয়।] কিন্তু ছয় দিনে মোট ৬০০ মিলিগ্রামের বেশী কখনও দেওয়া হয় না। এরপর একদিনের বিশ্রাম দিয়ে ওষুধের পুনরাবৃত্তি করা হয়। এভাবে

সুদীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে চিকিৎসা চালানো হয়, অবশ্য যদি প্রয়োজন হয় তবেই।

উল্লেখ্য যে, রোগীর অবস্থা অনুযায়ী চিকিৎসাকালের হেরফের ঘটে। তবে অসংক্রামক কুষ্ঠের বেলায় ২ থেকে ৫ বছর নিয়মিত ভাবে চিকিৎসা করালে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই রোগ একেবারে সেরে যায়। কিন্তু সংক্রামক কুষ্ঠের বেলায় আরও দীর্ঘকাল ধরে চিকিৎসা চালাতে হয়, ৩ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সারা জীবন ধরেই চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হয়।

দীর্ঘদিন ধরে রোগীর চিকিৎসা চালাতে হয়, একথা সত্যি। কিন্তু এই ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করাতে খরচ খুব বেশী হয় না। কারণ, ওষুধের দাম খুবই কম। আজকালকার দিনেও চিকিৎসা-ব্যয় দৈনিক ২৫ পয়সার বেশী হয় না। তাছাড়া সরকারী হাসপাতালে কিংবা বিভিন্ন কুষ্ঠ-চিকিৎসাকেন্দ্রে রোগীদের এই ওষুধ বিনা পয়সায় দেওয়া হয়। সুতরাং, চিকিৎসা-ব্যয় কখনও রোগীদের কাছে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এই ওষুধেও রোগ একেবারে সারে না। আপাতদৃষ্টিতে রোগ সেরে যাবার কিছুদিন পরে রোগের পুনরাবির্ভাব ঘটতে দেখা যায়। এজন্য ডাক্তাররা এখন ডি. ডি. এস-এর সঙ্গে আরও ওষুধ প্রয়োগ করার ব্যবস্থা চালু করেছেন। এই জাতীয় ওষুধের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য থায়োসেমিকার্বাজোন (Thio-semicarbazone)। তারপরই নাম করতে হয় থায়োইউরিয়া (Thiourea) নামক ওষুধটির। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, ডি. ডি. এস. এবং এই ওষুধ যুগপৎ ব্যবহার করলে, চিকিৎসার সময়সীমা অনেকাংশে কমিয়ে আনা যায়, তাছাড়া এতে রোগের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনাও অনেক কমে যায়।

আগেই বলা হয়েছে যে, যক্ষ্মা-জীবাণুর সঙ্গে কুষ্ঠ-জীবাণুর কিছু মিল আছে। এজন্যে বিজ্ঞানীরা যক্ষ্মা-রোগের প্রচলিত চিকিৎসা-

ব্যবস্থা এক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন, এবং তাতে মোটামুটি সন্তোষজনক ফললাভ করেছেন। এজন্য সাধারণতঃ স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন (Streptomycin) এবং আইসোনিয়াজিড (Isoniazid) যুগপৎ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

খ্রীষ্টান মিশনারীদের চেষ্টায় কুষ্ঠ-রোগীদের জন্য ভারতের প্রথম কুষ্ঠাশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতার কাছে গোবরায়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। এর নাম দেওয়া হয় 'অ্যাল্‌বার্ট ভিক্টর লেপ্রসি হস্‌পিটাল'। এর কিছুদিন পরেই বারাণসীর কাছে এরূপ আরও একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর কলকাতার 'স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন'-এ কুষ্ঠ-রোগীদের জন্য একটি চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা হয়। আর বাঁকুড়ায় প্রতিষ্ঠা করা হয় 'গৌরীপুর লেপ্রসি ট্রিটমেন্ট অ্যাণ্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার'। সম্প্রতি পুরুলিয়াতেও একটি চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা হয়েছে।

বর্তমানে ভারতে আরও যে-সব চিকিৎসা-কেন্দ্র আছে। তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—(1) Gandhi Memorial Leprosy Foundation Centre (Andhra Pradesh), (2) Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chingleput (Tamil Nadu), (3) Lady Willingdon Leprosy Sanatorium, Chingleput (Tamil Nadu), (4) Silver Jubilee Children's-Clinic, Saidapet (Tamil Nadu)।

আর যে-সব স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কুষ্ঠ-রোগীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তাদের সংখ্যা চৌত্রিশ। প্রায় সব কয়টিই ভারত সরকার থেকে প্রচুর অর্থ-সাহায্য পেয়ে থাকেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল—(1) Misson to Lepers, (2) Hind Kusht Nivaran Sangh, (3) Maharogi Seva Mandal, (4) Gandhi Memorial Leprosy Foundation,

(5) Ramkrishna Mission, (6) Vidarbha Maharogi Seva Mandal। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বেচ্ছাসেবকদের করুণা ও অনুকম্পার মনোভাব নিয়ে কুষ্ঠরোগীদের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করা উচিত।

চিকিৎসকরা বলেন, কুষ্ঠ-রোগ সংক্রমণের জন্য দায়ী প্রধানতঃ তিনটি 'S', যেমন—Seed, Soil, and Surrounding; অর্থাৎ কুষ্ঠ-রোগী, যে রোগের বীজ বহন করছে, উপযুক্ত ক্ষেত্র, যেখানে রোগজীবাণু খুব সহজেই সংক্রামিত হচ্ছে, এবং উপযুক্ত পরিবেশ, যার মধ্যে আছে সমুদ্রতীরবর্তী উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া, অপুষ্টি, বংশগতভাবে রোগ-প্রবণতা ইত্যাদি। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, পৃথিবীতে এখনও লক্ষ লক্ষ অচিকিৎসিত কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত মানুষ আছে। এর প্রধান কারণ অজ্ঞতা, আর রোগ গোপণ করার প্রবণতা। তাছাড়া কুষ্ঠকে অনেকেই অন্যান্য চর্মরোগের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন। বেশীর ভাগ রোগীই নিজের রোগগ্রস্ত অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারেন না। তাই অবহেলা করেন, সময়মত চিকিৎসা করান না। সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার ভয়েও অনেক রোগাক্রান্ত মানুষ চিকিৎসিত হওয়ার সহজাত প্রবৃত্তিকে চেপে রাখে। কিন্তু সকলেরই মনে রাখা দরকার যে, কুষ্ঠ নিরাময়যোগ্য। একেবারে প্রাথমিক অবস্থায়ই রোগ ধরতে পারলে, এবং সময়মত রোগীর কাছে ওষুধ পৌঁছে দিতে পারলে, নিশ্চয়ই অলৌকিক ফল পাওয়া যাবে। কদাকার-বিকলাঙ্গ হওয়ার কোনো ভয় থাকবে না। এজন্য রোগের প্রাথমিক লক্ষণগুলি প্রকাশ পেলে, সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে গিয়ে রোগ নির্ণয় করা দরকার। বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংস্থা (W. H. O.)-এর অধীনস্থ আন্তর্জাতিক কর্মীদল এই পুরনো শত্রুকে বশে আনবার উদ্দেশ্যে নানা দেশে দিবারাত্রি কাজ করে যাচ্ছেন। এঁদের কাজের প্রধান অঙ্গ তিনটি, যেমন—সমীক্ষা (Survey), শিক্ষা (Education) এবং চিকিৎসা (Treatment),

সংক্ষেপে 'সেট' (SET)। ১৯৫৫ সালে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ছিল প্রতি হাজারে ২৩, সেই সংখ্যা কমে এখন হয়েছে প্রতি হাজারে ৮। আশা করা যায়, সকলের সমবেত চেষ্টায় অল্প দিনের মধ্যেই কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা আরও কমিয়ে ফেলা যাবে।

কুষ্ঠ যে সংক্রামক ব্যাধি, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তবে একজন কুষ্ঠরোগীকে অন্য যে-কোন সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীর মতই দেখতে হবে। এটা অপ্রতিরোধ্য নয়, এবং নিরাময়যোগ্য। দীর্ঘ সময় ধরে ভালভাবে চিকিৎসা করলে, কুষ্ঠ অবশ্যই সারে। উল্লেখ্য যে, আজকাল প্রাপ্ত চিকিৎসার সাহায্যে, সর্বাপেক্ষা সক্রামক কুষ্ঠরোগকেও, পাঁচ থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে, অসংক্রামক ক'রে তোলা যায়। এটা কম কথা নয়। কিন্তু বাহ্যতঃ চর্মরোগ হলেও কুষ্ঠ আসলে একপ্রকার নার্ভতন্ত্র বা স্নায়ুতন্ত্র বিনষ্টকারী ব্যাধি। নার্ভ বা স্নায়ু একবার বিনষ্ট হলে, তা আর নতুন ক'রে দেহে তৈরি হয় না। সাধারণতঃ অবহেলার ফলেই এরকম ঘটে থাকে। ক্ষতিগ্রস্ত অক্ষম নার্ভ বা স্নায়ুকে চিকিৎসা দ্বারা কিছুটা সক্ষম করা গেলেও তাকে আর কিছুতেই আগের মতো সতেজ করা যায় না। তেমনি কোন অঙ্গহানি হয়ে গেলে, তাকে আর নতুন ক'রে গড়ে দেওয়া যায় না। সে চিরকালের মতো বিকলাঙ্গ অথবা পঙ্গু হয়ে যায়। আর একজন সেরে যাওয়া কুষ্ঠরোগীকে কেউ কাজে নিয়োগ করতেও চায় না।

সেরে যাওয়া কুষ্ঠ-রোগীদের পুনর্বাসনের কাজ অত্যন্ত কঠিন কাজ। কারণ, একথা এখন সকলকে বোঝানো দরকার যে, কুষ্ঠকে লোকে যতটা ভয় পায়, আসলে তা ততটা ভয়ের নয়। আর অসংক্রেমাক কুষ্ঠ-রোগীকে একঘরে ক'রে রাখাও সঙ্গত নয়। এরা যাতে সাধারণ কর্মক্ষম ব্যক্তিদের মতই কাজ করার সুযোগ পায়, সেটাও সকলের দেখা উচিত। আমাদের দেশে এজন্যে বাঁকুড়ার কেন্দ্রটি ছাড়াও তামিল-নাড়ুতে আছে 'Katpady', আর মহারাষ্ট্রের

অন্তর্গত ভারোরাতে আছে 'Multipurpose Rehabilitation Centre'। এইসব জায়গায় তাদের নানারকম কাজ শেখানো হয় এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। কোন কোন কুষ্ঠ-রোগীর হাত-পা এবং মুখের বেশীরকম বিকৃতি ঘটে, পঙ্গু হয়ে যায়। এই-রকম রোগীকে কর্মক্ষম ক'রে তোলার জন্যে অনেক সময় শল্য-চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। ভারত সরকারের সহায়তায় ভারতের প্রায় ত্রিশটি হাসপাতালে এরূপ শল্যচিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রয়োজন হলে তাদের কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও দেওয়া হয়।

আর একটা কথা—আমরা জানি, যক্ষ্মা-রোগ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ বি. সি. জি. টিকা (B. C. G. Vaccine) দেওয়া হয়ে থাকে। এই টিকা নিলে, কুষ্ঠ-রোগের বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ-শক্তি বা অনাক্রম্যতা (Immunity) অর্জন করা সম্ভব হয় বলে কোন কোন বিজ্ঞানী দাবী করেছেন। তবে এসম্পর্কে শেষ কথা বলবার আগে আরও ব্যাপকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

দেশ-বিদেশের বহু বিজ্ঞানী কুষ্ঠ-প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কারের জন্য অবিরত গবেষণা ক'রে চলেছেন। দিল্লীর 'অল ইণ্ডিয়া ইন্‌স্টিটিউট অব বায়োকেমিস্ট্রি', 'টাটা ক্যান্সার সেণ্টার' এবং কলকাতার 'স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন'-এর বিজ্ঞানীরা এজন্য পরস্পরের সহযোগিতায় কাজ ক'রে চলেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সি. সি. সেফার্ড এবং যুক্তরাজ্যের ডাঃ বীজ এদিকে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছেন বলে জানা গেছে। তাই এখন অনেকেরই আশা, অদূর ভবিষ্যতেই হয়তো কুষ্ঠের প্রতিষেধক টিকা চিকিৎসকদের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হবে। তাহলে কুষ্ঠ-রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধ করা আরও সহজ হবে।

ওহে কালো মৃত্যু, তুমি আজ পরাজিত !

[এক]

"এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন (রেঙ্গুন) শহরের মাঝখানে প্লেগ আসিয়া তাহার ঘোমটা খুলিয়া কালো মুখখানি বাহির করিয়া দেখা দিল। হায় রে! তাহাকে সমুদ্রপারে ঠেকাইয়া রাখিবার লক্ষ-কোটি যন্ত্র-তন্ত্র, কর্তৃপক্ষের নিষ্ঠুরতম সতর্কতা (কোয়েরেন্‌টিন্) সমস্তই এক মুহূর্তে একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। মানুষের আতঙ্কের আর সীমা-পরিসীমা রহিল না। অথচ শহরের চৌদ্দ আনা লোকই হয় চাকুরিজীবী, না হয় বাণিজ্যজীবী। একেবারে দূরে পালাইবারও জো নাই—এ যেন রুদ্ধ ঘরের মাঝখানে অকস্মাৎ কে ছুঁছোবাজি ছুঁড়িয়া দিল। ভয়ে এ পাড়ার মানুষগুলো স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া পোঁটলা-পুঁটলি ঘাড়ে করিয়া ও-পাড়ায় ছুটিয়া পালায়, আর ও-পাড়ার মানুষগুলো ঠিক সেই-সব লইয়া এ-পাড়ায় ছুটিয়া আসে। 'ইঁদুর' বলিলে আর রক্ষা নাই। সেটা মরিয়াছে কি মরে নাই, তাহা শুনিবার পূর্বেই লোকে ছুটিতে শুরু করিয়া দেয়। মানুষের প্রাণগুলা যেন সব গাছের ফলের মত প্লেগের আবহাওয়ায় এক রাত্রেই পাকিয়া উঠিয়া বোঁটায় ঝুলিতেছে,—কাহার যে কখন টুপ করিয়া খসিয়া নীচে পড়িবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

সে দিনটা ছিল শনিবার। কি-একটা সামান্য কাজের জন্য সকালে বাহির হইয়াছি। শহরের মধ্যে একটা গলির ভিতর দিয়া বড় রাস্তায় পড়িতে দ্রুতপদে চলিয়াছি, দেখি অত্যন্ত জীর্ণ পুরাতন একটা বাটীর দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া ডাকাডাকি করিতেছেন প্রাজ্ঞ মনোহর চক্রবর্তী।

হাত নাড়িয়া বলিলাম, সময় নাই।

তিনি একান্ত অনুনয়ের সহিত কহিলেন, দুমিনিটের জন্য একবার উপরে আসুন শ্রীকান্তবাবু, আমার বড় বিপদ।

কাজেই সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও উপরে উঠিতে হইল।...কাছে গিয়া বলিলাম, অনেকদিন ত আমাদের ওদিকে যাননি—আপনি কি এই বাড়িতে থাকেন ?

তিনি বলিলেন, না মশাই, আমি দিন বারো-তেরো এসেচি। একে ত মাসখানেক থেকে ডিসেন্ট্রিতে ভুগচি, তার ওপর আমাদের পাড়ায় হ'ল প্লেগ। কি করি মশাই, উঠতে পারিনে, তবু তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম।

বলিলাম, বেশ করেচেন !

তিনি বলিলেন, বেশ করলে কি হবে মশাই—আমার combined hand ব্যাটা ভয়ানক বজ্জাত। বলে কিনা চলে যাবো। দিন দেখি ব্যাটাকে আচ্ছা ক'রে ধমকে।...কি যে বলিব, আর কি যে করিব, ভাবিয়া পাইলাম না। তথাপি তাঁহার বারংবার অনুযোগ ও পীড়াপীড়িতে আগত্যা সেই হতভাগ্য combined hand-কে শাসন করিতে রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখি, সে একটা অন্ধকূপের ন্যায় অন্ধকার। ...একটা বিশ্রী পচা গন্ধ ঢুকিয়া পর্যন্তই আমার নাকে লাগিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম এ দুর্গন্ধ কিসের রে ?

Combined hand কহিল, কোই চুহা-উহা সড়ল্ হোগা।

চমকাইয়া উঠিলাম। —চুহা কিরে ? এ ঘরে মরে নাকি ?

সে হাতটা উলটাইয়া তাচ্ছিল্যভরে জানাইল যে, প্রত্যহ সকালে অন্ততঃ পাঁচ-ছয়টা করিয়া মরা ইঁদুর সে বাহিরের গলিতে ফেলিয়া দেয়।

কেরোসিনের ডিবা জ্বালাইয়া অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু পচা ইঁদুরের সন্ধান পাওয়া গেল না। কিন্তু তবুও আমার গা-টা ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল। এবং কিছুতেই মন খুলিয়া লোকটাকে সদুপদেশ দিতে পারিলাম না যে, পীড়িত বাবুকে একা ফেলিয়া পালান তাহার উচিৎ নয়।

শোবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, মনোহরবাবু খাটের উপর

বসিয়া আমার অপেক্ষা করিতেছেন। আমাকে পাশে বসাইয়া তিনি এ বাড়ির গুণের কথা বলিতে লাগিলেন—এমন অল্প ভাড়ায় শহরের মধ্যে এত ভাল বাড়ি আর নেই ; এমন ভদ্র বাড়িওয়ালাও আর নাই, এবং এরূপ প্রতিবেশীও সহজে মিলে না।...হঠাৎ বলিলেন, আচ্ছা মশাই, আপনি স্বপ্ন বিশ্বাস করেন ?

বলিলাম, না।

তিনি বলিলেন, আমিও না ; কিন্তু কি আশ্চর্য মশাই, কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, আমি সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছি। আর জেগে উঠেই দেখি ডান পায়ের কুঁচকি ফুলে উঠেছে। সত্যি-মিথ্যে আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখুন না মশাই, তাড়সে জ্বর পর্যন্ত হয়েছে।

শুনিয়াই আমার মুখ কালি হইয়া গেল। তারপরে কুঁচকিও দেখিলাম, গায়ে হাত দিয়া জ্বরও দেখিলাম।

মিনিটখানেক আচ্ছন্নের মত বসিয়া থাকিয়া, শেষে বলিলাম, ডাক্তার ডাকতে পাঠান নি কেন, শীঘ্র পাঠান।

তিনি কহিলেন, মশাই, যে দেশ—এখানে ডাক্তারের ফি ত কম নয়। আনলেই ত চার-পাঁচ টাকা বেরিয়ে গেল। তাছাড়া আবার ওষুধ ! সেও ধরুণ প্রায় দুটাকার ধাক্কা।

বলিলাম, তা হোক, ডাকতে পাঠান।

কে যাবে মশাই ? তেওয়ারী বেটা ত চেনেই না। তা ছাড়া ও গেলে রাঁধবেই বা কে ?

আচ্ছা, আমিই যাচ্ছি,—বলিয়া ডাক্তার ডাকিতে নিজেই বাহির হইয়া গেলাম।

ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া আমাকে আড়ালে ডাকিয়া কহিলেন, ইনি আপনার কে ?

বলিলাম, কেউ না। এবং কি করিয়া আজ সকালে আসিয়া পড়িয়াছি, তাহাও খুলিয়া বলিলাম।

ডাক্তার প্রশ্ন করিলেন, এঁর কোন আত্মীয় এখানে আছে ?

বলিলাম, জানি না। বোধ হয় কেউ নেই।

ডাক্তার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, আমি একটা ওষুধ লিখে দিয়ে যাচ্ছি। মাথায় বরফ দেওয়াও দরকার; কিন্তু সবচেয়ে দরকার এঁকে প্লেগ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া। আপনি থাকবেন না এঘরে—আর দেখুন, আমাকে ফিস্ দেবার দরকার নেই।

ডাক্তার চলিয়া গেলে, আমি বহু সঙ্কোচের পর হাসপাতালের প্রস্তাব করিতেই মনোহর কাঁদিতে লাগিলেন। সেখানে বিষ দিয়া মারিয়া ফেলে, সেখানে গেলে কেউ কখনো ফিরে না—এমনি কত কি!

ঔষধ আনিতে পাঠাইবার জন্য তেওয়ারীর সন্ধান করিয়া দেখি, Combined hand তাহার লোটা-কম্বল লইয়া ইতিমধ্যে অলক্ষ্যে প্রস্থান করিয়াছে। সে বোধ করি, ডাক্তারের সহিত আমার আলোচনা দ্বারের অন্তরাল হইতে শুনিতেছিল। হিন্দুস্থানী আর কিছু না বুঝুক, 'পিলেগ' কথাটা ভারী বুঝে।

তখন আমাকে যাইতে হইল ঔষধ আনিতে। বরফ, আইস-ব্যাগ প্রভৃতি যাহা কিছু প্রয়োজন, সমস্তই কিনিয়া আনিয়া হাজির করিলাম। তাহার পরে রহিলাম আমি আর তিনি—তিনি আর আমি। একবার আমি দিই তাহার মাথায় আইস-ব্যাগ তুলিয়া—একবার সে দেয় আমার মাথায় আইস-ব্যাগ তুলিয়া। এইভাবে ধস্তাধস্তি করিয়া বেলা দুটা বাজিয়া গেলে, তবে সে নিস্তেজ হইয়া শয্যা গ্রহণ করিল। মাঝে মাঝে তাহার চৈতন্য আচ্ছন্ন হইয়া যায়, আবার মাঝে মাঝে সে বেশ জ্ঞানের কথাও বলে। অপরাহ্নের কাছাকাছি সে ক্ষণেকের জন্য সচেতনভাবে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, শ্রীকান্তবাবু, আমি আর বাঁচব না।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তখন সে বহু চেষ্টায় কোমর হইতে চাবি লইয়া আমার হাতে দিয়া কহিল, আমার তোরঙ্গের মধ্যে তিন

শ গিনি আছে—স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেবেন। ঠিকানাটা আমার বাক্স খুঁজলেই পাবেন।

আমার একটা সাহস ছিল, পাশের 'মেস'টা। তাদের সাড়া-শব্দ, চাপা কণ্ঠস্বর প্রায়ই শুনিতে পাইতেছিলাম। সন্ধ্যার পর একবার তাহাদের একটু বেশি রকম নড়াচড়ার গোলমাল আমার কানে আসিয়া পৌঁছিল ; কিছুক্ষণ পরেই যেন মনে হইল, তাহারা দরজার তালা বন্ধ করিয়া কোথায় যাইতেছে। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, তাই বটে—সত্যই দ্বারে তালা ঝুলিতেছে। বুঝিলাম, তাহারা বাহিরে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল, কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু তবুও কেমন মনটা আরও খারাপ হইয়া গেল।

এদিকে আমার ঘরের লোকটি উত্তরোত্তর যে-সকল কাণ্ড করিতে লাগিলেন, সে সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে পারি, তাহা রাত্রে একাকী বসিয়া উপভোগ করিবার মত বস্তু নয়। ওদিকে রাত্রি বারটা বাজিতে চলিল। কিন্তু পাশের ঘর খোলার সাড়াও পাই না, শব্দও পাই না। মাঝে মাঝে বাহিরে আসিয়া দেখি, তালা তেমনি ঝুলিতেছে। হঠাৎ চোখে পড়িয়া গেল যে, কাঠের দেয়ালের একটা ফুটা দিয়া ও-ঘরের তীব্র আলো এ-ঘরে আসিতেছে ; কৌতূহল বশে সেই ছিদ্রপথে চোখ দিয়া তীব্র আলোকের যে হেতুটা দেখিলাম, তাহাতে সর্বাঙ্গের রক্ত হিম হইয়া গেল। সুমুখের খাটের উপর দুইজন যুবা পাশাপাশি বালিশে মাথা দিয়া নিদ্রা দিতেছে, আর শিয়রে খাটের বাজুর উপর একসার মোমবাতি জ্বলিয়া জ্বলিয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমি পূর্বেই জানিতাম, রোমান ক্যাথলিকরা মৃতের শিয়রে আলো জ্বালিয়া দেয়। সুতরাং এ দুজনের ঘুম যে হাজার ডাকাডাকিতেও আর ভাঙ্গিবে না, এবং এমন হৃষ্টপুষ্ট সবলকায় লোক-দুটির এত অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িবার হেতুটা যে কি, সমস্তই একমুহূর্তে বুঝিতে পারিলাম।

এ ঘরেও আমাদের মনোহরবাবু প্রায় আরও ঘন্টা-ছুই ছটফট করিয়া তবে ঘুমাইলেন। যাক, বাঁচা গেল !

কিন্তু তামাশাটা এই যে, যিনি জানাশুনা লোকের পীড়ার সংবাদে পাড়া মাড়াইতে নাই বলিয়া আমাকে সেদিন বহু উপদেশ দিয়াছিলেন তাঁহারই মৃতদেহটা এবং গিনিপোরা বাক্সটা পাহারা দিবার জন্য ভগবান আমাকেই নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

তা যেন দিলেন, কিন্তু বাকী রাত্রিটুকু আমার যেভাবে কাটিল, তাহা লিখিয়া জানাইবার সাধ্যও নাই, প্রবৃত্তিও হয় না। তবে মোটের উপর যে ভাল কাটে নাই, কথা বোধ করি, কোন পাঠকই অবিশ্বাস করিবেন না।”

* * *

অমর কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ত্রী শান্তি দেবীকে নিয়ে রেঙ্গুনে বেশ সুখেই ছিলেন। তাঁদের পুত্রও হয়। পুত্রের বয়স যখন এক বৎসর, সেই সময় রেঙ্গুনেই প্লেগে আক্রান্ত হয়ে শান্তি দেবী এবং শিশু পুত্র উভয়েরই মৃত্যু হয়। স্ত্রী ও পুত্রকে হারিয়ে শরৎচন্দ্র তখন গভীর শোকাহত হয়েছিলেন।

প্লেগ যে কীরূপ মারাত্মক ব্যাধি, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় শরৎচন্দ্র পেয়েছিলেন। তাই বোধ হয় তাঁর “শ্রীকান্ত” গ্রন্থে প্লেগ সম্পর্কে এমন করুণ ও মর্মস্পর্শী বিবরণ দিতে তিনি সক্ষম হয়েছেন।

[দুই]

প্লেগ একটি মারাত্মক ব্যাধি, এবং অত্যন্ত প্রাচীন। তবে ইতিহাস ঘেঁটে প্লেগের সর্বপ্রথম বিবরণ পাওয়া যায় ৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে। তাতে দেখা যায় যে, এই রোগের সূচনা হয়েছিল কন্স্টান্টিনোপলে, এবং এর স্থায়িত্ব ছিল পঞ্চাশ-ষাট বছর। তখন এই রোগ এমন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, একমাত্র রোমক সাম্রাজ্যেরই প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ এতে মারা যায়। অনেকের অনুমান, ঐ সময় প্রায় দশ কোটি মানুষের মৃত্যু হয় এই রোগে।

এরপর চতুর্দশ শতাব্দীতে এই রোগের সূচনা হয় প্রথমে পূর্ব এশিয়ায়, সম্ভবতঃ চীনদেশে। সেখান থেকে বাণিজ্য-পথ (Trade route) ধরে ১৩৪৮ সাল নাগাদ তা চলে যায় ইউরোপে। তখন দক্ষিণ ইউরোপের কয়েকটি দেশে এই রোগ দেখা দেয়। তারপর অল্প সময়ের মধ্যে এই রোগ মহামারীরূপে সমগ্র ইউরোপে এমন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, ইউরোপের প্রায় এক-চতুর্থাংশ (কারও কারও মতে, এক-তৃতীয়াংশ) মানুষ এই রোগে প্রাণ হারায়। একমাত্র লণ্ডন শহরেই মারা যায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ। এই রোগের একটি উপসর্গ, চামড়ায় রক্ত-ক্ষরণ (Haemorrhage)-হেতু চামড়া কালো হয়ে যাওয়া। তাই তখন এই রোগের নাম দেওয়া হয় 'ব্ল্যাক ডেথ' (Black death), অর্থাৎ 'কালো মৃত্যু'।

সেই থেকে প্লেগের আগুন যেন তুষের আগুনের মতই ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে। তারপর ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎ আবার মহামারীরূপে লণ্ডন শহরে আত্মপ্রকাশ করে। এক বছরেই মারা গেল প্রায় সত্তোর হাজার মানুষ। ঐ সময়কার লণ্ডনের ধূলিমলিন ঘিঞ্জি পথঘাট, মন্দ পয়ঃপ্রণালী, অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া প্রভৃতি এর প্রধান কারণ বলে বর্ণনা করা হয়।

মহামারীর প্রকোপ যখন তুঙ্গে, তখন লণ্ডন শহরের দৃশ্য ছিল অত্যন্ত মর্মন্তুদ। যে বাড়িতে কোনো প্লেগের রোগী থাকত, সেই বাড়ির দরজায় একটি 'রেড ক্রশ' (Red cross) (অর্থাৎ, লাল ক্রশ) এঁকে তার নীচে লিখে রাখা হ'ত—'Lord, have mercy upon us.' ; অর্থাৎ, 'ঈশ্বর, আমাদের কৃপা কর'।

মহামারীর ভয়ে হাজার হাজার মানুষ শহর থেকে দূরে গ্রামের দিকে পালিয়ে গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাদের অনেকেই এই রোগ শহর থেকে গ্রামের দিকে বহন ক'রে নিয়ে গেল। তার ফলে অচিরেই তা গ্রামে-গঞ্জেও ছড়িয়ে পড়ল। প্লেগের তাণ্ডবলীলা অব্যাহত রইল ১৬৬৬ সাল পর্যন্ত। তারপর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেই

ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডে (Great Fire) লণ্ডনের সরু সরু ঘিঞ্জি-গলিবিশিষ্ট জনাকীর্ণ বিরাট একটি এলাকা একেবারে ভস্মীভূত হয়ে গেল। খুবই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এর পরই যেন মন্ত্রবলে প্লেগের প্রকোপও হঠাৎ একেবারে কমে গেল।

আগে ভারতবর্ষেও এই রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল অত্যন্ত বেশী। আর কোনো স্থানে এই রোগ দেখা দিলে, প্রাণভয়ে ভীত মানুষ দলে দলে সে-দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেত। শেষে এমন হ'ত যে, রোগীকে ওষুধ-পথ্য দেবার, সেবা-শশ্রূষা ক'রবার, কিংবা তার মৃত্যু হ'লে মৃতদেহ সৎকার ক'রবার, লোকও পাওয়া যেত না।

প্লেগের মহামারী আর একবার ব্যাপকভাবে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, ১৮৯৪ সালে।

যাতায়াতের পথ সুগম হওয়ায়, এবং যানবাহনের উন্নতি হওয়ায়, এক দেশ থেকে আর এক দেশে পর্যটকদের আনাগোনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর তার ফলেই যে এক-একটি সংক্রামক ব্যাধি কি রকম অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে, তারই এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ হ'ল ১৮৯৪ সালের প্লেগের এই মহামারী।

এর সূচনা হয়েছিল অতি সামান্য ভাবে। প্রথমে কতকগুলি ব্যাধিগ্রস্ত মেঠো-ইঁদুর খেত-খামার থেকে এসে হংকং শহরে প্রবেশ ক'রল। তাদের থেকে প্রথমে শহরের ইঁদুরদের মধ্যে, এবং পরে তাদের থেকে আবার শহরের মানুষদের মধ্যে, এই রোগ সংক্রামিত হ'ল। মহামারী কখনও বাড়ে, আবার কখনও কমে! ইত্যবসরে কতকগুলি রোগাক্রান্ত ইঁদুর জাহাজে ক'রে এসে বোম্বাই বন্দরে পৌঁছালো। সেই থেকে এই রোগ ক্রমশঃ ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। মহামারীর তাণ্ডবলীলা চললো চার-পাঁচ বছর ধরে, আর লক্ষ লক্ষ লোক তাতে মারা পড়লো।

১৯০৮ সালে আর একটি জাহাজের মাধ্যমে এই রোগ গিয়ে

পৌঁছালো পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত বাটাভিয়ায়, সেখান থেকে জাভায়। অপর একটি জাহাজ এই রোগ বহন ক'রে নিয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকার এলিজাবেথ বন্দরে। সেখান থেকে রেলগাড়ি ও জাহাজ মারফত তা চলে গেল যথাক্রমে পূর্ব আফ্রিকায়
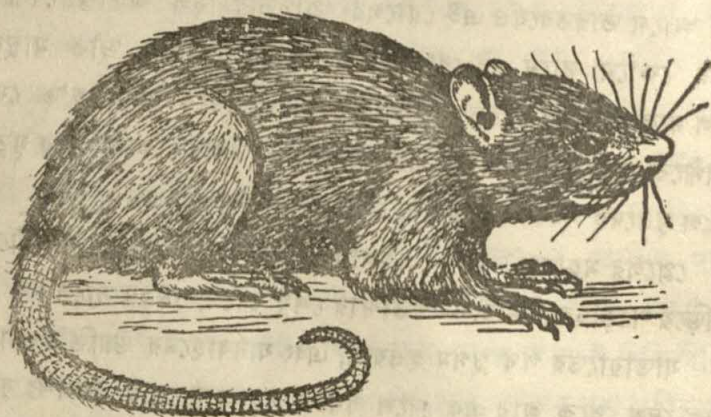
চিত্র ৩৩। ইঁদুর—ইঁদুরের গায়ে অবস্থানকারী ইঁদুর-মাছি প্লেগ-জীবাণুর বাহক।

এবং মাদাগাস্কারে। এদিকে আর একটি জাহাজ এই রোগ নিয়ে গেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোতে, এবং অন্য একটি জাহাজ অস্ট্রেলিয়ার সিড্‌নিতে। এক দেশ থেকে আর এক দেশে, এমনি ক'রে ধীরে ধীরে সমগ্র পৃথিবীতেই প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে। প্লেগ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে তাই দেশে দেশে কোয়েরেন্‌টিন্‌ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়।

[তিন]

এই রোগের জন্য দায়ী জীবাণুর নাম 'ব্যাসিলাস পেস্টিস্‌' (*Bacillu pestis*)। এই জীবাণু আবিষ্কার করেন সুইস বিজ্ঞানী ইয়ারসিন (Yersin) এবং জাপানী বিজ্ঞানী কিটাসাটো (Kitasto)। ইঁদুরের গায়ে অবস্থানকারী ইঁদুর-মাছি (Rat-flea—*Nosopsyllus fasciatus*) এই জীবাণুর বাহক। এই তথ্য

আবিষ্কারের কৃতিত্ব প্রধানতঃ 'ভারতীয় প্লেগ কমিশন' (Indian Plague Commission)-এর।
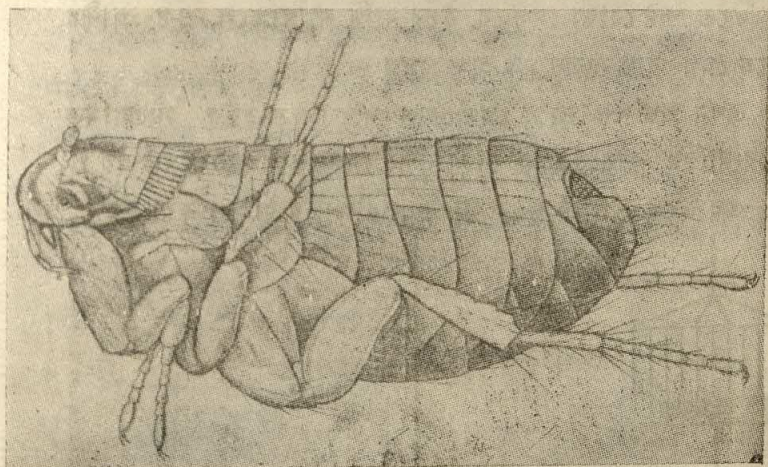
চিত্র ৩৪। সাধারণ ইঁদুর-মাছি—প্লেগ-রোগ সংক্রমণের জন্য দায়ী। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, ইঁদুর-মাছি সাধারণতঃ এক জোড়া বা দু' জোড়া পা উপরদিকে তুলে জোরসে লাফ মারে, মাঝপথে একাধিকবার ডিগবাজী খায়, তারপর আশ্রয়দাতা প্রাণীর দেহে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যাতে তার গায়ের লোম আঁকড়ে ধরে সেখানেই অনায়াসে ঝুলে থাকতে পারে। এইভাবে সে অতি সহজেই এক প্রাণীর দেহ ছেড়ে অন্য প্রাণীর দেহে আশ্রয় নেয়। এর ফলে ইঁদুর-মাছির সাহায্যে প্লেগ-রোগ সংক্রামিত হয়।

ইঁদুরের মতো গিনিপিগও এই রোগে আক্রান্ত হয়, তাই তাঁরা এই পরীক্ষার জন্য ইঁদুরের বদলে গিনিপিগ ব্যবহার করেন। আর নিম্নলিখিত দু'টি পরীক্ষার সাহায্যে এই তথ্যটি নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করতে সক্ষম হন।

প্রথমে একটি খুব সহজ পরীক্ষা করা হ'ল। কয়েকটি রোগাক্রান্ত গিনিপিগ নিয়ে তাদের সঙ্গে কয়েকটি সুস্থ গিনিপিগ রেখে দেওয়া হ'ল। তবে পরীক্ষার পূর্বেই এদের সবারই গা থেকে সব 'মাছি' (Fleas) অপসারিত করা হয়। রোগাক্রান্ত গিনিপিগ-গুলি সবই একে একে মরে গেল, কিন্তু তাদের সঙ্গে অবস্থানকারী

অন্য গিনিপিগের দেহে প্লেগ-রোগ সংক্রামিত হ'ল না, এবং তাদের কেউই মরল না।

এতে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, ইঁদুর-মাছি না থাকলে, সুস্থ প্রাণীর দেহে প্লেগ-রোগ সংক্রামিত হতে পারে না।

এখন প্রশ্ন—কীভাবে প্লেগ-রোগ সংক্রামিত হয়? সংক্রামিত ইঁদুর-মাছির কামড়েই কি সত্যি-সত্যি প্লেগ-রোগ সংক্রামিত হয়?

এর উত্তর খোঁজার জন্যই দ্বিতীয় পরীক্ষাটির ব্যবস্থা করা হয়।
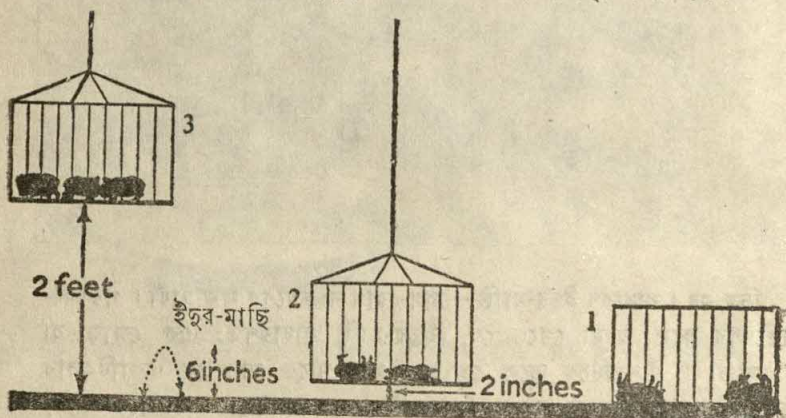
চিত্র ৩৫। ইঁদুর-মাছির সাহায্যে কীভাবে প্লেগ-রোগ সংক্রামিত হয়, তারই পরীক্ষা।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে বিজ্ঞানীরা ইতিপূর্বেই জানতে পেরেছেন যে, ইঁদুর-মাছি লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, তবে খুব বেশী হলে ছয় ইঞ্চি উঁচু পর্যন্ত লাফাতে পারে, তার বেশী নয় কিছুতেই। এজন্য পৃথক তিনটি খাঁচার প্রত্যেকটিতে কয়েকটি ক'রে সুস্থ গিনিপিগ নিয়ে, তাদের এমন একটি ঘরের মধ্যে রেখে দেওয়া হ'ল, যার মেঝেয় প্রচুর সংক্রামিত (অর্থাৎ, জীবাণুবাহী) ইঁদুর-মাছি রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, প্রথম খাঁচাটি রাখা হ'ল একেবারে মেঝের উপর, দ্বিতীয় খাঁচাটি মেঝে থেকে ঠিক দুই ইঞ্চি উঁচুতে, আর তৃতীয় খাঁচাটি মেঝে থেকে ঠিক দুই ফুট উঁচুতে।

কয়েক দিনের মধ্যেই প্রথম দু'টি খাঁচার সবগুলি গিনিপিগ প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। কিন্তু তৃতীয় খাঁচাটি ইঁদুর-মাছির লাফানোর সীমা ছাড়িয়ে আরও অনেক উঁচুতে ছিল, (ইঁদুর-মাছির নাগালের বাইরে,) তাই এই খাঁচার গিনিপিগ কেউই এই রোগে আক্রান্ত হ'ল না, এবং তাদের কেউই মরল না।

এইসব পরীক্ষা এবং অনুরূপ আরও কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই নিশ্চিতরূপে জানা গেল, ইঁদুর-

চিত্র ৩৬। ইঁদুর-মাছিদ্বারা প্লেগ-রোগ সংক্রমণের পদ্ধতি। ইঁদুর-মাছি দংশন ক'রে রক্ত পান করার চেষ্টা করে। কিন্তু এদিকে জমাট রক্ত এবং প্লেগের জীবাণু দ্বারা ইঁদুর-মাছির গ্রাসনালী এবং পাকস্থলীর পথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে যায় বলে, তার পক্ষে টাট্‌কা রক্ত পান করা কঠিন হয়ে পড়ে। এজন্য সে তখন ক্ষতস্থনে খানিকটা বমি ক'রে দেয়, যাতে রক্ত পান করা সহজ হয়। এর ফলে ক্ষতস্থান দিয়ে জীবাণু প্রবেশ করে, এবং অচিরেই তার দেহে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।
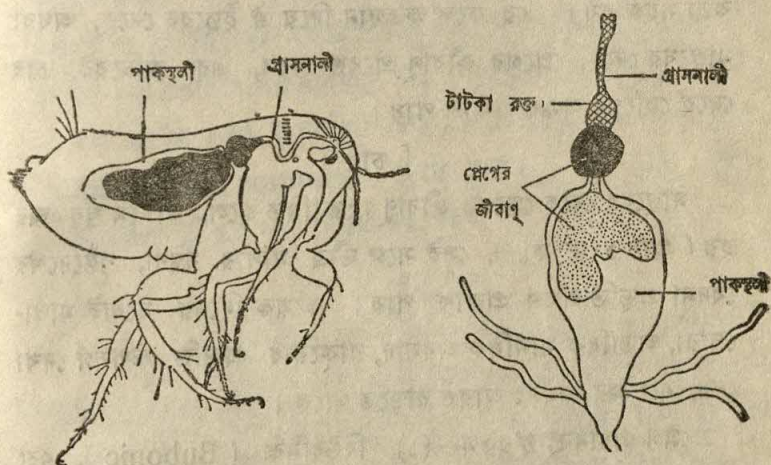
মাছির সাহায্যে কীভাবে প্লেগ-রোগ সংক্রামিত হয়। বোঝা গেল, কোন জায়গায় মহামারী আরম্ভ হলে, প্রথমে ইঁদুর এই রোগে আক্রান্ত হয়। তখন ইঁদুর-মাছি এরূপ ইঁদুরের রক্ত পান করলে, প্লেগের জীবাণু ইঁদুর-মাছির পেটে যায়। রোগাক্রান্ত ইঁদুরটি মরে

গেলে, তার দেহ শীতল হয়ে যায় বলে, ইঁদুর-মাছি তখন অন্য জীবিত প্রাণী খোঁজে। এজন্য ইঁদুর-মাছি মৃত প্রাণীটির দেহ ছেড়ে অন্য সুস্থ ইঁদুরের দেহ, কিংবা মানুষের দেহ, আশ্রয় করে এবং তার রক্ত পান করার চেষ্টা করে। কিন্তু এদিকে জমাট রক্ত এবং প্লেগের জীবাণুদ্বারা ইঁদুর-মাছির গ্রাসনালী এবং পাকস্থলীর পথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে যায় বলে, তার পক্ষে টাটকা রক্ত পান করা কঠিন হয়ে পড়ে। এজন্য সে তখন ক্ষতস্থানে খানিকটা বমি ক'রে দেয়, যাতে রক্ত পান করা সহজ হয়। এর ফলে ক্ষতস্থান দিয়ে ঐ ইঁদুরের দেহে, অথবা মানুষের দেহে, প্লেগের জীবাণু প্রবেশ করে, এবং অচিরেই তার দেহে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

[চার]

মানুষের দেহে প্লেগের জীবাণু সংক্রামিত হলে, প্রথমে খুব জ্বর হয় (প্রায় ১০৪° ফা.), সেই সঙ্গে তীব্র মাথার যন্ত্রণা, পৃষ্ঠদেশের বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কয়েক দিনের মধ্যেই মাথা-ঘোরা, অত্যধিক মানসিক অবসাদ, বাক্‌রোধ প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়, এবং জ্বর ক্রমশঃ আরও বাড়তে থাকে।

প্লেগ প্রধানতঃ দু'রকম—(১) বিউবনিক (Bubonic), এবং (২) নিউমনিক (Pneumonic)।

বিউবনিক প্লেগে কুঁচকি ও বগলের গ্রন্থি ফুলে যায়, এবং সেখানে তীব্র যন্ত্রণা হয়। চারদিনের মাথায় যদি তা ফেটে যায়, তাহলে রোগী ক্রমশঃ সেরে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যদি তা না হয়, তাহলে স্বল্পকালের মধ্যেই রোগী জ্ঞান হারায়, এবং প্রলাপ বকতে আরম্ভ করে। এরূপ অবস্থায় তার মৃত্যু অবধারিত।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে এথেকে 'সেপ্‌টিসিমিয়া' (Septicaemia blood poisoning) হতে পারে। তখন রোগের লক্ষণগুলি আরও জোরদার হয়ে ওঠে। এরূপ রোগীরও মৃত্যু অনিবার্য।

নিউমনিক প্লেগে রোগীর ফুসফুস আক্রান্ত হয়। এক্ষেত্রে রোগীর

হাঁচি বা কাশি মারফৎ, সূক্ষ্ম বারিবিন্দুসদৃশ থুথু ও সিক্‌নির সাহায্যে, রোগ-জীবাণু সংক্রামিত হওয়ার সম্ভবনা থাকে (May be transmitted by droplet infection from man to man)।

[পাঁচ]

প্লেগ হলে, সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে সঙ্গরোধ (Segregate) ক'রে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে, এবং অত্যন্ত সাবধানে সেবা-শুশ্রূষা করতে হবে। এই রোগের চিকিৎসায় ঘোড়ার রক্ত থেকে তৈরী অ্যান্টিটক্‌সিন সিরামই সবচেয়ে কার্যকরী ওষুধ। এছাড়া সাল্‌ফন্সা-মাইড এবং পেনিসিলিন ব্যবহার করেও সুফল পাওয়া যায়। রোগীর মাথায় আইস-ব্যাগ (অর্থাৎ বরফ) দিতে হবে, এবং গায়ে ঠাণ্ডা কম্প্রেস্ (Cold compress) দিতে হবে। এই সময় তাকে হাল্কা অথচ পুষ্টিকর পথ্য দেওয়া দরকার।

[ছয়]

কোনো অঞ্চলে এই রোগ প্রকাশ পেলে, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষেধ-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। কারণ,—Prevention is better than cure. এরূপ রোগীকে অবিলম্বে হাসপাতালে নিয়ে পৃথক্ ক'রে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে, এবং সেই সঙ্গে তার উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থাও করতে হবে, যাতে সে রোগ ছড়াতে না পারে। এরপর ইঁদুর-মারা কলের সাহায্যে, কিংবা বিষাক্ত টোপ অথবা ধোঁয়া প্রয়োগ ক'রে, ইঁদুর মারার ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া গন্ধক পোড়ালে, অথবা ডি. ডি. টি., গ্যামেক্সিন ইত্যাদি স্প্রে ক'রে (বা, ছিটিয়ে) ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে রাখলে, ইঁদুর-মাছির উপদ্রব অনেক কমবে। এই সময় ইঁদুরে খেতে পারে এরকম কোনো খাদ্যদ্রব্য বাইরে রাখা চলবে না। তাহলে খাদ্যাভাবে ইঁদুর-গুলি সব মরে যাবে, অথবা সেই অঞ্চল থেকে দূরে পালিয়ে যাবে। সুতরাং, তখন রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনাও অনেক কমে যাবে।

প্লেগের টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। সুতরাং, কোনো অঞ্চলে হঠাৎ এই রোগের সূচনা হলে, সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই এই রোগের টিকা নেওয়া উচিত। তাহলে আর এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। তখন সব সময় হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা মোটা মোজা (Hose) পরে থাকা উচিত। তাহলে ইঁদুর-মাছি সহজে কামড়াতে পারবে না, তাই প্লেগ সংক্রমণের আশঙ্কাও আর থাকবে না।

[সাত]

বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত সাধনার ফলে প্লেগের প্রকোপ এখন অনেক কমে গেছে। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে প্লেগে মারা গেছে মোট ২,৩৫,২৮৬ জন। ইউরোপে সর্বশেষ প্লেগ দেখা গেছে ১৯৪৫ সালে, ইতালিতে এবং কর্সিকায়।

ভারতের কোথাও কেউ প্লেগে আক্রান্ত হয়েছে, কিংবা মারা গেছে, এমন কথা সাম্প্রতিক কালের মধ্যে শোনা যায় নি। তাই মনে হয়, এদেশে প্লেগের কোনো অস্তিত্বই আর নেই।

সৌভাগ্যবশতঃ প্লেগ এখন এমন অল্প কয়েকটি দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, যেখানে জনস্বাস্থ্যের মান অত্যন্ত নীচু। তাই আশা করা যায় যে, আরও একটু সচেষ্ট হলে, এবং জনস্বাস্থ্যের মান উন্নত করতে পারলে, অদূর ভবিষ্যতেই সেই সব দেশ থেকেও প্লেগকে একেবারে নির্মূল ক'রে ফেলা যাবে। তখন আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারবো,—ওহে কালো মৃত্যু, তুমি আজ পরাজিত!

লেখক ডঃ মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ-র জন্ম ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে, 'বাংলা দেশ'-এর ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণায়। পিতা রমণীকান্ত গুহ, মাতা ইন্দুবালা গুহ। আদি-নিবাস ঐ দেশেরই টাঙ্গাইলে। বর্তমান নিবাস বৃহত্তর কলকাতার অন্তর্গত বেলগাছিয়ায়।

শিক্ষা প্রথমে রাজশাহী কলেজে, পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে। রসায়ন-শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি এস্-সি. পাশ করেন ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে, তারপর ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ঐ বিষয়েই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এস্-সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

তিনি ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে কানিংহাম মেমোরিঅ্যাল পুরস্কার, ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রিফিথ মেমোরিঅ্যাল পুরস্কার এবং ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. ফিল্. ডিগ্রী পান। তাঁর গবেষণার বিষয় দেশ-বিদেশে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে এবং পাঠ্য-পুস্তকে ও ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'Wealth of India' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

তাঁর বিজ্ঞান-ভিত্তিক গ্রন্থ 'আকাশ ও পৃথিবী' ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্র-পুরস্কারে সম্মানিত হয়। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইউনেস্কো-পুরস্কার পেয়েছে তাঁর 'বিজ্ঞানের বিচিত্র বার্তা'। আর 'চল যাই চাঁদের দেশে' গ্রন্থটি ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে শিশু-সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের গৌরব অর্জন করে।

আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম—'জীবের ক্রমবিকাশ', 'বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী', 'বরণীয় বিজ্ঞানী, স্মরণীয় আবিষ্কার', 'দেখে শেখ' ইত্যাদি।

আজ অবধি শতাধিক প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এদের মধ্যে শিশুসাথী, সন্দেশ, ভারতবর্ষ, মন্দিরা, প্রবাসী, বসুধারা, দেশ, আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, আজকাল, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং জ্ঞান-বিচিত্রার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাজশাহী, প্রেসিডেন্সি, হুগলী মহসীন, মৌলানা আজাদ ও কৃষ্ণনগর কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেছেন। আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজে রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধানরূপে কর্মভার গ্রহণ করেন ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে। ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষে সেখান থেকেই তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন। অবসরকালে এখন সাহিত্য-চর্চা করেন।

বি. বি. কুণ্ডু এণ্ড সন্স

১৮এল্, টেমার লেন,

কলিকাতা-৯